সুবোধ ঘোষের ছোটগল্পে মানব মনস্তত্ত্ব

গবেষক

মোমেনুর রসুল

রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ১৩ শিক্ষাবর্ষ : ২০০৮-২০০৯

বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে এম. ফিল. ডিগ্রির জন্যে উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন-পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, মোমেনুর রসুল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. ফিল. ডিগ্রির জন্য আমার তত্ত্বাবধানে 'সুবোধ ঘোষের ছোটগল্পে মানব মনস্তত্ত্ব' শীর্ষক অভিসন্দর্ভ প্রস্তুত করেছেন।

এ অভিসন্দর্ভ সম্পূর্ণ কিংবা আংশিকভাবে গবেষক অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোনো প্রকার ডিগ্রির জন্য উপস্থাপন করেননি।

(ড. সৈয়দ আজিজুল হক)
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

ভূমিকা ১

পরিপ্রেক্ষিত : এক

প্রাক-প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন বাংলা ছোটগল্পে মানব মনস্তত্ত্ব ৪

পরিপ্রেক্ষিত : দুই

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলা ছোটগল্পে মানব মনস্তত্ত্ব ২৪

প্রথম অধ্যায়

সুবোধ ঘোষের ছোটগল্পে ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন ৫৭

দ্বিতীয় অধ্যায়

সুবোধ ঘোষের ছোটগল্পে প্রেম-মনস্তত্ত্ব ৮৮

তৃতীয় অধ্যায়

সুবোধ ঘোষের ছোটগল্পে বিচিত্রমুখী মানব মনস্তত্ত্ব ১১৯

উপসংহার ১৪৮

গ্রন্থপঞ্জি ১৫১

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

চল্লিশের দশকের প্রতিভাবান ও জনপ্রিয় লেখক সুবোধ ঘোষ মানুষের অন্তর্লোক ও বহির্লোকের বিচিত্র চোরাগলি আর ক্লেদাক্ত রহস্য উদঘাটনে আগ্রহী হয়ে রচনা করেছেন বেশ কিছু মনস্তাত্ত্বিক গল্প যা তাঁকে বিশিষ্ট করে তুলেছে। বস্তুত গল্পের মাধমে মানব মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে তিনি বহুমাত্রিক শিল্পসৌধ সৃজন করেছেন। বলা যায়, মানব মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ তাঁর গল্পের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রান্ত। এ অভিসন্দর্ভের রূপরেখা অনুযায়ী সুবোধ ঘোষের গল্পে মানব মনস্তত্ত্বের বিভিন্ন দিকে আলোকপাত করা হয়েছে। উল্লেখ্য, 'সুবোধ ঘোষের ছোটগল্পে মানব মনস্তত্ত্ব' শীর্ষক এই অভিসন্দর্ভের প্রাথমিক পরিকল্পনায় গল্প বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে কালানুক্রমিকভাবে উপস্থাপনের অঙ্গীকার ছিল। কিন্তু তা রক্ষা করা যায়নি। কারণ সুবোধ ঘোষের মূল গল্পগ্রন্থ এবং গল্পের প্রকাশকাল সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ তথ্য উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। সে-বিবেচনায় এতৎসংক্রান্ত আলোচনার পরিধিকে সুপরিকল্পিতভাবে উপস্থাপনের লক্ষ্যে তিনটি বিষয়ে বিন্যস্ত করে অধ্যায় বিভাজন করা হয়েছে।

অভিসন্দর্ভের প্রাথমিক আলোচনায় রয়েছে এর পরিপ্রেক্ষিত অংশ। প্রথম অংশের শিরোনাম 'প্রাক-প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন বাংলা ছোটগল্পে মানব মনস্তত্ত্ব'। এ অংশে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পূর্ববর্তী বাংলা ছোটগল্পে মনস্তত্ত্ব বিষয়ক নানা প্রসঙ্গ উপস্থাপিত হয়েছে। বিশেষ করে এ সময়পর্বে রচিত গল্পকারদের গল্পে মানব মনস্তত্ত্বের যে পরিচয় পাওয়া যায় তার সারাৎসার বিশ্লেষিত হয়েছে এখানে। দ্বিতীয় অংশের শিরোনাম 'প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলা ছোটগল্পে মানব মনস্তত্ত্ব'। এ অংশে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী গল্পলেখকদের গল্প বিশ্লেষণ করে মানব মনস্তত্ত্বের স্বরূপ অনুসন্ধান করা হয়েছে।

'সুবোধ ঘোষের ছোটগল্পে মানব মনস্তত্ত্ব' বিষয়ক মূল বিশ্লেষণ-পরিধিকে তিনটি অধ্যায়ে বিন্যাস করে উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম : 'সুবোধ ঘোষের ছোটগল্পে ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন'। বিশ্ববিশ্রুত ফ্রয়েডের মনোবিকলন তত্ত্বের আলোকে সুবোধ ঘোষ বেশ কিছু ছোটগল্প রচনা করেছেন যা এ অংশে বিস্তৃত পরিসরে আলোচিত হয়েছে। অবচেতন মনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এবং এ থেকে সৃষ্ট বিভিন্ন মনোবিকৃতির সূত্রকে সহায় করে সংশ্লিষ্ট গল্পগুলো বিশ্লেষিত হয়েছে এ অংশে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম : 'সুবোধ ঘোষের ছোটগল্পে প্রেম-মনস্তত্ত্ব'। মানুষের অস্তিত্বের মৌলিক কাঠামোর মধ্যে প্রেম একটি অবধারিত বিষয়। প্রেমের বৈচিত্র্যময় স্বরূপ সন্ধানে সুবোধ ঘোষ ছিলেন সচেতন। তিনি নর-নারীর প্রেম-মনস্তত্ত্বনির্ভর বেশ কিছু গল্প লিখেছেন; সেইসব নির্বাচিত গল্পের পটভূমি, কাহিনী ও চরিত্র বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রেম-মনস্তত্ত্বের বহুমুখী রূপ ও তার স্বরূপ উন্মোচন করা হয়েছে এ অংশে।

'সুবোধ ঘোষের ছোটগল্পে বিচিত্রমুখী মানব মনস্তত্ত্ব' শীর্ষক তৃতীয় অধ্যায়ে মনস্তত্ত্বনির্ভর বিভিন্ন গল্পের বহুমুখী বৈচিত্র্যময়তার স্বরূপ অনুসন্ধান করা হয়েছে। সমাজ-মনস্তত্ত্ব ও ব্যক্তি মনস্তত্ত্বের অনুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণে আলোচিত গল্পের চরিত্রসমূহের মনস্তাত্ত্বিক দিক উদঘাটিত হয়েছে এ অংশে।

'উপসংহার'- অংশে সমগ্র অভিসন্দর্ভের সারাৎসার বিন্যস্ত হয়েছে। মানব মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে বাংলা ছোটগল্পের ধারায় সুবোধ ঘোষের অসামান্যতার মৌলসূত্রসমূহ এখানে উল্লেখ করা হয়েছে।

২.

'সুবোধ ঘোষের ছোটগল্পে মানব মনস্তত্ত্ব' বিষয়ক এম. ফিল. গবেষণাকর্মে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক সৈয়দ আজিজুল হকের তত্ত্বাবধানে ভর্তি হই ২০০৮-২০০৯ শিক্ষাবর্ষে। গবেষণাকাজের প্রতিটি স্তরে তিনি তাঁর সুচিন্তিত দিকনির্দেশনা, তথ্যগত সহায়তা ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে আমাকে সহযোগিতা করেছেন। তাঁর সহযোগিতা ব্যতীত এই কঠিন কাজ সম্পন্ন করা আমার পক্ষে সম্ভব হতো না। কৃতজ্ঞতা জানাই স্যারকে। বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই এম. ফিল. প্রথম বর্ষের কোর্স শিক্ষক পরম শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ড. সৈয়দ আকরম হোসেন স্যারকে। কেননা তাঁর তাড়া আমাকে বাধ্য করেছে অভিসন্দর্ভ রচনার কাজটি সমাপ্ত করতে। প্রয়োজনীয় বইপত্র দিয়ে সাহায্য করার পাশাপাশি তিনি গবেষণার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন। এছাড়া যাঁদের উৎসাহ ও প্রেরণা গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করতে আমাকে প্রণোদিত করেছে, তাঁরা আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক, অধ্যাপক সাঈদ-উর রহমান, অধ্যাপক সিদ্দিকা মাহমুদা, অধ্যাপক বেগম আকতার কামাল, অধ্যাপক ভীষ্মদেব চৌধুরী, অধ্যাপক বিশ্বজিৎ ঘোষ, অধ্যাপক সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ, অধ্যাপক রফিকউল্লাহ খান, অধ্যাপক শাহজাহান মিয়া, অধ্যাপক ফাতেমা কাওসার, অধ্যাপক মো. সিরাজুল ইসলাম, অধ্যাপক সৌমিত্র শেখর, অধ্যাপক বায়তুল্লাহ কাদেরী, অধ্যাপক মোহাম্মদ গিয়াসউদ্দিন, জনাব মেহের নিগার প্রমুখ। এছাড়া অগ্রজ সহকর্মী ড. নূরুন্নাহার ফয়জের নেছা, ড. মো. আবদুস সোবহান তালুকদার, জনাব মোঃ গোলাম আজম, জনাব হোসনে আরা, জনাব তারিক মনজুর, জনাব সোহানা মাহবুব, জনাব মুনিরা সুলতানা ও জনাব তাশরিক-ই-হাবিবের কথা বিশেষভাবে স্মরণ করছি। তাঁরাও বিভিন্নভাবে আমাকে তথ্য ও বই দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। বাংলা বিভাগের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর প্রতিও জানাচ্ছি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

গবেষণার জন্য আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, বাংলা বিভাগের সেমিনার, বাংলা একাডেমীর লাইব্রেরি, কেন্দ্রীয় গণ গ্রন্থাগার ও কলকাতার রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সেমিনারের সাহায্য নিয়েছি। এসব গ্রন্থাগারের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। এছাড়া এ অভিসন্দর্ভ রচনার ক্ষেত্রে আমি লেখকপুত্র সত্যম ঘোষের সহযোগিতা বিশেষভাবে স্মরণ করছি।

সার্বক্ষণিকভাবে পাশে থেকে আমাকে এই কঠিন কাজে সাহায্য করেছেন আমার চিরশুভানুধ্যায়ী বাবা জনাব এম. এ. কাশেম ও স্নেহময়ী মা জনাব বিলকিস বানু। অগ্রজ চার ভাই-বোন ও তাদের পরিবার বিশেষভাবে প্রেরণা ও উৎসাহ দিয়েছেন নিরন্তর। এছাড়া আমার সকল সহপাঠী ও বন্ধু বিশেষ করে মৌসুমী রহমান মৌ, মাহমুদুল হাসান শিবলী এবং ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দকে জানাই কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ যারা বিভিন্ন সময়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। এদের সহযোগিতা আমার কাজকে গতিশীল করেছে।

সবশেষে এ অভিসন্দর্ভটি অত্যন্ত নিষ্ঠা ও সতর্কতার সঙ্গে কম্পিউটার কম্পোজ করার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের কর্মচারী জনাব মোঃ সাইফুল হাসান শামীমকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

মোমেনুর রসুল

পরিপ্রেক্ষিত : এক

প্রাক-প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন বাংলা ছোটগল্পে মানব মনস্তত্ত্ব

খণ্ডিত জীবন অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে অখণ্ড জীবন উপলব্ধি করার অন্বেষা থেকে ছোটগল্পের আবির্ভাব ঘটলেও এর সীমায়িত আয়তনে সমগ্র মানবজীবন-প্রতীতিকে ধরার নিরন্তর নিরীক্ষাই এই শিল্পমাধ্যমটির মুখ্য উদ্দেশ্য। জীবনের প্রসৃত পটভূমিকে কোনো এক মুহূর্তের গভীর অতলান্তে প্রতিবিম্বিত করে দেখাই ছোটগল্পের লক্ষ্য ; এ যেন 'সীমার মাঝে অসীম'কে ধারণ করার অব্যাহত শিল্প-প্রচেষ্টা। এ শিল্প-প্রচেষ্টার জন্যই সাহিত্যের রূপতাত্ত্বিক প্রকরণের মধ্যে গল্প শাখাটি সর্বাধিক জনপ্রিয় শাখা বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। 'মানুষ গল্প শুনতে ভালোবাসে। এ তার একটি আদিম চিরন্তন বৃত্তি।'[১] এ সম্পর্কে সুকুমার সেন একই ধরনের মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন, 'প্রথম হইতেই আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের পাঠক গল্পখোর। অবশ্য সব দেশেই গল্প পাঠকের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। কিন্তু বাঙ্গালায় সাধারণ পাঠক স্বেচ্ছায় গল্প ছাড়া আর কিছু পড়িতে চায় না।'[২] সাহিত্যের ইতিহাসে ছোটগল্প সর্বকনিষ্ঠ প্রকরণ অর্থাৎ আধুনিক কালের সৃষ্টি। অবশ্য এক অর্থে গল্পমাত্র অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলার যথার্থ শিল্পকর্ম। তবুও বলা যায় যে, আদিকালের গল্প আর বর্তমান যুগের গল্প এক নয়। আদিকালের গল্পের রূপ ছিল সরল ও অজটিল। পৌরাণিক গল্পগুলোর মধ্যে মনস্তত্ত্ব ও ঘাত-প্রতিঘাত স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয় নি, বরং তাতে লোকশিক্ষা দেয়া হত। পঞ্চতন্ত্র, জাতক, ঈশপের গল্প ও পৌরাণিক আখ্যায়িকাসমূহের মধ্যে নীতি উপদেশ ও আচার-আচরণ সম্পর্কে অনেক বর্ণনা আছে। কিন্তু আধুনিক ছোটগল্প একটি বিশেষ সাহিত্যরূপ; উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে সর্বপ্রথম ইয়োরোপে তার আত্মপ্রকাশ ঘটে। ইয়োরোপের পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থায় উৎপাদন অধিক প্রসার লাভ করলে, ব্যক্তি-মানুষের জীবনাচরণে এর ব্যাপক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ফলে তাদের আধুনিক জীবন-যাপনে ভোগ-বিলাস-সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের পাশাপাশি দেখা দেয় দুঃখ-বেদনা, ব্যর্থতা-হতাশাও। এরই প্রতিক্রিয়ায় জীবন হয়ে ওঠে অনেক গতিশীল ব্যস্ততায় ভরা। মানুষের এসব খণ্ড খণ্ড জটিল মনস্তাত্ত্বিক বিষয়গুলোকে সীমিত বৃত্তের মধ্যে তুলে আনবার লক্ষ্যে জন্ম হয় ছোটগল্পের। আধুনিক ছোটগল্পের উদ্ভব সম্পর্কে রথীন্দ্রনাথ রায় বলেন : 'প্রকৃতপক্ষে অষ্টাদশ শতাব্দীর আগে আধুনিক উপন্যাসের জন্ম হয় নি। আধুনিক ছোটগল্পের উদ্ভব হয়েছে তারও পরে-উনবিংশ শতাব্দীতে'।[৩] মূলত 'উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বিশ্ব গল্প-সাহিত্যের প্রচলিত তল ছাড়িয়ে উদ্ভাসিত হল আধুনিক কথাসাহিত্যের জনপ্রিয় শিল্পশাখা 'ছোটগল্প' ; যা বাস্তবতার রক্তে-ঘামে-যন্ত্রণায়, আনন্দে-প্রেমে-বিষাদে নিরবচ্ছিন্নভাবে সম্পৃক্ত।'[৪]

উনিশ শতকের ইংরেজ শাসনাধীন বঙ্গদেশে নবজাগরণের অভিঘাতে জীবনের পুরাতন মূল্যবোধগুলি ক্রমশ ক্ষীণ হতে থাকে ব্যক্তি-চেতনা ও সমাজ-চেতনার দ্বান্দ্বিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায়। বহির্দেশীয়

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা-সংস্কৃতির গ্রহণ-বর্জন প্রক্রিয়ায় পরাধীন ভারতবাসী তথা উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ পুনর্গঠিত হতে শুরু করে। এরই ধারাবাহিকতায় শহর-কলকাতায় গড়ে ওঠে ইংরেজদের অনুগ্রহ-পুষ্ট এবং পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানে তাৎক্ষণিকভাবে আলোড়িত, শিক্ষিত-দীক্ষিত এমন এক শ্রেণি যারা 'ব্যক্তিকৃতিমুখী হয়ে গড়ে উঠবার সুযোগ পায় নি তার মধ্যে, slavery - oriented' বা দাসত্বভাবাপন্ন হয়ে গড়ে উঠেছে।'[৫] এই দাসত্ব-প্রবণ দারোগা, কেরানি, নায়েব, গোমস্তা, আমলাদের নিয়ে গঠিত হলো নাগরিক মধ্যবিত্ত শ্রেণি। অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এদের দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়: এক. নতুন নাগরিক ধনী শ্রেণি এবং দুই. নতুন নাগরিক মধ্য শ্রেণি। প্রথম শ্রেণির ধ্যান-জ্ঞান ছিল মূলত ব্যবসা-বাণিজ্যকেন্দ্রিক। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, দোকানদার, দালাল থেকে শুরু করে ব্যবসার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নানা ধরনের সরকারি প্রতিষ্ঠান, স্কুল-কলেজ-অফিস-আদালত-পত্রপত্রিকার দপ্তর থেকে বিভিন্ন সওদাগরী অফিসে এমন এক ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির আত্মপ্রকাশ ঘটল, যারা মেধা-বুদ্ধিভিত্তিক জীবন যাপনের জন্য কালক্রমে চিহ্নিত হলো বাঙালি বুদ্ধিজীবী তথা এলিট শ্রেণি রূপে। শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণি, ক্রমশ উন্মোচিত করেছে উনিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সমাজের শিরায় শিরায় সঞ্চারিত, প্রতিফলিত ক্ষোভ-যন্ত্রণা-হতাশা-বিদ্রোহ-নিঃসঙ্গতা-স্বাজাত্যবোধের মর্মলিপি। এই প্রেক্ষাপটেই পরিস্ফুট হলো জীবনের অবিশ্বাস্য যন্ত্রণাবাহী সাহিত্য-প্রকরণ-ছোটগল্প। তাই সমালোচক নির্দ্বিধায় দেশকালের এই পরিপ্রেক্ষিতকে স্বীকৃতি জানিয়ে বলেছেন, 'হয় সামাজিক সংকট–নয় ব্যক্তিক সংকট–উনিশ শতকের ছোটগল্পে এই দ্বিবিধ যন্ত্রণা বিদ্যমান। ছোটগল্প যন্ত্রণার ফসলরূপেই এই সময় প্রথম অঙ্কুরিত হয়েছে'।[৬] সুতরাং বাহ্যিক রূপান্তর নয়, আত্মিক নবজাগরণের অভিঘাতেই বাঙালি বুদ্ধিজীবী ক্ষতবিক্ষত হতে হতে সন্ধান করেছেন আত্মশক্তির ভরকেন্দ্র ও আত্মমুক্তির পথ। নিজেকে খুঁজে পাওয়ার যন্ত্রণাই তাকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছে জীবনের গল্প, অর্থাৎ অন্তর্জীবনের ভাষ্য, সমাজ ও ব্যক্তি তথা পুরনো মূল্যবোধ এবং নবজাগরণোত্তর জীবনবোধের নবতম শিল্পরূপ–ছোটগল্প। সুতরাং বাংলা ছোটগল্প গর্ভযন্ত্রণা থেকেই দেহ-আত্মায় রক্তাক্ত বাস্তবতার ঘাত প্রতিঘাতে উচ্চকিত।

বাংলা ছোটগল্পের উদ্ভব ও বিকাশ পর্যায়ে বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। বিশ্বসাহিত্যের মতো বাংলা সাহিত্যেও ছোটগল্পের আবির্ভাবকালীন অসংখ্য পত্রপত্রিকার প্রভাব দুর্লক্ষ্য নয়। এক্ষেত্রে 'ছোটগল্পের অজস্রতা ও সমৃদ্ধির মূলে সাময়িক পত্রিকার দান সর্বাধিক'।[৭] প্রস্তুতিপর্বের প্রথম বাংলা ছোটগল্প হিসেবে পরিচিত বঙ্কিমভ্রাতা পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৪৮-১৯২২) "মধুমতী" ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দে (জ্যৈষ্ঠ, ১২৮০) 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রকাশিত হলে বাঙালি তার অন্তর্জীবনের রূপালেখ্যর সাক্ষাৎ খুঁজে পায়। কেননা উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বঙ্গদেশের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পী-সাহিত্যিকদের চেতনামূলে যে সার্বিক

রূপান্তর ঘটছিল, তার পূর্ণাঙ্গ চিত্র আলোচ্য রচনায় সন্নিবেশিত। ছোটগল্পের পূর্ণাঙ্গ মর্যাদা লাভে ব্যর্থ হলেও 'মধুমতী'র বয়ানে গল্পের বিভিন্ন লক্ষণ প্রতিভাত হয়েছে। যেমন: লক্ষ্যমুখী গতিময় ঘটনাক্রম, চরিত্র সংখ্যার স্বল্পতা, ঘটনা ও চরিত্রের মাধ্যমে সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বের টানাপড়েন ইত্যাদি। মনস্তত্ত্বনির্ভর এ গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র মধুমতীর (পূর্বনাম আদরিণী) আবেগ ও সংকট এত তীব্র আকার ধারণ করে যে তার অন্তরের যাবতীয় অন্তর্যাতনার মুক্তি ঘটে আত্মপীড়নে–মধুমতীর জলে ঝাঁপ দিয়ে আত্মবিসর্জনে। সমালোচক মধুমতীর আলোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, 'গল্পটি তিন ভাগে বলা হয়েছে। প্রথম ভাগে করালীচরণের, মধুমতীর প্রাণদান ও তাকে সঙ্গে করে দেশে আগমন; দ্বিতীয় ভাগে, প্রিয়গান শুনে মধুমতীর পূর্বস্মৃতি জাগরণ এবং তৃতীয় ভাগে, করালীচরণ ও লালগোপালের নিকট মধুমতীর পূর্ব-কথার বিবরণ দান এবং লালগোপালের সঙ্গে মৃত্যুবরণ বর্ণনা করা হয়েছে।'[৮] একদিকে জীবনসঙ্গী স্বামী লালগোপাল, অন্যদিকে জীবন রক্ষাকারী দোসর করালীচরণ–অতীত ও বর্তমান সম্পর্কের টানাপড়েনে, দ্বিধা-সংশয়ে আচ্ছন্ন ও আত্মপ্রত্যয়হীন মধুমতীর মনস্তাত্ত্বিক প্রান্ত উন্মোচনে লেখক স্বকীয় প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। কাজেই 'গল্পের আত্মিক ধর্ম যাই হোক না কেন গঠনসৌকর্যের দিক থেকে মধুমতীকে ছোটগল্পের স্থলাভিষিক্ত করা চলে।'[৯] কাহিনীর সংক্ষিপ্ততা ও একমুখিতা, অতি নাটকীয়তা থাকলেও সমাজ-সংস্কার ও ব্যক্তিত্বের টানাপড়েন, সামাজিক সম্পর্কগুলো নিয়ে নতুন ভাবনা–সর্বোপরি সে যুগের শিক্ষিত মনের দ্বন্দ্ব এতে চিত্রিত হয়েছে। 'বিশেষ যুগদৃষ্টির প্রেক্ষিতে মানবমন ও তার মূল কিছু ভাবের নব-মূল্যায়নের চেষ্টাও দেখা যায় "মধুমতী"-তে–যা অবশ্যই ছোটগল্পের লক্ষণ।'[১০]

নভেলা জাতীয় হলেও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৮-১৮৯৪) অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৪-১৮৯৯) "রামেশ্বরের অদৃষ্ট" ও "দামিনী"[১১] গল্পদ্বয়ে একযোগে প্রতিফলিত হয়েছে–সমাজ মনস্তত্ত্ব ও ব্যক্তি-মনস্তত্ত্বের সুতীব্র দ্বন্দ্ব-সংকট। তবে 'সঞ্জীবচন্দ্রের আলোচ্য রচনা দুটিতে ছোটগল্পের গুণ অবধারিত নয়; কিন্তু উপন্যাসের আনুপূর্বিক জীবন-সচেতনতাও অনুপস্থিত। বরং অপেক্ষাকৃত ছোট পরিসরে জীবনের সংহত বলয়ে সহৃদয় সংবেদনার আলো ফেলতে চাওয়া হয়েছে।'[১২] মূলত বাংলা ছোটগল্পের উন্মেষ পর্বে লেখা এই রচনাসমূহে ব্যক্তির বহির্জীবন ও অন্তর্জীবনের যন্ত্রণা, দ্বিধা-সংশয়-সংস্কার-বিশ্বাস-বিদ্রোহ এবং যুগজিজ্ঞাসার চিহ্ন পরিলক্ষিত হলেও ছিল না আদর্শ ছোটগল্পের সীমাসঙ্গতি, বাচনের পরিমিতিবোধ, পাঠকের জন্য ভাবনার ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টান্ত। এই রচনাগুলো বক্তব্যধর্মী হওয়ায় তা লেখকের মতামত প্রকাশের বাহন হয়ে উঠেছে, কোনো সার্বজনীন স্বীকৃতি পায়নি।

বাংলা ছোটগল্পের সার্বজনীন স্বীকৃতি অর্জিত হয় মূলত উনিশ শতকের শেষার্ধে 'হিতবাদী' পত্রিকায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) "দেনা পাওনা" (১৮৯১) রচনার মাধ্যমে। বুদ্ধদেব

বসুকে বলতে শুনি, 'He has brought us the short-story when it was hardly known in England.'[১৩] রবীন্দ্র সাহিত্যধারায় কবিতা ও উপন্যাসের পরে ছোটগল্পের আবির্ভাব ঘটলেও তার স্বরূপ তিনি অনুধাবন করেছিলেন সঠিকভাবেই। সমালোচকের মতে:

> ছোটগল্পের ঋজু কাঠামোয় কাহিনী গ্রন্থন ও চরিত্র সৃষ্টি, নাটকীয়তা ও গীতিধর্মিতা, সেই সঙ্গে বৃহৎ মানব সমাজের প্রতি গভীর ভালোবাসা এবং আশা আনন্দ বেদনার অনুরণন আর সর্বোপরি মানব মনস্তত্ত্বের অতিসূক্ষ্ম রূপের উন্মোচন অসামান্য নৈপুণ্যের সঙ্গে চিত্রিত করেছেন।[১৪]

প্রমথনাথ বিশী তাঁর *রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প* গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, ১৮৯১ থেকে ১৮৯৫ এর মধ্যে চুয়াল্লিশটি ছোটগল্প, ১৮৯৮ সালে সাতটি এবং ১৯০১ থেকে ১৯১২ সালের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ আটটি ছোটগল্প রচনা করেছিলেন। প্রাক-প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্বের বাংলা ছোটগল্প হিসেবে বিবেচিত এই পর্যায়ের রচনায় পল্লিজীবনের সহজ সরল সুখ-দুঃখ, রূপ-মাধুর্য যেমন হয়ে উঠেছে গল্পের বিষয় ও আশ্রয়, তেমনি ক্রমশ গল্পের বয়ানে পরিস্ফুট হয়েছে সমাজ-সমালোচনার গুঞ্জন, মনস্তত্ত্বের মাকড়সা-জাল এবং জীবন ও কালচেতনার গভীরতর ব্যঞ্জনা। প্রাজ্ঞ সমালোচকের ভাষায়:

> তাঁর ছোটগল্পে সচেতন ও অবচেতনভাবে নদীনালা, খালবিল, মাঠঘাট, উদার আকাশ ও সবুজ বনানী আর মুক্ত পথ-প্রান্তর অধ্যুষিত পল্লী-প্রকৃতি, তার নরনারী, আচার-সংস্কার-পালা-পার্বণ, ছোট ছোট সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনা শিকড়-সহ যেমন উঠে এসেছে; তেমনি জন্মসূত্রে অর্জন করেছিলেন নাগরিক-চেতনা (যথা-মনস্তত্ত্বচর্চা, নিঃসঙ্গতাবোধ, সুতীব্র আত্মজিজ্ঞাসা, স্বদেশ ও রাজনৈতিক চেতনা ইত্যাদি)।[১৫]

মানবমনে স্নেহ-ভালোবাসা, সরলতা, সততা, শুচিতাবোধ, পাপবোধ প্রভৃতি অনুভূতিগুলোর মধ্যে যে নিরন্তর দ্বন্দ্ব ক্রিয়াশীল, রবীন্দ্রনাথের এই পর্বের ছোটগল্পে সেই অজ্ঞাতলোক উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। মানবমনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ তাই রবীন্দ্র ছোটগল্পে অনিবার্যভাবেই স্থান পেয়েছে। প্রত্যেকটি গল্পে নরনারীর মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ গল্পের প্রতিপাদ্যকে সঠিক পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। বস্তুত প্রাক-প্রথম বিশ্বযুদ্ধ রবীন্দ্র ছোটগল্পের মানব মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ যেন অনেকটাই সরল ও স্বাভাবিক গতিতে অগ্রসর হয়েছে। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ কোথাও কোনো বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে জীবনের তিক্ত স্বাদকে বড় করে দেখাননি; বরং ব্যক্তি প্রেমের স্বরূপকে গভীর ব্যঞ্জনার মধ্য দিয়ে উপস্থাপন করেছেন এবং সেই সঙ্গে সংযোজিত করেছেন ব্যক্তি মনস্তত্ত্বের উজ্জ্বল রূপ। "পোস্টমাস্টার" (১৮৯১) গল্পে বারো-তেরো বছরের পিতৃমাতৃহীন মমতাময়ী বালিকা রতন এবং কলকাতার ছেলে এক নিরুপায় পোস্টমাস্টারের মনের অবস্থা নিয়ে কাহিনী আবর্তিত হয়েছে। রতনের মনে পোস্টমাস্টারের জন্য মায়া এবং একমুখী ভালোবাসা তৈরি হলেও পোস্টমাস্টারের মনে কেবল জেগেছিল মায়া। ফলত চাকুরি থেকে অব্যাহতি নিয়ে কলকাতায় চলে যাবার প্রাক্কালে

পোস্টমাস্টারের সঙ্গে বিচ্ছেদ সহজভাবে মেনে নিতে পারেনি রতন। কেননা পোস্টমাস্টারের এই বিচ্ছেদ পৃথিবীর চিরাচরিত চিরন্তন বিচ্ছেদের অংশ হিসেবে মেনে নিতে পারলেও ছিন্নমূল বালিকা রতনের পক্ষে তা মেনে নেওয়া ছিল কঠিন। পোস্টমাস্টার নিজ মনকে সান্ত্বনা দিয়েছেন এই ভেবে যে, বিদায়ই চিরন্তন , 'জীবনে এমন কত বিচ্ছেদ, কত মৃত্যু আছে, ফিরিয়া ফল কী। পৃথিবীতে কে কাহার।'[১৬] তাই বিদায়ের মুহূর্তে সৃষ্টি হয়েছে এক করুণ দৃশ্যের, যে দৃশ্য স্পর্শ করেছে পাঠকের মন, ব্যথিত করেছে তাদের হৃদয়। গল্পে রবীন্দ্রনাথ রতন চরিত্রের মাধ্যমে বারো-তেরো বছর বয়সী মেয়েদের বহুরূপী চরিত্র এবং তাদের মনস্তত্ত্ব আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে লেখক জটিলতার পথ পরিহার করে সহজ ও স্বাভাবিক গতি সঞ্চার করেছেন এখানে।

মানুষ যাকে মন দিয়ে ভালোবাসে, সবসময় তার ওপর অতিরিক্ত গুণ প্রয়োগ করতে সচেষ্ট থাকে । এটি মানুষের মনস্তত্ত্বের একটি স্বাভাবিক দিক। রবীন্দ্রনাথের "খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন" (১৮৯১) গল্পে রাইচরণ তার মালিকের ছেলে খোকাবাবুকে মনেপ্রাণে ভালোবাসে। তাই রাইচরণ সবসময় খোকাবাবুর সব কাজকে বয়স অনুযায়ী অতিরিক্ত গুণ হিসেবে বিবেচনা করে। অথচ এই সবই প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে বয়সের সাথে সামঞ্জস্য বিধানের সাধারণ ঘটনা। এতে বিশেষত্ব কিছু ছিল না :

> অবশেষে ছেলেটি যখন হামাগুড়ি দিয়া অতি সাবধানে চৌকাঠ পার হইত এবং কেহ ধরিতে আসিলে খিল্‌খিল্‌ হাস্যকলরব তুলিয়া দ্রুতবেগে নিরাপদ স্থানে লুকাইতে চেষ্টা করিত, তখন রাইচরণ তাহার অসাধারণ চাতুর্য ও বিচারশক্তি দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া যাইত । মার কাছে গিয়া সগর্ব সবিস্ময়ে বলিত, "মা, তোমার ছেলে বড়ো হলে জজ হবে , পাঁচ হাজার টাকা রোজগার করবে"। পৃথিবীতে আর - কোনো মানবসন্তান যে এই বয়সে চৌকাঠ-লঙ্ঘন প্রভৃতি অসম্ভব চাতুর্যের পরিচয় দিতে পারে তাহা রাইচরণের ধ্যানের অগম্য , কেবল ভবিষ্যৎ জজেদের পক্ষে কিছুই আশ্চর্য নহে। [১৭]

ছোটগল্পের সংক্ষিপ্ত পরিসরে প্রকাশভঙ্গির বৈচিত্র্যময়তায় রবীন্দ্রনাথ মানবমনের উপলব্ধিকে, তার অনাবিষ্কৃত ভাবনাকে রূপ দিয়েছেন। চরিত্রের এই অজ্ঞাতলোক আত্মপ্রকাশ করেছে তাঁর বহু গল্পে। এক্ষেত্রে চরিত্রের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে নিসর্গ-প্রকৃতি রেখেছে বিরাট ভূমিকা। বিশিষ্ট সমালোচক সৈয়দ আকরম হোসেন তাঁর *প্রসঙ্গ : বাংলা কথাসাহিত্য* গ্রন্থের "গল্পগুচ্ছে নিসর্গ : রূপ-রূপান্তর" শীর্ষক প্রবন্ধে উল্লেখ করেন:

> প্রত্যক্ষ মৃত্তিকা-ভূমি, ইন্দ্রিয়জ মানুষ-তাদের মানস দ্বন্দ্ব ও জীর্ণতা, তাদের বিষণ্ন ক্ষুব্ধ-উন্মুলিত অন্তর্জীবন ও বহির্জীবন, বৃত্তাবদ্ধ-লোকজীবনের নিম্নচাপ-প্রভৃতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রগাঢ় সংযোগ তাঁকে পৌঁছে

> দিয়েছে ভিন্নতর শিল্পতত্ত্বের সীমানায়। যেখানে বিন্দু সংহত অভিজ্ঞতায় ও চারু কল্পনায় সৃষ্ট হয়েছে জীবন ও সময়স্বভাবী এক সংযত-সংবেদিত ও সংহত শৈল্পিক মনস্তত্ত্বের, গল্পগুচ্ছ যার শিল্পিত সাক্ষ্য।[১৮]

এ সূত্রেই "ত্যাগ" (১৮৯২) গল্পে নায়ক ব্রাহ্মণ হেমন্ত ও নায়িকা শৈশব বিধবা অনাথা কায়স্থকন্যা কুসুমের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথ অপরূপ প্রাকৃতিক পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন। চারটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত বক্ষ্যমান গল্পে নবদম্পতি কুসুম ও হেমন্তের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথ পূর্বাপর থেকেছেন সতর্ক। কুসুম জানে তার সুখ ক্ষণস্থায়ী, তাই ফাল্গুনের পূর্ণিমার আম্রমুকুলের সুবাস, পাপিয়ার গান তাকে দ্বিধাহীন প্রণয়লীলায় অংশ নিতে সাহায্য করেনি। জীবনের সকল দ্বন্দ্ব সেই জ্যোৎস্নারাতে তার হৃদয়ে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। এই চরিত্রের একদিকে রয়েছে তীব্র নাটকীয়তা, অপরদিকে মনোজগতে ঝড়ের সংকেত। হেমন্ত জেনেছে কুসুম বাল্যবিধবা কায়স্থ কন্যা। তাই স্ত্রীকে সে পরিত্যাগ করেছে ; অন্যদিকে কুসুমের আশঙ্কা সত্য হওয়ায় সে তার স্বামীর আরচণকে সহজভাবে মেনে নিতে চেয়েছে। কিন্তু তার মনোজগতে যে অশান্ত সমুদ্রের ঢেউ উঠেছিল তার বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথ মনস্তত্ত্বসম্মত দৃষ্টিকোণ প্রয়োগ করেছেন। বর্ণনাংশটি নিম্নরূপ :

> হেমন্তের সমস্ত অতীত ভালোবাসার কথা স্মরণ করিয়া অত্যন্ত নীরস কঠিন নিরানন্দ হাসি একটা খরধার নিষ্ঠুর ছুরির মতো তাহার মনের এক ধার হইতে আর-এক ধার পর্যন্ত একটি দাগ রাখিয়া দিয়া গেল। বোধ করি সে ভাবিল, যে ভালোবাসাকে এতখানি বলিয়া মনে হয়, এত আদর, এত গাঢ়তা–যাহার তিলমাত্র বিচ্ছেদ এমন মর্মান্তিক, যাহার মুহূর্তমাত্র মিলন এমন নিবিড়ানন্দময়, যাহাকে অসীম অনন্ত বলিয়া মনে হয়, জন্মজন্মান্তরেও যাহার অবসান কল্পনা করা যায় না–সেই ভালোবাসা এই ! এইটুকুর উপর নির্ভর ![১৯]

কুসুমের মনোবিশ্লেষণে তার তীব্র অভিমানবোধ নারীব্যক্তিত্বকে জাগ্রত করেছে, সেই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তীক্ষ্ণ বিদ্রূপে জর্জরিত করেছেন সমাজমানসকে। কিন্তু মানুষের প্রতি তাঁর অপার বিশ্বাস, তাই হেমন্তের মনেও ঝড়ো হাওয়ার সংকেত সৃষ্টি যেন সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বধর্মী হয়ে গল্পে বিশ্লেষিত হয়েছে :

> কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী। অন্ধকার রাত্রি। পাখি ডাকিতেছে না। পুষ্করিণীর ধারের লিচু গাছটি কালো চিত্রপটের উপর গাঢ়তর দাগের মতো লেপিয়া গেছে। কেবল দক্ষিণের বাতাস এই অন্ধকারে অন্ধভাবে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, যেন তাহাকে নিশিতে পাইয়াছে। আর আকাশের তারা নির্নিমেষ সর্তক নেত্রে প্রাণপণে অন্ধকার ভেদ করিয়া কী- একটা রহস্য আবিষ্কার করিতে প্রবৃত্ত আছে।[২০]

কুসুম ও হেমন্ত–এই দুটি চরিত্রের সংকটকালীন মনস্তাত্ত্বিক বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথ যে প্রাকৃতিক আবহ সৃষ্টি করেছেন, তা এক কথায় অনবদ্য।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর এ-পর্বের গল্পসমূহে দাম্পত্য সম্পর্কের সূত্র ধরে নরনারীর হৃদয়ের বিচিত্র লীলা প্রকাশ করেছেন, তাই তাঁর উপস্থাপনার কৌশলও অসাধারণ। একই সঙ্গে, গল্প বলায় নাটকীয় চমৎকারিত্ব এবং মনস্তত্ত্বের জটিলতার সংমিশ্রণে প্রত্যেকটি গল্পেই এক একটি নতুন তাৎপর্য ধরা পড়েছে। এ প্রসঙ্গে অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন:

> গল্পকার রবীন্দ্রনাথ মানবজীবনের জটিল রূপের চিত্রাঙ্কনে প্রমাণ করেছিলেন তাঁর তর্কাতীত শিল্পসামর্থ্য। জীবন যে জটিল রক্তাক্ত এবং স্ববিরোধী তা গল্পলেখক রবীন্দ্রনাথের অজানা ছিল না। রবীন্দ্রনাথ ছোটগল্পে এমন একটি আয়তন সংযোজন করেছিলেন যার ফলে সাধারণ প্রেমের গল্প, অপরাধমিশ্রিত প্রেমের গল্পও নোতুন রূপ পেয়েছিল।[২১]

এ প্রসঙ্গে "মধ্যবর্তিনী" (১৮৯৩) ও "নিশীথে" (১৮৯৪) গল্পদুটোর মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ উল্লেখযোগ্য। "মধ্যবর্তিনী" গল্পে নিঃসন্তান হরসুন্দরীর অনুরোধে স্বামী নিবারণ শৈলবালাকে বিয়ে করার মধ্য দিয়েই সৃষ্টি হয়েছে তিনটি নিতান্ত সাধারণ মানুষের জীবন জটিলতা আর সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক সংকট। শৈলবালা কে বিবাহ করার পর প্রৌঢ় নিবারণ যেন স্তরে স্তরে নিত্য নতুন রূপে প্রেমকে অনুভব করতে সক্ষম হয়েছে। সেখানেও রবীন্দ্রনাথের গভীর মনস্তাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণশক্তির প্রকাশ দুর্লক্ষ্য নয়। যেমন:

> এ বড়ো কৌতূহল, এ বড়ো রহস্য। এক টুকরা হীরক পাইলে তাহাকে নানাভাবে নানাদিকে ফিরাইয়া দেখিতে ইচ্ছা করে, আর এ একটি ক্ষুদ্র সুন্দর মানুষের মন–বড়ো অপূর্ব। ইহাকে কত রকম করিয়া স্পর্শ করিয়া, সোহাগ করিয়া, অন্তরাল হইতে, সম্মুখ হইতে, পার্শ্ব হইতে দেখিতে হয়। কখনো একবার কানের দুলে দোল দিয়া, কখনো ঘোমটা একটুখানি টানিয়া তুলিয়া, কখনো বিদ্যুতের মতো সহসা সচকিতে, কখনো নক্ষত্রের মতো দীর্ঘকাল একদৃষ্টে, নব নব সৌন্দর্যের সীমা আবিষ্কার করিতে হয়।[২২]

এখানে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং মনস্তত্ত্বের ভাষ্যকার। তাঁর বিশ্লেষণের পটভূমিতে নেই কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যা মনস্তাত্ত্বিক সংকটের সংকেত দেয়; আবার নায়ক নায়িকার কথোপকথনেও চরিত্রের সম্পূর্ণ বিকাশ সাধিত হয়নি। এক্ষেত্রে নিত্য দেখা দৈনন্দিন গার্হস্থ্যজীবনের ঘটনার মাধ্যমে কয়েকটি নাটকীয় মুহূর্তের সৃষ্টি করে গল্পকার স্বহস্তে গ্রহণ করেছেন মনোবিশ্লেষণের দায়িত্ব।

"নিশীথে" গল্পেও একই পটভূমি। মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণনির্ভর আলোচ্য গল্পটিকে লেখক বিন্যাসগুণে ও বিশ্লেষণনৈপুণ্যে শিল্পসার্থক করে তুলেছেন। ফলত গল্পটি 'একটি অপরাধী মনের ব্যঞ্জনাময় মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ'[২৩] হয়ে উঠেছে। অপরদিকে 'এই নিশীথ আত্মিক নয়, জৈবিকও নয়, একান্তভাবেই মনস্তাত্ত্বিক'।[২৪] জমিদার দক্ষিণাচরণবাবুর প্রথম পক্ষের রুগ্না স্ত্রী তাকে বাধ্য করেছিল দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে। কিন্তু সেখানে প্রথমা মৃত স্ত্রী মধ্যবর্তিনী হয়ে দক্ষিণাবাবুর সঙ্গে দ্বিতীয়া স্ত্রী মনোরমার মানসিক সংযোগ সৃষ্টি করেনি। বরং স্বামী-স্ত্রীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যের মুহূর্তে মনোরমার মনে হয়েছে, কে যেন তার দিকে আঙুল তুলে বলছে, 'ও কে, ও কে, ও কে গো'। মানবমনের এই সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ গল্পকারের অন্তর্দৃষ্টিতে অত্যন্ত বাস্তবোচিতভাবে গল্পে রূপায়িত হয়েছে। বাস্তবিক এ ধরনের পূর্ণাবয়ব মনস্তত্ত্বধর্মী ছোটগল্প রবীন্দ্রসাহিত্যে তো বটেই, বাংলা ছোটগল্পেও খুব কম দেখা যায়।

মানব-মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথের অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিভঙ্গির অনন্য প্রকাশ ঘটেছে "অতিথি" (১৮৯৫) গল্পে। আয়তনে দীর্ঘ হলেও ছোটগল্পের সমস্ত লক্ষণসমৃদ্ধ এ গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র তারাপদের বন্ধনভীরু স্বভাবকে সম্পূর্ণরূপে তুলে ধরার জন্য একাধিক প্রসঙ্গ এলেও এতে মুখ্য হয়ে উঠেছে চারুশশী-তারাপদ সম্পর্ক। কিশোর মনস্তত্ত্বে রূপকার রবীন্দ্রনাথ আলোচ্য গল্পে তারাপদ ও চারুশশীর মনস্তত্ত্ব চিত্রণে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। 'সাধনা' পত্রিকায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের শেষ গল্প "অতিথি"-তে কিশোর তারাপদ স্বল্প সময়েই কাঁঠালিয়ার জমিদার মতিলালবাবুর সংসারের প্রায় সবার মন জয় করলেও জয় করতে পারেনি কেবল মতিবাবুর কন্যা চারুশশীর হৃদয়। গল্পে চারুশশীর উপদ্রবে তার প্রতি তারাপদর অভিমান, কৌতূহল ও বিরক্তির প্রকাশ যেমন ঘটেছে, তেমনি যৌবনের স্থৈর্য, গাম্ভীর্য, অনুরক্ত ভাবের প্রকাশও লক্ষণীয়। সে কারণেই তারাপদ তাকে মেরেছে, কিন্তু শাসন করেনি ; অভিমান করে কথা বলা বন্ধ করেছে, কিন্তু ক্রোধ প্রকাশ করেনি। অন্যদিকে তারাপদর ইংরেজি শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে চারুশশীর অন্তররহস্য ভেদ করার প্রবণতা। সোনামণির সঙ্গে তারাপদর সহজ স্বাভাবিক সম্পর্ককে চারুশশী গূঢ় প্রেম-ভাবনায় নিজের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে ভেবে যে আচরণ করেছে তাতে তারাপদ কৌতূহলী হয়েছে। গল্পে আপাত তারাপদবিমুখ চারুর নিভৃত হৃদয় তারাপদমুখী হয়ে উঠেছে, যা তার কিশোর মনস্তত্ত্বের যথার্থ স্বাক্ষর বহন করে। আসলে চারু যখন বালিকা বয়স থেকে কৈশোরে পদার্পণ করে, অর্থাৎ এগারো বছর বয়সে উপনীত হয় তখন তার তারাপদবিমুখ প্রেম ধীরে ধীরে তারাপদমুখী হওয়ার পথে অগ্রসর হয়েছে। কিশোর মনস্তত্ত্বের এ এক অভিনব প্রকাশ যা রবীন্দ্রনাথ চমৎকার মুন্সিয়ানায় গল্পে পরিবেশন করেছেন। এখানে নয় থেকে এগারো এই দুই বছরে বালিকা চারুর মনে প্রেম-সৌন্দর্য যেভাবে ধরা দিয়েছে তা পনেরো থেকে সতেরো বছরের বয়ঃসন্ধির বালক তারাপদর প্রেম-সৌন্দর্যবোধ অপেক্ষা অধিক ক্রিয়াশীল। চারু

চেয়েছে তারাপদের সঙ্গ ; কিন্তু নির্লিপ্ত, নিস্তরঙ্গ তারাপদর বন্ধন-মুক্ত হৃদয় অজানা আকর্ষণে ছুটে গেছে। তার বন্ধন-মুক্ত মনে বিচরণ করেছে আকাশে নববর্ষার মেঘ, নিদাঘশুষ্ক নদীর বুকে নব জলপ্রবাহ, দেশি-বিদেশি নাবিকদের পাল তুলে সুর ধরে নৌযাত্রা প্রভৃতির দৃশ্য। তাই গল্পের শেষে মুক্ত পৃথিবীর অবাধ আনন্দ উপভোগের সঙ্গী হয়ে তারাপদ বন্ধনময় জগৎ হতে সবার হৃদয় চুরি করে নিভৃত নির্জনে পলায়ন করেছে। দুই বিপরীত বৈশিষ্ট্যের নর-নারীর মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে গল্পটি তাই সার্থক হয়ে উঠেছে। সমালোচক আহমদ রফিক বলেছেন :

> অতিথি স্বভাবতই রাবীন্দ্রিক ছোটগল্পের এমন একটি ফসল, যাতে পরিণতির প্রসাদ অক্ষুণ্ন। এখানে কবি রবীন্দ্রনাথ, শিল্পী রবীন্দ্রনাথ ও ব্যক্তিজীবনের রহস্যময় মনোগহনে বিচরণক্ষম গাল্পিক রবীন্দ্রনাথের এক সমন্বিত রূপের সাক্ষাৎ মেলে, যার কুশল হস্তক্ষেপে গল্পটিতে গীতিমাধুর্যের সথে মনস্তাত্ত্বিক কারুকার্যের সুষমা সংযোজিত হয়েছে ; সেইসঙ্গে একাধারে রোমান্টিকতা ও বাস্তব চেতনার সফল সংমিশ্রণে চরিত্রধর্মী গল্পটির বিকাশ ও সার্থক পরিণতি।[২৫]

প্রকৃতপক্ষে প্রাক-প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্বের রবীন্দ্র ছোটগল্পে মানবমনস্তত্ত্ব রূপায়ণের ক্ষেত্রে নেই কোনো জটিলতা কিংবা দ্বন্দ্ববহুল মানসিকতার রূপ। যাপিত জীবনের ঘটনাপ্রবাহ সাধারণ মানুষের মনোলোকে কোনো দ্বন্দ্ব কিংবা বাধা সৃষ্টি করেনি। এ প্রসঙ্গে বাসন্তী মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্য উদ্ধারযোগ্য:

> গল্পগুচ্ছের প্রথম পর্যায়ে গল্পগুলিতে মনস্তত্ত্ব রূপায়ণের বৈশিষ্ট্য সেইখানেই যে, প্রত্যহের দেখা জীবনের মধ্যেই সাধারণ মানুষের মনের নিভৃতলোক আলোকিত হয়ে উঠেছে। বিক্ষোভ, বেদনা, আশা-নিরাশায় মানবচিত্ত যে কতখানি আলোচিত হয়ে উঠতে পারে, তাকেই আকৃতি দিলেন তাঁর গল্পগুচ্ছের চরিত্রের বহুমুখী প্রবাহের ব্যাখ্যান পদ্ধতিতে।[২৬]

তবে বিশ শতকের প্রথমার্ধ হতে বিশেষ করে প্রাক-সবুজপত্র পর্বের রবীন্দ্র-গল্পে গ্রামীণ পটভূমির পরিবর্তে স্থান পেয়েছে শাহরিক জীবন প্রতিবেশ; ফলে এ সময় 'শহর-জীবনের গভীর মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা গল্পে প্রাধান্য পেয়েছে–এই জাতীয় গল্পেরই সফলতম অভিব্যক্তি দেখি "নষ্টনীড়"-এ'।[২৭] মূলত "নষ্টনীড়" (১৯০১) গল্পে রবীন্দ্রনাথ সরল মানুষের ক্ষুদ্র আশা-নিরাশায় মগ্ন চরিত্রের গতিপ্রকৃতি অনুধাবনের পরিবর্তে মানবমনস্তত্ত্বের জটিল রূপের অন্বেষণ করেছেন। আলোচ্য গল্প সম্পর্কে সমালোচকের উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য:

> 'নষ্টনীড়' থেকে রবীন্দ্রনাথের মননভাবনা তার গতিপথ পরিবর্তন করল। এ পর্যন্ত তিনি আমাদের প্রচলিত সংস্কার এবং পরিচিত পরিবেশ ও সমাজ প্রেক্ষাপটে সাহিত্য সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু সেই চেনা জগতেই অনেক সময়ে এমন এক অপ্রত্যাশিত হৃদয়বৃত্তি বিকাশ লাভ করে, যা আমাদের অভ্যস্ত নিয়মকে লঙ্ঘন করে যায়। 'নষ্টনীড়' রচনাকালে মানব মনস্তত্ত্বের এই অচেনা জগতের আহ্বান কবিকে আকৃষ্ট করেছিল।[২৮]

বস্তুত সমাজ অস্বীকৃত প্রেমকে কেন্দ্র করে রচিত এই গল্পটিকে বাংলা মনস্তাত্ত্বিক গল্পের পথিকৃৎ বললে ভুল হবে না। চারুর প্রতি স্বামী ভূপতির ঔদাসীন্য, দেবর অমলের সঙ্গে নিঃসঙ্গ চারুর গড়ে ওঠা মধুর সম্পর্ক, যা ক্রমে দুর্নিবার ভালোবাসায় পরিণত হয়েছে, আর চারু ও ভূপতির অজান্তেই তাদের নীড় ভেঙে যাচ্ছে–সেই শৃঙ্খলিত সূত্রগুলোকে নিপুণভাবে উপস্থাপন করেছেন রবীন্দ্রনাথ এই গল্পে। তিনটি চরিত্রেরই জটিল মনের পরিবর্তমান রূপটি প্রকাশিত হয়েছে এখানে। মনোজগতের অন্তঃস্বরূপটি এখানে যেভাবে ব্যক্ত হয়েছে, ইতঃপূর্বে তার পরিচয় পাঠক পায়নি। বিশেষত, চারুর মধ্যে ব্যক্তির সংকট ও অন্তর্দ্বন্দ্বজাত যন্ত্রণা বড় হয়ে উঠেছে। এই যন্ত্রণা থেকে উত্তরণের চেষ্টা আছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত উত্তরণ ঘটেনি, স্বামী স্ত্রী উভয়েরই নিঃসঙ্গতার বেদনা বড় হয়ে উঠেছে। বিশ পরিচ্ছেদ-সমন্বিত এই দীর্ঘ গল্পের ঘটনাবিন্যাস ও চরিত্রচিত্তের আপাত অসংলগ্নতা বিন্যাসে মনোবিকলনাশ্রিত আধুনিক বিজ্ঞান এষণাময় জীবন-চিন্তার সার্থক রূপায়ণ ঘটেছে। তাই আলোচ্য গল্পে 'হৃদয়াবেগের চেয়ে মনোবিকলন, গতির চেয়ে বিবৃতি, চলমানতার চেয়ে বিশ্লেষণ অধিক'[২৯] বলে সমালোচক যে মন্তব্য করেছেন তা যথাযথ হিসেবে ধরে নিতে পারি।

রবীন্দ্রনাথের পাশাপাশি প্রাক-প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন বাংলা ছোটগল্পের উন্মেষপর্বে বেশ কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা যায় যাদের রচনায় ব্যক্তির মনস্তত্ত্বের নানামুখী সংকট চিত্রিত। এ প্রসঙ্গে সমালোচক যথার্থই বলেছেন:

> বাহুল্যবর্জিত ঘটনা-সমন্বিত, একক প্রতীতি-নির্ভর, ব্যক্তিমনের সংঘাত-সংবেদনজাত উপলব্ধি নিয়ে লেখা যে-ছোটগল্প-ধারা উনিশ শতকীয় পৃথিবীতে আত্মপ্রকাশ করেছিল, বাংলা সাহিত্যে সেই ধারারই প্রতিষ্ঠাতা ও সার্থকতম শিল্পী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এই ধারায় ছিলেন সার্থক-অসার্থক বহু গল্পকার। এই ধারা বেগবান ছিল এবং প্রায় একমাত্র ধারা ছিল প্রথম মহাযুদ্ধের প্রারম্ভকাল পর্যন্ত, যতদিন না 'সবুজপত্র' নামের একটি আশ্চর্য পত্রিকা প্রকাশিত হল ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে। এই ধারার অসংখ্য লেখক ছিলেন। তাঁরা বিস্মৃত। প্রতিভার জোর ছিল না। নিরন্তর লেখায় নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি তাঁরা। কেবল কয়েকজনের নাম স্মরণযোগ্য।[৩০]

Dhaka University Institutional Repository

মূলত ১৮৯১ থেকে ১৯১৩ পর্যন্ত রবীন্দ্র ছোটগল্পের উজ্জ্বল-উদ্ভাসপর্বে স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৬-১৯৩২), শরৎকুমারী চৌধুরাণী (১৮৬১-১৯২০), নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত (১৮৬১-১৯৪০), প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৭৩-১৯৩২), শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৭৬-১৯৩৮) নাম উল্লেখযোগ্য। 'ভারতী' পত্রিকা সম্পাদনাসূত্রে স্বর্ণকুমারী দেবী বেশ কিছু গল্প রচনা করেছিলেন যার অধিকাংশই আখ্যায়িকা জাতীয়। একমাত্র গল্প-সংকলন *নব কাহিনী বা ছোট ছোট গল্প* (১৮৯২) গ্রন্থের রচনায় মূলত স্বাদেশিকতাবোধ, নারীর পারিবারিক ও সামাজিক সংকট, ব্যক্তির মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা প্রভৃতি বিষয় স্থান পেয়েছে। তাঁর ছোটগল্পের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে সমালোচক জানিয়েছেন :

> স্বর্ণকুমারীর অধিকাংশ গল্পই আখ্যায়িকা জাতীয়। সহজ সাধারণ ভাবে কাহিনী বিবৃত করবার দিকেই প্রবণতা বেশি। উপযুক্ত আঙ্গিকের মধ্যে তার সার্থক সৃষ্টির চেষ্টা ছিল না। তবে 'গহনার বাক্স', 'যমুনা' এবং 'আমার জীবন' গল্পত্রয়ের মধ্যে ছোটগল্পের আকস্মিক পরিসমাপ্তি আছে।[৩১]

মনস্তত্ত্বপ্রধান গল্প হিসেবে "যমুনা" (১৮৯২) স্বর্ণকুমারীর সার্থক সৃষ্টি। আলোচ্য গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র যমুনা স্বামীর কাছ থেকে স্ত্রীর প্রাপ্য অধিকার আদায়ে বঞ্চিত হলে তার মনোজগতে যে জটিলতার সৃষ্টি হয় তার চূড়ান্ত পরিণতি ঘটে শ্মশান-ভূমিতে জীবন্ত জীবনাবসানের মাধ্যমে। মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করলে বলা যায়, নারীর জীবনদৃষ্টি বিশেষভাবে আবেগ-নির্ভর। পুরুষ জীবনকে অবলোকন করে যুক্তি দিয়ে আর নারীর জীবন পাথেয় সম্পূর্ণভাবেই মনোগত আবেগ দ্বারা চালিত। তাই যমুনার মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে গল্পকার নারী-প্রকৃতির স্বভাব-উন্মোচনসূত্রে তার আবেগকে প্রাধান্য দিয়েছেন সর্বাধিক। শরৎকুমারী চৌধুরাণী ছিলেন ভারতী গোষ্ঠীর লেখিকাদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ *শুভবিবাহ* (১৯০৬) তে বাংলাদেশের যৌথ পারিবারিক জীবনে নারীকেন্দ্রিক বহুবিধ সমস্যা ও সংকটের দ্বন্দ্বমুখর সমাজচিত্র অঙ্কিত হলেও ব্যক্তির মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা তাতে উপেক্ষিত নয়। বিশেষত নারীর মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে আলোচ্য সংকলনভুক্ত গল্পসমূহে তাঁর স্বকীয় প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ শরৎকুমারীর *শুভবিবাহ* এর আলোচনা প্রসঙ্গে *আধুনিক সাহিত্য* গ্রন্থে বলেছেন, 'মেয়ের কথা মেয়েতে যেমন করিয়া লিখিয়াছে, এমন কোনো পুরুষ গ্রন্থকার লিখিতে পারিত না।'[৩২] এ গ্রন্থের "যৌতুক" (১৯০২) গল্পটিতে কুলীন হরিশ মোক্তারের কন্যা মনোরমার মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে গল্পকার বাঙালি নারীর প্রচলিত পতিভক্তিকে পরিহার করে আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হবার আহ্বান জানিয়েছেন।

রবীন্দ্র সমসাময়িক লেখকদের মধ্যে এই পর্বে নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'বঙ্কিম প্রতিভার রাজকীয় ছত্রতলে তাঁর সাহিত্য সাধনার সূত্রপাত';[৩৩] তাই 'নগেন্দ্রনাথের শিল্প-প্রবণতা বঙ্কিমানুসারী ছিল।'[৩৪] কঠিন-কোমল মিশ্রিত প্রত্যক্ষ বাস্তবতা নয়, তাঁর গল্পের প্রবণতা ছিল ইতিহাসমুখী, স্বপ্ন-সন্ধানী (যেমন : মিলন, হীরার মূল্য); আবার পারিবারিক জীবনের কলহ-সংকীর্ণতা ও অম্লমধুর জীবনচিত্র অবলম্বনে লিখেছেন "মুক্তি", "দুইবার", "ছোটবউ", "লক্ষহীরা", "মায়াবিনী" ইত্যাদি গল্প। মূলত 'বাঙালী মনের অপেক্ষাকৃত অপরিচিত রহস্যাচ্ছন্ন জীবন ভূমিতে'[৩৫] এসব গল্পের পটভূমি রচনা করা হয়েছে। ফলে গল্পসমূহে নর-নারীর মনস্তাত্ত্বিক রূপ চিত্রণে নগেন্দ্রনাথ সচেতন ছিলেন। "লক্ষহীরা" গল্পে বার বণিতা লক্ষহীরার মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে নগেন্দ্রনাথের অসাধারণ শিল্প সংযমের পরিচয় পাওয়া যায়। একটি শিশুর সরলতা ও মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে অপূর্ব সুন্দরী, সুগায়িকা বারবণিতা লক্ষহীরার মনোজগতের যে রূপান্তর গল্পে উপস্থাপিত হয়েছে তাতে গল্পকার হিসেবে নগেন্দ্রনাথ শিল্প-নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখেছেন।

সূচনাসূত্রেই আমরা উল্লেখ করেছি বাংলা ছোটগল্পের সমৃদ্ধি ও প্রসারে সাময়িক পত্র-পত্রিকার গুরুত্ব; এরই ধারাবাহিকতায় বাংলা ছোটগল্পের বিকাশ ও বিবর্তনে প্রাক-প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্বে যে সকল পত্র-পত্রিকা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো 'ভারতী', 'সাহিত্য', 'বঙ্গদর্শন', (নবপর্যায়), 'বসুমতী' ইত্যাদি। এ সকল পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত গল্পের লেখকদের মধ্যে ছিলেন সুরেশচন্দ্র সমাজপতি (১৮৭০-১৯০২), জলধর সেন (১৮৬০-১৯৩৯), শ্রীশচন্দ্র মজুমদার (১৮৬০-১৯০৮), অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১-১৯৫১) প্রমুখ। এঁদের গল্পে চিত্রিত হয়েছে এমন এক বিষয়, যার 'অন্তর-বাহির' জুড়ে ছড়িয়ে আছে নিরালম্ব মানুষের প্রাত্যহিকতা সুখ-দুঃখ-আনন্দ-বেদনা। মানব মনস্তত্ত্বের অম্ল-মধুর দিক উপস্থাপনে তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন সচেতন। উনিশ শতক আর বিশ শতকের সন্ধিক্ষণে যাঁরা সাময়িক পত্র-পত্রিকায় গল্প লিখে বিশেষ পরিচিতি ও খ্যাতি অর্জন করেছিলেন; তাঁদের মধ্যে অন্যতম গল্প-লেখক হলেন জলধর সেন। লেখক হিসেবে তিনি মনেপ্রাণে বাস্তবধর্মী ও প্রগতিশীল মন এবং মননের অধিকারী ছিলেন। মধ্যবিত্ত শ্রেণির দাম্পত্যজীবনে অভিজ্ঞ নরনারীর অম্ল-মধুর মনস্তত্ত্ব উদঘাটনে তিনি সফল ও কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন এ প্রসঙ্গে তাঁর 'গৃহিণী রোগ' (১৮৯৮) গল্পটির মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। বার্ষিক 'বসুমতী' পত্রিকায় প্রকাশিত এই গল্পের পটভূমি নগর, পাত্রপাত্রীরা মধবিত্ত শ্রেণিভুক্ত। গল্পের নায়ক বিজয়বাবু নাগরিক জীবন প্রতিবেশে ক্রমশ ব্যস্ত হয়ে পড়ায় তার স্ত্রীকে সময় দিতে পারেন না। তার স্ত্রী নিজের মনের মতো করে স্বামীকে সারাদিন কাছে না পেয়ে ক্রমশ হয়ে গেছে মানসিক রোগী। ফলে অন্তর্জগত ও বহির্জগতের প্রবল টানাপড়েনে ক্ষত-বিক্ষত দাম্পত্যের মতো মধুর সম্পর্কের বাতাবরণে সৃষ্টি হয়েছে

মনস্তাত্ত্বিক জট-জটিলতা। চরিত্র ও ঘটনার মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বে লেখক এখানে মধ্যবিত্ত দাম্পত্যের অন্তঃসারশূন্য জীবনযাত্রার চিত্র অঙ্কন করেছেন।

বঙ্কিম সমসাময়িক গল্পলেখক শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের ছোটগল্পে সমকালীন শিক্ষিত মানুষের নৈতিক চরিত্রের অবক্ষয়, যুক্তিহীন-স্বার্থপূর্ণ ও বিবাহসূত্রে আবদ্ধ অর্থলোভী মনস্তত্ত্বের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। "স্বয়ম্বর" (১৯০২) গল্পের কেন্দ্রবিন্দুতে যে 'পাঁচ বৎসরের মাতৃহীনা কন্যা সুহাসিনী'র উল্লেখ আছে, তার মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার মূলে রয়েছে সমাজের তথাকথিত রক্ষণশীল মানুষের নিষ্ঠুর আচরণ। সুহাসিনীকে কেন্দ্রে রেখে গল্পকার আখ্যানের পরিধিতে ছড়িয়ে দিয়েছেন নারীজীবনের গল্প কিংবা বিচিত্র বিভঙ্গ নিয়ে সৃষ্টি করেছেন নারীমনস্তত্ত্বের বিবিধ প্রান্ত। ফলে গল্পের আখ্যানে একসঙ্গে প্রতিফলিত হয়েছে সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক টানাপড়েনে একটি তথাকথিত বিবাহযোগ্য কিশোরীর কন্যা থেকে বধূসত্তায় উত্তরণের বহুমাত্রিক স্বর ও রূপ; যা নিছক দেশ-কালের সীমায় আবদ্ধ থাকেনি।

এ পর্বের অন্যতম লেখক 'সাহিত্য' পত্রিকার সম্পাদক এবং সাহিত্য সমালোচক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি উনিশ শতকের শেষ দশক থেকে বিশ শতকের প্রথম দুই দশক পর্যন্ত বাংলা ছোটগল্পে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর গল্পের বিষয়বস্তুতে যে প্রেমভাবনা উপস্থাপিত, তা কখনোই সমাজ-অনুমোদিত নয়। নিষিদ্ধ, অবৈধ প্রেম মনস্তত্ত্বের দিকেই তাঁর আগ্রহ ছিল অধিক, তাই গল্পে নরনারীর প্রেম মনস্তত্ত্বের চিত্র অঙ্কনে তিনি অর্জন করেছেন অতুল্য সিদ্ধি। এ প্রসঙ্গে "তীর্থের পথে" গল্পটির উল্লেখ করা যায়। বক্ষ্যমাণ গল্পের আখ্যানে সেকালের বহুল আলোচিত প্রসঙ্গ বিধবার প্রেম ও নরনারীর যৌন মনস্তত্ত্ব বর্ণিত হয়েছে। গল্পকার এই গল্পের বয়ানে একদিকে তুলে ধরেছেন অকাল বৈধব্যের শিকার, বাইশ বছর বয়সী যোগমায়ার কামনা-বাসনাময় সহজ স্বাভাবিক রূপ; যা তৎকালীন সামাজিক প্রেক্ষাপটে অসমর্থিত ও নিষিদ্ধ বিষয়, অপরদিকে পুরুষের বহুগামী মনোবৃত্তি যা নৈতিক মনস্তত্ত্বসম্মত নয়। বিষয়-ভাবনা অবশ্যই সাহসী কিন্তু গল্পের পরিণতিতে নরনারীর শরীরজ সম্পর্ক অপেক্ষা মনস্তাত্ত্বিক টানাপড়েনের যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তা সত্যিই বিস্ময়কর। ত্রিভুজ প্রেম সম্পর্কের বৃত্তে আবদ্ধ যোগমায়া-মহামায়া-রামদয়ালের মধ্যেকার মানসিক সংকট ও দ্বন্দ্ব সমগ্র গল্পটিকে একটি বিশিষ্ট মাত্রা এনে দিয়েছে। নরনারীর অদৃশ্য-অবচেতন মনে সক্রিয় জৈবচেতনা ও অতৃপ্তির আগুনে অসময়ে দগ্ধ হয়ে মহামায়া- রামদয়ালের মধুর দাম্পত্যের অবসান ঘটে। বিবাহিত রামদয়ালের অবচেতন স্তর থেকে সচেতন স্তরে ভেসে ওঠে 'অকাল বিধবা', 'খনযৌবনা' যোগমায়ার মুখ; অন্তর্জগতের সাংঘর্ষিক ক্রিয়ায় যৌনক্ষুধা ও পরনারীর প্রতি জাগে সুতীব্র আকর্ষণ। গল্পে বালবিধবার জৈবরাজ্যের সংকট, অপরিণত নারী-মনস্তত্ত্বের দুর্বলতা, পুরুষের প্রতি অধিকারবোধজনিত নারীর

অসূয়াবৃত্তি, যৌনতা-সংক্রান্ত পুরুষের মানসিক ও স্নায়বিক দুর্বলতা প্রভৃতির রূপ উপস্থাপনে গল্পকার শিল্প সার্থকতার পরিচয় দিয়েছেন।

রবীন্দ্র যুগের উজ্জ্বল পরিমণ্ডলে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের আবির্ভাব ঘটলেও বাংলা ছোটগল্পের ক্ষেত্রে তিনি স্বতন্ত্র একটি ধারার অনুসারী। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ছোটগল্প সম্পর্কে বলেছেন:

> জীবনের খণ্ডাংশ নির্বাচনে, তাহার ছোটখাট বৈষম্য-অসংগতির উদঘাটনের দ্বারা তাহার উপর মৃদু হাস্যকিরণ-সম্পাতে, আলোচনার লঘু-কোমল স্পর্শে, দ্রুত অথচ অকম্পিত রেখাঙ্কনে, সকল প্রকার গভীরতা ও আতিশয্যের সযত্ন পরিহারে, আকস্মিক অথচ অভ্রান্ত যবনিকাপাতের সমাপ্তি-কৌশলে- এই সমস্ত দিক দিয়েই তিনি উচ্চাঙ্গের নিপুণতার নিদর্শন দিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের কাব্যময় অনুভূতি, তাঁহার বিদ্যুৎশিখার ন্যায় তীব্র ও মর্মভেদী অন্তর্দৃষ্টি, তাঁহার অতিপ্রাকৃতের রোমাঞ্চ-উদবোধন, তাঁহার মানবচিত্তের অসীম রহস্যের মধ্যে বহিঃপ্রকৃতির আবাহন–ইত্যাদি উচ্চতর গুণের কিছুই প্রভাতকুমারের মধ্যে নাই। তথাপি তিনি তাঁহার ছোটগল্পের মধ্য দিয়া আমাদিগকে যে রাজ্যে লইয়া গিয়াছেন তাহাকে বয়স্কদের রূপকথার রাজ্য বলা যাইতে পারে।[৩৬]

মুখ্যত প্রাক-প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন পর্বে রচিত প্রভাতকুমারের বেশ কিছু গল্পে নর-নারীর সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বের বিবিধ প্রান্ত উন্মোচনের প্রয়াস লক্ষ করা যায়। "হিমানী" (১৮৯৯) গল্পে বিবাহিত মণিভূষণ অধ্যাপক কন্যা হিমানীকে ভালোবাসলেও তাদের প্রণয়ে প্রতিবন্ধক হিসেবে আবির্ভূত মণিভূষণের অসুস্থ স্ত্রী নবদুর্গা। হিমানী ভালোবাসার মর্যাদা অটুট রাখতে নবদুর্গার শরীরে নিজ রক্তদান করে প্রাণ ত্যাগ করলেও তার রক্তে পুনর্জীবিত নবদুর্গার মধ্যে মণিভূষণ যেন তাকেই ফিরে পায়। শুধু তাই নয়, 'এখন হইতে সে স্ত্রীকে হিমানী বলিয়া ডাকে।'[৩৭] গল্পে নায়ক মণিভূষণের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে এবং নবদুর্গার স্বামীর প্রতি কদর্য সন্দেহ চিত্রণে প্রভাতকুমার আন্তরিক ও সচেতন ছিলেন।

নর-নারীর স্বাভাবিক প্রেম-মনস্তত্ত্বের রূপালেখ্য নির্মাণের পাশাপাশি প্রভাতকুমার অস্বাভাবিক, বিকৃত প্রেমের মনস্তত্ত্বও গল্পে স্থান দিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ *ষোড়শী* (১৯০৬) গল্পগ্রন্থের "প্রিয়তম" (ভারতী, ১৩০৬) গল্পটির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। 'গল্পটিতে দুই যুবতী সখী, নব বিবাহিতা প্রিয়তমা এবং বাল্যবিধবা তরঙ্গিনীর মধ্যে সমকামিতা (Homosexuality) বর্ণিত হইয়াছে।'[৩৮] মনোবিজ্ঞানীদের মতে, সমকামিতা এক ধরনের যৌন বিকৃতি; 'এই বিকৃতিতে সমলিঙ্গীর প্রতি যৌন আকর্ষণ ও বিকৃত মিলনের প্রকাশ দেখা যায়। এই বিকৃত মিলনই তাদের ক্ষেত্রে চরম পুলক দেয় বা

রাগমোচন (Orgasm) আনে।'[৩৯] আলোচ্য গল্পে এই দুই নারীর এরূপ অস্বভাবী সম্পর্ক উন্মোচনসূত্রে লেখক বলেছেন:

> প্রিয়তমার সঙ্গে তরঙ্গিনীর সম্বন্ধটা একটু অদ্ভুত রকমের-তাহাকে ঠিক সখীত্ব বলা যাইতে পারে না। তাহারা পরস্পরের প্রতি প্রণয়ী ও প্রণয়িনীর মত আচরণ করিত। তাহাদের পত্রগুলি প্রেমলিপি ছাড়া আর কিছুই নহে।[৪০]

এরূপ অস্বভাবী মনস্তত্ত্বের অধিকারী প্রিয়তমা ও তরঙ্গিনীর প্রেম-মনস্তত্ত্বের জটিল প্রান্ত বিশ্লেষণে গল্পকার অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী গিরীন্দ্রশেখর বসুর মতে, 'পুরুষে পুরুষে নারীতে নারীতে স্বামী স্ত্রীর ন্যায় প্রীতিও বিরল নহে প্রভাতকুমারের *ষোড়শী* পুস্তকের "প্রিয়তম" গল্পেও দুই সখীর মধ্যে এইরূপ প্রেমভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।'[৪১]

রবীন্দ্রনাথের সরলিকৃত বর্ণনভঙ্গি ও তরল আবেগজীবন দ্বারা চিহ্নিত হলেও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর গল্পে নগর ও গ্রামীণ সংস্কৃতির তলদেশ পর্যন্ত স্পর্শ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। বিশেষ করে নারীর মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে শরৎচন্দ্র তাঁর গল্পসমূহে শিল্পীসুলভ আবেগধর্মিতার স্বাক্ষর রেখেছেন। এ প্রসঙ্গে নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বলেছেন:

> শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁহার ছোটগল্পে মনস্তত্ত্ব ও উহার বিশ্লেষণে যথেষ্ট মৌলিকতা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার সাহিত্যের মানুষ বাংলার মধ্যবিত্ত সমাজ হইতে সংগৃহীত। তাই গল্পে শরৎচন্দ্র মনঃসমীক্ষণের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার আন্তরিক আবেগময় সহানুভূতি দ্বারা অপূর্ব সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছিলেন।[৪২]

মূলত উনিশ শতকের শেষ দশক (১৮৯৩) থেকে শরৎচন্দ্র গল্প রচনা শুরু করলেও তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ *বিন্দুর ছেলে ও অন্যান্য গল্প* প্রকাশিত হয় বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সময়পর্বে। সমালোচক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন:

> ১৯১৩ থেকে ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দ : এই বিশ বছরে শরৎচন্দ্রের আটটি গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয় গল্পের সংখ্যা পঁচিশ। গল্পলেখক শরৎচন্দ্রের খ্যাতি এগুলির উপরই প্রতিষ্ঠিত।[৪৩]

এই পঁচিশটি গল্পের মধ্যে প্রাক-প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সময়পর্বে রচিত গল্পগুলোতে প্রেমের বিচিত্র জটিল মনস্তত্ত্বের স্বরূপ উন্মোচনের প্রয়াস লক্ষ করা যায়। প্রথম গল্প হিসেবে বিবেচিত "কাশীনাথ"

(রচনাকাল ১৮৯৩) শরৎচন্দ্রের ক্রমপরিণতিশীল লেখকমনের সার্থক সৃষ্টি বলা যেতে পারে। আলোচ্য গল্পে নির্লিপ্ত, উদাসীন, অন্তর্মুখী স্বভাবের অধিকারী কাশীনাথ জমিদার কন্যা রূপবতী কমলাকে স্ত্রীরূপে স্বাভাবিক ভাবে মেনে নিতে ব্যর্থ হয়েছে। ফলে দাম্পত্যজীবনে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতার সুযোগ ঘটেনি। দরিদ্র মেধাবী রূপবান কাশীনাথের স্বাধীনতা শ্বশুরবাড়িতে পদে পদে খর্ব হলে তার মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা তীব্র থেকে তীব্রতর হয়। অন্যদিকে স্বামীর উদাসীনতার অর্থ বুঝতে না পারায় কমলার মনেও সৃষ্টি হয় জটিলতা। অর্থের দম্ভে স্বামীকে বশে রাখতে জমিদার পিতা প্রিয়বাবুর সমস্ত সম্পত্তি তার মৃত্যুর পূর্বে নিজের নামে লিখিয়ে নিলেও স্বামীর সঙ্গে তার দূরত্ব আরও বৃদ্ধি পায়। একদিকে স্বামীর নির্লিপ্ততা, অপরদিকে কমলার ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব–এ দুয়ের প্রভাবে তাদের দাম্পত্যে বিচ্ছেদ ঘটেছে। এভাবে দুই বিপরীতধর্মী নারী-পুরুষের ভিন্ন অবস্থান আর তাদের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য রূপায়ণে শরৎচন্দ্র মনস্তত্ত্বের জটিল পথে অগ্রসর হয়েছেন। সমালোচকের মতে :

> শরৎচন্দ্র প্রথম গল্পেই মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা উন্মোচনের দিকে ঝুঁকেছেন। ছাই-চাপা আগুন বা মোম-ঢাকা মধুকে খুলে ধরার কৌশলটা কমলার জানা ছিল না বলে স্বামীর মন পাওয়ার প্রয়াসে সে বারবার ব্যর্থ হয়েছে। পরিশ্রমে নয়, সমবেদনায়, অহংকারে নয়, নম্র নিবেদনে একটি রুদ্ধদ্বার হৃদয় উন্মোচিত হয়- এই সত্য কমলার জানা ছিল না।[৪৪]

শরৎচন্দ্রের প্রথম প্রকাশিত গল্প "মন্দির" (রচনাকাল ১৯০৩) 'আদৌ ছোটগল্পের লক্ষণাক্রান্ত'[৪৫] না হলেও এতে নর-নারীর যে সম্পর্কের রূপরেখা পরিবেশিত হয়েছে তা সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বধর্মী। রাজনারায়ণ তনয়া অপর্ণার জীবনে স্বামী অমরনাথের কোনো প্রভাবই ছিল না। বাল্যেই মাতৃহীন অপর্ণা পিতৃস্নেহে লালিত হয়। বিপত্নীক পিতার সত্ত্বগুণসম্পন্ন আচরণাদির প্রভাব স্থায়ীভাবে তার জীবনকে শরীরী ধর্মের ঊর্ধ্বে নিয়ন্ত্রণ করায় অপর্ণার সমগ্র সত্তায় গৃহদেবতা রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি ও ধার্মিক পিতার বিষয় নিরাসক্তি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে যায়। ফলে দাম্পত্যজীবনে অমরনাথের জন্যে তার হৃদয়ে এতটুকু স্থানও অবশিষ্ট ছিল না। অমরনাথ স্বামীত্বের অধিকার দাবি করলেও অপর্ণা সে দাবি পূরণে সচেষ্ট হয়নি। তার দেহ স্বামীগৃহে থাকলেও মন থাকত পিতৃগৃহের রাধাকৃষ্ণের পদপ্রান্তে। তার কেবলই মনে হত:

> দিনগুলি মিছা কাটিয়া যাইতেছে। আর এই অলক্ষ্য আকর্ষণে তাহার প্রতি শোণিত-বিন্দু সেই পিতৃ প্রতিষ্ঠিত মন্দির-অভিমুখে ছুটিয়া যাইবার জন্য পূর্ণিমার উদ্বেলিত সিন্ধুবারির মত হৃদয়ের কূলে-উপকূলে অহরহ আছড়াইয়া পড়িতেছে।[৪৬]

স্বামী-স্ত্রী পরস্পর পরস্পরের কাছে দুর্বোধ্য অপরাধী হলে যে রূপ মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, অমরনাথ-অপর্ণার মনোজগতেও ঠিক তদ্রূপ জটিলতার চিত্র লেখক অত্যন্ত সুকৌশলে তুলে ধরেছেন এখানে। অপর্ণার অবচেতনে মুক্তি পাবার আকাঙক্ষা যে সুপ্ত ছিল, অমরনাথের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে লেখক তাকে ক্রিয়াশীল করে গল্পে উপস্থাপন করেছেন। এখানে 'অপর্ণার দাম্পত্য জীবনের অসামঞ্জস্য, স্বামীর সঙ্গে তাহার প্রণয়োন্মেষের পথে সূক্ষ্ম বাধা-অন্তরায়গুলি মনস্তাত্ত্বিক চিত্রণ-কৌশল-চিহ্নিত'[৪৭] হওয়ায় গল্পটি বিশিষ্ট মাত্রা অর্জন করেছে নিঃসন্দেহে। আসলে শরৎচন্দ্রের ছোটগল্পে চরিত্রের মনস্তত্ত্বোদঘাটনের ক্ষেত্রে ব্যক্তির অন্তর্জগতে বিদ্যমান অন্তর্দ্বন্দ্বের সঙ্গে সমাজের বহির্দ্বন্দ্বের পারস্পরিক সম্পর্ক গুরুত্ববহ হয়ে উঠেছে। চরিত্রের অন্তর্জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে গল্পে অঙ্কিত ব্যক্তির মনস্তাত্ত্বিক ক্রমবিকাশের পরিচয় তাই স্বাভাবিকভাবেই আমরা প্রত্যক্ষ করি। সমালোচক তাই উল্লেখ করেছেন:

> শরৎ-সাহিত্যের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের আর একটি তাৎপর্য এই যে, ব্যক্তি ও সমাজের অন্তর্দ্বন্দ্ব তাঁর চিত্রিত চরিত্রের মধ্য দিয়ে অধিক পরিমাণে বেশী প্রতিফলিত হয়েছে এবং বাহ্য ঘটনার বেশী প্রশ্রয় না দিয়ে অন্তর্জীবনের ঘটনার প্রতি তিনি অভিনিবেশ করেছেন অধিক পরিমাণে বেশী।[৪৮]

বস্তুত আধুনিক যুগের প্রেরণাজাত স্বতন্ত্র শিল্পরূপ ছোটগল্পের প্রকরণের ভিত্তি গড়ে উঠেছে 'ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির এবং ব্যক্তির সঙ্গে সামাজিক সম্পর্কের ভিতর। তাই সংশয় ও বেদনার যুগের ফসল ছোটগল্প একাধারে ব্যক্তিমূলক ও সমাজমূলক'[৪৯]। স্বাভাবিকভাবেই প্রাক-প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাংলা ছোটগল্পের বিষয়ে তাই প্রতিফলিত হয়েছে প্রাত্যহিক জীবনের সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনা তথা দেশকাল-মথিত জীবন-যন্ত্রণা ও অনন্ত জীবন-জিজ্ঞাসা, 'ঊনবিংশ শতকের আকাশে ছোটগল্পের লেখকেরা যেন সপ্তর্ষির মতো জিজ্ঞাসা রচনা করে অন্তর্জ্বালায় জ্বলেছেন'[৫০]। এ পর্বের গল্পলেখকগণ মানব মনস্তত্ত্ব রূপায়ণে অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তি-সত্তার বাস্তব সত্যকে প্রকাশ না করে সমাজ-সত্তার প্রভাব, নৈতিক আদর্শ ও রক্ষণশীল মনোভাবকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। এমন গভীরতর একাগ্র জীবনমুখী পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধিৎসায় তাই এ পর্বের ছোটগল্পের বিষয় হয়ে উঠেছে বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ, অন্যায়-সংস্কারের বিরুদ্ধে সমালোচনায় মুখরিত, অবচেতনের অন্তর্যন্ত্রণা উন্মোচনের আয়না এবং ব্যক্তি ও সমাজের অদৃশ্য দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের টানাপড়েনের নান্দনিক লেখচিত্র।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. রথীন্দ্রনাথ রায়, *ছোটগল্পের কথা*, পুস্তক বিপণি, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৫৯, পৃ. ১

২. সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, পঞ্চম খণ্ড (১৮৯১-১৯৪১), আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, জানুয়ারি ১৯৯৯, পৃ. ৩৫৪

৩. রথীন্দ্রনাথ রায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮

৪. জ্যোতিপ্রসাদ রায়, *বাংলা ছোটগল্পের বিস্মৃত অধ্যায় (১৮৯০-১৯১৪)*, দে'জ পাবলিশিং,কলকাতা, প্রথম দে'জ সংস্ককরণ, আগষ্ট ২০০৭, পৃ. ১৩

৫. বিনয় ঘোষ, *বাংলার নবজাগৃতি*, ওরিয়েন্ট লংম্যান, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃ. ১৫১

৬. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, *সাহিত্যে ছোটগল্প*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, প্রথম 'মিত্র ও ঘোষ' সংস্করণ, শ্রাবণ, ১৪০৫, পৃ. ১৭০

৭. রথীন্দ্রনাথ রায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৮

৮. সরোজমোহন মিত্র, *বাংলায় গল্প ও ছোটগল্প*, তুলসী প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃ. ৫৭

৯. সত্যচরণ চট্টোপাধ্যায়, *বাংলা ছোটগল্পের ক্রমবিকাশ*, প্রজ্ঞাবিকাশ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ,১৯৯৮, পৃ. ২৭

১০. ইন্দ্রাণী চক্রবর্তী, *বাংলা ছোটগল্প রীতি-প্রকরণ ও নিবিড় পাঠ*, রত্নাবলী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৪, পৃ. ২৯

১১. "দামিনী" গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় ভ্রমর, জ্যৈষ্ঠ, ১২৮১ সংখ্যায়। "রামেশ্বরের অদৃষ্ট" প্রকাশিত হয় ভ্রমর, বৈশাখ ১২৮১ সংখ্যায়।

১২. ভূদেব চৌধুরী, *বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার*, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, চতুর্থ প্রকাশ, পুনর্মুদ্রণ, ১৯৯৯, পৃ. ৭৩

১৩. Buddhadeva Bose, *An Acre of Green Grass*, papyrus reprint series, November, 1982, P. 14

১৪. বাসন্তী মুখোপাধ্যায়, *রবীন্দ্র কথাসাহিত্যে চরিত্র ব্যাখ্যান*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮০ পৃ. ৮২

১৫. জ্যোতিপ্রসাদ রায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮

১৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "পোস্টমাস্টার", *গল্পগুচ্ছ*, প্রতীক প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৫, পৃ. ১৭

১৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন", *গল্পগুচ্ছ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০

১৮. সৈয়দ আকরম হোসেন, *প্রসঙ্গ : বাংলা কথাসাহিত্য*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৭, পৃ. ২১

১৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "ত্যাগ", *গল্পগুচ্ছ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮

২০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬০

২১. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, *কালের পুত্তলিকা বাংলা ছোটগল্পের একশ' দশ বছর : ১৮৯৭-২০০০*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ ২০১০, পৃ. ৩৮-৩৯
২২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "মধ্যবর্তিনী", *গল্পগুচ্ছ*, পূর্বোক্ত, পৃ ১২১
২৩. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩
২৪. তপোব্রত ঘোষ, *রবীন্দ্র-ছোটগল্পের শিল্পরূপ*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ ১৩৯৭, পৃ. ১২৩
২৫. আহমদ রফিক, *ছোটগল্পের শিল্পরূপ পদ্মাপর্বের রবীন্দ্রগল্প*, অনিন্দ্য প্রকাশ, ঢাকা, প্রথম অনিন্দ্য সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ২০১২, পৃ. ৯৩
২৬. বাসন্তী মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৪
২৭. অনিন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, *প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্প : মননে ও সৃজনে*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৫, পৃ. ৩৯
২৮. বাসন্তী মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৫
২৯. ভূদেব চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৫
৩০. সুমিতা চক্রবর্তী, *ছোটগল্পের বিষয়-আশয়*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জুন ২০০৪, পৃ. ২৮-২৯
৩১. সরোজমোহন মিত্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬০
৩২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "শুভবিবাহ", *আধুনিক সাহিত্য*, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৩১৪, পৃ. ১৩৩
৩৩. সত্যচরণ চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯
৩৪. ভূদেব চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৫
৩৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৫
৩৬. শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায়, *বঙ্গসাহিত্যে উন্যাসের ধারা*, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, সপ্তম পুনর্মুদ্রণ সংস্করণ, ১৯৮৪, পৃ. ২১৭
৩৭. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, "হিমানী", *প্রভাত-গ্রন্থাবলী(১ম- ৫ম ভাগ)*, বসুমতী সাহিত্যমন্দির, কলিকাতা, পৃ. ১৭৪
৩৮. শিবেশকুমার চট্টোপাধ্যায়, *প্রভাতকুমার : জীবন ও সাহিত্য*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, সেপ্টেম্বর ১৯৭৩, পৃ. ২৫
৩৯. অরুণকুমার রায়চৌধুরী, *অস্বাভাবিক মনস্তত্ত্ব*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৪, পৃ. ৩৪৭
৪০. প্রভাতকুমার মুখপাধ্যায়, "প্রিয়তম", পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯০
৪১. গিরিন্দ্র শেখর বসু, স্বপ্ন, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিছদ, কলিকাতা, ১৯৫০, পৃ. ১২৬
৪২. নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, *বাংলা ছোটগল্প সংক্ষিপ্ত সমালোচানা*, পরিভাষা কমিটি, আশুতোষ বিল্ডিং, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা, পৃ. ১২৩-১২৪

৪৩. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৮

৪৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১১

৪৫. শুদ্ধসত্ত্ব বসু, *শরৎ সমীক্ষা*, মণ্ডল বুক হাউস, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, ভাদ্র ১৩৮২, পৃ. ২২৭

৪৬. সুকুমার সেন (সম্পা), *শরৎ সাহিত্য সমগ্র*, অখণ্ড সংস্করণ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম অখণ্ড সংস্করণ, ১৩৯২, পৃ. ১৬৬৮

৪৭. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩১

৪৮. দেবকুমার বসু, *কল্লোলগোষ্ঠীর কথাসাহিত্য*, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম করুণা সংস্করণ, ২০০৪, পৃ. ১৫৫

৪৯. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭১

৫০. অলোক রায়, *সাহিত্য-কোষ*, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ৮৪

পরিপ্রেক্ষিত : দুই

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলা ছোটগল্পে মানব মনস্তত্ত্ব

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক বিশ্ব ইতিহাসের ক্ষেত্রে একটি তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ কাল। ভারতবর্ষের দিকে তাকালে দেখতে পাই ১৯০৫ সালের ১৬ ডিসেম্বরের বঙ্গভঙ্গকে ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর রদ করা হয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাঙালির জাতীয় জীবনে এক যুগান্তকারী আলোড়ন দেখা দিয়েছিল। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন (১৯০৫-১৯১১) তথা স্বদেশী আন্দোলন সমগ্র বাঙালির জীবনে উৎসাহ, উদ্দীপনা, ঐক্য, সংহতি, আবেগ, বিক্ষোভ ও প্রেরণার সঞ্চার করেছিল। কিন্তু বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশী আন্দোলনের প্রাণবন্ত উদ্দীপনায় স্তিমিত ভাব লক্ষ করা যায়। যুবমানসে ক্লান্তি, হতাশা ও প্রাণহীনতা দীর্ঘতর হতে থাকে। অন্তর্জগতে ও বহির্জগতে এক ধরনের নৈরাশ্য ও শূন্যতাবোধ মানুষকে গ্রাস করে নিতে থাকে।

এই দশকের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮), যা বাংলা তথা ভারতীয় ভৌগোলিক সীমারেখা থেকে বহুদূরবর্তী দেশ ইয়োরোপে প্রত্যক্ষভাবে সংঘটিত হলেও তার প্রভাব পড়েছিল সমগ্র পৃথিবী জুড়ে। বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাতে বিশ্বের জনজীবনে প্রথম একটি আকস্মিক বিপর্যয় নেমে আসে। দীর্ঘদিনের প্রচলিত, শান্ত জীবনস্রোতে হঠাৎ এসে পড়ে আবর্ত। সেই আবর্তে মানুষের প্রচলিত বিশ্বাস, মূল্যবোধ, ধ্যানধারণা নিমেষে তলিয়ে যায়। ইয়োরোপের জনজীবনে এই যুদ্ধের প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ে। কিন্তু ভারতবর্ষ সরাসরি এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েনি। ইয়োরোপীয় শক্তির ঔপনিবেশিক অধীনতার সূত্রে দূর থেকে ভারতবর্ষের মানুষ সেই যুদ্ধের বার্তা শুনেছে। ভারতবর্ষ তথা বাংলাদেশের মানুষের কাছে অপ্রত্যক্ষ হলেও তার পরোক্ষ প্রভাব বিভিন্নভাবে এদেশের জনজীবনে অঙ্কিত হয়েছে। আধুনিক রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার কল্যাণে পৃথিবীর প্রান্তিক দূরত্ব অভাবনীয়ভাবে গেছে কমে। আধুনিক বিশ্বের প্রত্যেকটি দেশ পারস্পরিকভাবে রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতির বন্ধনে আবদ্ধ। ফলে ব্রিটিশ উপনিবেশের শাসনের মাধ্যমে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বার্তা ও প্রতিক্রিয়া বাংলার মাটিতে প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করেছে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকট ধীরে ধীরে গ্রাস করে নিয়েছে বাঙালি জনজীবনকে। সমাজজীবনেও তার অভিঘাতজনিত রূপান্তর পরিলক্ষিত হয়। প্রমথ চৌধুরী যথার্থই বলেছেন, 'গত যুদ্ধের প্রবল ধাক্কায় সমাজের কি আর্থিক, কি রাজনৈতিক সকল ব্যবস্থারই গোড়া আলগা হয়ে গেছে'।[১] মূলত এই বিশ্বযুদ্ধ পাশ্চাত্যবাসীর মনে যে হতাশ্বাস, শূন্যতা ও বিষাদের জন্ম দিয়েছিল তা যেমন আমাদের বাঙালি শিক্ষিত তরুণসত্তাকে প্রভাবিত করেছিল, তেমনি যুদ্ধের পরোক্ষ কারণে অর্থনৈতিক চেতনার রূপান্তরের সূচনা হয়েছিল। জীবিকার্জনের জন্য খুব সম্মানীয় নয়, এমন কাজও গ্রহণে বাধ্য হয়েছিল শিক্ষিত বেকার যুবকরা। এই যুগের তরুণ সাহিত্যিকদের অর্থাভাবের চিত্র পাই সমকালীন সাহিত্যিক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের *কল্লোল যুগ* গ্রন্থে:

> এমনি অর্থাভাব প্রত্যেকের পায়ে পায়ে ফিরেছে ..... শৈলজা খেলার বস্তিতে থেকেছে, পানের দোকান দিয়েছিল ভবানিপুরে। প্রেমেন ওষুধের বিজ্ঞাপন লিখেছে, খবরের কাগজের প্রুফ দেখেছে। নৃপেন টিউশনি করেছে, বাজারের ভাড়াটে নোট লিখেছে।[২]

'দারিদ্র্যের নগ্ন বীভৎসতা, মনের হীনতা আর উপবাসী লালসার লোলুপতা'[৩] জীবনের এই কদর্য দিকগুলির সঙ্গে নিত্য পরিচিতি ঘটতে লাগল আধুনিক সাহিত্যিকদের। কেননা :

> যে-কোনো যুদ্ধ-মানবতা-বিনাশী যে-কোনো হিংস্রতার উল্লাসই যে পৃথিবীর বুদ্ধিজীবীর মননে ও কল্পনায় কী সংকট ঘনিয়ে আনে–সাহিত্যের পাঠক মাত্রেই তার সঙ্গে পরিচিত আছেন। দার্শনিক এবং সাহিত্যিকদের ওপরেই এর আঘাত সব চাইতে বেশি করে পড়ে। প্রথম ও দ্বিতীয়–এই দুটি যুদ্ধই অগণিত শিল্পী-সাহিত্যিককে 'Waste Land' এর পোড়া জমিতে পরিপূর্ণ নৈরাশ্যর মধ্যে নিক্ষেপ করেছে।[৪]

আলোচ্য কালখণ্ডে বাংলা ছোটগল্পে যাঁরা আবির্ভূত হয়েছেন, বিনাশী যুগধর্মের প্রভাবে তাঁদের রচনায় প্রকৃত অর্থেই প্রকট আকারে দেখা দিয়েছে মানব মনস্তত্ত্বের বিচিত্র টানাপড়েন। পাশাপাশি ফ্রয়েডের মনস্তত্ত্ববিষয়ক নতুন নতুন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বিশ্বসাহিত্যের মতো বাংলা সাহিত্যেও, বিশেষত কথাসাহিত্যে নিয়ে আসে আমূল পরিবর্তন। তাঁর *The Interpretation of Dreams (১৯১৩), The Psychology of Everyday Life* (১৯১৪) প্রভৃতি গ্রন্থ মানুষের যৌনতা বিষয়ক প্রচলিত নীতিবোধ ধূলিসাৎ করে দেয়। ফলে বাহ্যিক জীবন আলেখ্য নয় ; মনোজগতের গভীরতর জটিলতার সন্ধান ও মানুষের অবচেতন যৌনকামনার শিল্পরূপ সৃজনে এ পর্বের লেখকগণ অধিকমাত্রায় উৎসাহী হয়ে উঠলেন। যুদ্ধোত্তর বিপন্ন সময়পর্বে সামগ্রিক এই সমাজপটভূমিতে দাঁড়িয়ে যেসকল তরুণতর লেখকগোষ্ঠী নতুন পরিচয় নিয়ে আবির্ভূত হলেন বাংলা সাহিত্যে, তাঁরা মূলত 'কল্লোল' (১৯২৩-২৭), 'কালিকলম' (১৯২৬), 'প্রগতি' (১৯২৭) পত্রিকাকে কেন্দ্র করেই তাঁদের সাহিত্য বলয় গড়ে তুললেন। কল্লোল পত্রিকা ছিল তরুণ লেখকদের আত্মপ্রকাশের মৌল-বাহন, তাই তাঁরা অভিহিত হলেন কল্লোলগোষ্ঠীর লেখক হিসেবে। অপরদিকে :

> প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে ফ্রয়েডীয় গবেষণা ও মনোবিশ্লেষণীরীতি তরুণ কল্লোলীয়দের আকর্ষণ করেছিল সবচেয়ে বেশি। এর অপর কারণ হল, বয়সের দিক থেকে যৌবনধর্মের বাহক ছিলেন এই সব তরুণেরা।[৫]

মূলত এ সকল তরুণ লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি এবং মূল্যবোধ রক্ষণশীলতার বিপরীত মেরুতে ছিল ক্রিয়াশীল। এক অর্থে তাঁরা সকলেই ছিলেন সৃষ্টিশীল সচেতন শিল্পী। রবীন্দ্রনাথের সুস্থির প্রসন্ন ও সরল জীবন চেতনায় এরা আস্থা রাখতে পারেননি। সমকালের উর্মিমুখর জীবন জটিলতা, অস্থির চিত্ত, পলায়নবাদী মানসিকতার কাছে রবীন্দ্রনাথ আর অপরিহার্য এবং যুগোপযোগী বিবেচিত হল না। ছোটগল্পে 'কল্লোল' এর এই প্রবণতা সম্পর্কে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের ভাষ্য নিম্নরূপ:

> রবীন্দ্রনাথ থেকে সরে এসেছিল 'কল্লোল'। সরে এসেছিল অপজাত ও অবজ্ঞাত মানুষের জনতায়। নিম্নগত মধ্যবিত্তদের সংসারে। কয়লাকুঠিতে, খোলার বস্তিতে, ফুটপাতে। প্রতারিত ও পরিত্যক্তের এলাকায়।[৬]

রবীন্দ্রনাথের রচনাভঙ্গি ও তার প্রাবল্য থেকে এ যুগের সাহিত্যিকরা নিজেদের মুক্ত রাখতে উৎসাহী ও তৎপর ছিলেন বলেই তাঁরা নতুন ভঙ্গিতে কিছু বলার প্রয়োজন অনুভব করেছেন, 'এতে তাঁদের শিল্পীসত্তার সচেতনতাই প্রমাণিত হয়েছে'।[৭] কাজেই বোঝা যায় এই নবীন সাহিত্যিকদের রবীন্দ্র-বিরোধিতার অর্থ রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করা নয়, বরং আত্মরক্ষার তাগিদে রবীন্দ্রনাথ থেকে তাঁদের সরে আসা। তাঁকে এড়িয়ে বাংলা সাহিত্যে কিছু করা সম্ভবও ছিল না। তাই বুদ্ধদেব বসুর সরল স্বীকৃতি, 'Rabindranath Tagore is a phenomenon'.[৮]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলা ছোটগল্পের আসরে যাঁরা দীপ্র বিচরণ করেছেন, তাঁরা হচ্ছেন নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত (১৮৮২-১৯৬৪), জগদীশচন্দ্র গুপ্ত (১৮৮৬-১৯৫৭), দীনেশরঞ্জন দাশ (১৮৮৮-১৯৪১), গোকুলচন্দ্র নাগ (১৮৯৪-১৯২৫), বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০), মণীন্দ্রলাল বসু (১৮৯৭-১৯৮৬), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১), শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯০০-১৯৬৭), মনীশ ঘটক (১৯০১-১৯৮০), অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩-১৯৭৬), প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮), প্রবোধকুমার সান্যাল (১৯০৫-১৯৮৩), বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬) প্রমুখ শিল্পী। এঁদের মধ্যে যাঁরা কল্লোলচেতনার শিল্পী বলে আখ্যায়িত

হয়েছেন, তাঁরা হলেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, মনীশ ঘটক, প্রবোধকুমার সান্যাল, জগদীশ গুপ্ত, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। এ সকল লেখকের মানসপ্রবণতা উল্লেখসূত্রে সমালোচক বলেন :

> কল্লোলের চেতনায়, কল্লোলের সাধনায় যে বোহেমিয় মনোভাবের স্ফুরণ তার প্রকৃতি ইওরোপীয় মনোভাবের সূত্রে বাঁধা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর ইওরোপের মানসভাণ্ডারে যে হতাশ্বাস, নৈরাশ্য, শূন্যতাবোধ বিষাদচেতনা জমেছিল তার প্রকাশ ঘটেছিল তার সাহিত্যে শিল্পে। বাঙালী মানস সেই ইওরোপীয় ভাবধারার সঙ্গে নিজের প্রকৃতিকে যুক্ত করল।[৯]

তবে কল্লোল এর পূর্ববর্তী লেখক নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, কিংবা মণীন্দ্রলাল বসুর গল্পে যে জীবনচেতনার সাক্ষাৎ পাই, তাতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর মানব মনস্তত্ত্বের প্রাথমিক কাঠামোসূত্র প্রোথিত। মূলত বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসে মধ্যবিত্ত বাঙালির মনস্তত্ত্বের শিল্পরূপ নির্মাণে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছেন নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। রবীন্দ্রনাথের মতো প্রতিভাধর না হলেও রবীন্দ্রনাথের "নষ্টনীড়" গল্পের সূত্র ধরেই নরেশচন্দ্রের আবির্ভাব "ঠান্‌দিদি" (১৯১৮) গল্পের মাধ্যমে। বাংলা ছোটগল্পের ধারায় এটি একটি স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত গল্প। "নষ্টনীড়" এর প্লটের সঙ্গে এই গল্পের প্লটের আংশিক সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হলেও "নষ্টনীড়" এ রবীন্দ্রনাথ অনেক সংযত। সেখানে চারু অমলের প্রতি নিজের প্রেম সম্পর্কে প্রথম থেকে সচেতন নয়, অমল দূরে সরে যাওয়ার পর সে নিজেকে আবিষ্কার করেছে। "ঠান্‌দিদি" গল্পে নরেশচন্দ্র আরো দুঃসাহসী। মানুষের জীবনে যৌনতাও যে এক প্রবল সত্য তাকে নরেশচন্দ্র স্বীকৃতি দিয়েছেন এই গল্পে। মুখ্যত এ গল্পে উগ্র যৌনচেতনার প্রকাশ ও মানব মনস্তত্ত্বের জটিল চিত্র উদঘাটনে সেকালের রক্ষণশীল পত্রিকা 'নারায়ণ' (১৩২১) নরেশচন্দ্রের সাহসের প্রশংসা উল্লেখসহ মন্তব্য করেছিল সমাজ-নিষিদ্ধ কামনার মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ঐ গল্পের উপজীব্য। আলোচ্য গল্পে ঠান্‌দিদি প্রথম থেকেই আকর্ষণ অনুভব করেছে পিসতুতো দেবর শচীকান্তের প্রতি ; এমনকি স্বামীর মৃত্যুর পরও তার সেই প্রেম জাগ্রত। সে দেবরকে বলেছে :

> আমি জানি, তুমি আমায় ভালবাস। এমনকি, আমারও মনে হয়েছে যে, শত চেষ্টা সত্ত্বেও আমি যেন তোমাকে সমস্ত প্রাণ-মন দিয়ে ভাল না বেসে, আমার সমস্ত জীবন দিয়ে তোমাকে আকাঙ্ক্ষা না করে পারিনি। --- তোমাকে দেখলে আমার লোভ হয় ; তুমি আমার কাছে আর এসো না।[১০]

Dhaka University Institutional Repository

এখানে ভ্রাতৃবধূ-দেবর সম্পর্কের মধ্যে যে জটিল প্রেম-মনস্তত্ত্ব অঙ্কিত হয়েছে তা ফ্রয়েড ও এলিস দ্বারা প্রভাবিত। গল্পে উল্লিখিত চরিত্রদ্বয়ের অবচেতন যৌনকামনা ও তজ্জাত নানা মনস্তাত্ত্বিক অসঙ্গতির উপস্থিতি লক্ষণীয়। সমালোচকের ভাষায় :

> ফ্রয়েড এর Development of the 'Libido' and Sexual organisations এর বিভিন্ন পথ এর যে পরিচয় ফ্রয়েড দিয়েছেন, তারই অনুসরণ এই গল্পে নিহিত।[১১]

নর-নারীর যৌন মনস্তত্ত্বের চিত্র উপস্থাপনে অধিক মনোযোগী নরেশচন্দ্রের "দ্বিতীয় পক্ষ" (১৯১৯) গল্পেও মানবমনের বিভিন্ন অসঙ্গতির চিত্র লক্ষ করা যায়। দ্বিতীয় বিয়েকে যুক্তিসম্মত করতে গল্পের নায়ক ভবভূতির যুক্তিমালার অন্তরালে লেখক যৌন মনস্তত্ত্বের জগতে উপনীত হয়েছেন। স্বভাবতই ভবভূতি উপলব্ধি করে :

> ভালোবাসাটাকে আমি বেশ ভালো জিনিস বলেই মনে করি। সেটা হচ্ছে নিয়ত প্রবৃত্তি। সমাজের অভিজ্ঞতা যে গণ্ডীতে প্রবৃত্তিকে আবদ্ধ করেছে, তার ভিতর প্রবৃত্তিটা ভালোই বলতে হবে।[১২]

কল্লোল–পূর্ববর্তী মণীন্দ্রলাল বসুর গল্পে এই বিজ্ঞান-নির্ভর যৌন মনস্তত্ত্বের প্রসঙ্গ আছে কিন্তু পরিতৃপ্তি নেই। মূলত 'রোমান্টিক স্বপ্নাতুরতা, ভাববিলাস, অক্ষয় যৌবনরাগ মণীন্দ্রলালের গল্পকে দিয়েছে এক বিরল স্বাতন্ত্র্য।'[১৩] *মায়াপুরী* (১৯২৩), *সোনার হরিণ* (১৯২৪), *কল্পলতা* (১৯৩৫) গল্পগ্রন্থে মণীন্দ্রলাল মানব মনস্তত্ত্বের যে রূপরেখা অঙ্কন করেছেন তা মধ্যবিত্তশ্রেণির মনস্তত্ত্ব এবং এ শ্রেণির সামূহিক অবক্ষয় ও নৈতিক-সামাজিক ভাঙনে মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা প্রকট আকার ধারণ করেছে। এ প্রসঙ্গে গোপিকানাথ রায়চৌধুরীর মন্তব্য স্মর্তব্য :

> সমকালীন মধ্যবিত্ত বুদ্ধিবাদী বাঙালী যুবচিত্তের যে হাহাকার, হাতাশা, অপূর্ণতা ও অক্ষমতা-সেই যৌবনযন্ত্রণা ও জীবনপিপাসা রূপ লাভ করেছে মণীন্দ্রলালের নায়কের কঠিন নিঃসঙ্গতা এবং শান্তস্নিগ্ধ প্রেমের জন্য তীব্র করুণ-মধুর কামনায়। মণীন্দ্রলাল এমন করেই সমকালীন যৌবনের যন্ত্রণা ও যন্ত্রণামুক্তির পথ নির্দেশ করতে চেয়েছেন।[১৪]

যুদ্ধোত্তর প্রতিবেশে নাগরিক মধ্যবিত্তের বিনষ্টির যন্ত্রণা এবং অস্তিত্বসঙ্কটের বেদনা মণীন্দ্রলালের লেখকসত্তাকে করেছে প্রাণিত। সমকালীন মধ্যবিত্তের মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব তাঁকে পীড়িত করলেও বাস্তব অভিজ্ঞতার অভাব তাঁর গল্পগুলোকে সার্থক করে তুলতে পারেনি।

'কল্লোল' এর প্রধান কুশীলব গোকুলচন্দ্র নাগ ও দীনেশরঞ্জন দাশের গল্পে অতৃপ্ত যৌবনের নানা অসঙ্গতি ও অসন্তোষ, অবচেতন যৌনকামনার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। রোম্যান্টিক স্বপ্নবিলাসময় জগৎ থেকে বিচ্যুত হয়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের অবক্ষয়, হতাশা, যৌবনরাগ আর পরিবর্তনের উদ্দামতায় মুখর এঁদের গল্পভুবন। জীবনের অন্তরঙ্গ রূপ পরিদর্শনে বিচরণ করতে গিয়ে গোকুলচন্দ্রের গল্পের মধ্যে ফ্রয়েড-কথিত 'অবদমনের' পরিচয় প্রথম দেখা গেল। এই পরিচয়ের সমর্থনে উল্লেখ করা যায় 'কল্লোলে' প্রকাশিত তাঁর "বসন্ত বেদনা" (১৯২৫) গল্পটি। গল্পের নায়িকা সুরভির অকাল বৈধব্য তাকে অসুখী করায় তার বুভুক্ষ চিত্তের অন্তঃশায়ী কামনাকে সহানুভূতির সঙ্গে চিত্রিত করেছেন লেখক। সমাজ লঙ্ঘন করতে পারেনি বলে সুরভির অন্তর্দাহ ও যৌবনযন্ত্রণা হয়েছে সুতীব্র। 'ফ্রয়েড-এর প্রভাবে বাংলা ছোটগল্পে 'মামুলী পথ' বর্জনের ইঙ্গিত সর্বপ্রথম দৃষ্টিগোচর হ'ল এই গল্পে'।[১৫] মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি অবদমিত হলে তার মনস্তাত্ত্বিক বিকাশের পথে অন্তরায় সৃষ্টি হয়। গল্পে সুরভির অকাল বৈধব্য তার যৌনপ্রবৃত্তি পূরণে প্রতিবন্ধক ; তাই তার অবদমিত প্রবৃত্তিগত তাড়না মনস্তাত্ত্বিক বিকাশের ক্ষেত্রে সহায়ক হয়ে ওঠেনি।

মূলত নরেশচন্দ্র-মণীন্দ্রলাল-দীনেশরঞ্জন-গোকুলচন্দ্রের গল্পে 'যে রোম্যান্টিক স্বপ্নচারিতা, আবেগস্নিগ্ধ গীতিউচ্ছলতা, যৌবনবেদনা আর বিদ্রোহ-বিক্ষোভ রূপায়িত হয়েছে, তা প্রশস্ত করে দেয় কল্লোলচেতনা আবির্ভাবের পথরেখা।'[১৬] কল্লোলচেতনার লেখক হিসেবে যাঁরা বাংলা ছোটগল্পের ধারায় পরিচিতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন, তাঁরা সকলেই আধুনিক শিল্পদৃষ্টির অধিকারী ; যুগের

বিপন্নতা আর ভয়াবহতা এঁদের চেতনার মর্মমূলে থেকেছে ক্রিয়াশীল। বিজ্ঞাননিষ্ঠ মন আর আধুনিক শিল্পচেতনায় আস্থা রেখে এসময়ের গল্পসাহিত্যে জীবনের মূল্যায়ন করতে গিয়ে শরীরজ বিষয়গুলোর ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন এ যুগের গল্পলেখক। ফলে চিন্তায়, মননে এবং প্রেম-ভাবনায় যৌন-মনস্কতা এবং সম্ভোগ-স্পৃহা অনুপেক্ষিত তো হলোই, উপরন্তু এই উপাদানগুলোকে উপজীব্য করে গল্পের ধারা অগ্রসর হলো চূড়ান্ত সিদ্ধির লক্ষ্যে। কল্লোলের অন্যতম প্রতিনিধি অচিন্ত্যকুমারের ছোটগল্পে নরনারীর যৌন মনস্তত্ত্বের চিত্র লক্ষণীয়। সমালোচকের মতে:

> উগ্র ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য, ভবঘুরে জীবনযাত্রা, মিথুনাসক্তি, স্থবির ও প্রতিষ্ঠিতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, উগ্র যৌন চেতনা ও যৌবনের উদ্দাম উন্মাদনা, প্রচলিত নীতি ও মূল্যবোধের অস্বীকৃতি, আত্মবিস্তারী প্রেমচেতনা, আত্মানুসন্ধানী ব্যক্তির অস্থিরতা, ব্যর্থতা, স্বপ্নপ্রবণতা : সবটা মিলিয়ে অচিন্ত্যকুমার।[১৭]

সমকালের অনিকেত মানসিকতা, মধ্যবিত্তজীবনের সর্বগ্রাসী নৈঃসঙ্গতা ও অবক্ষয় এবং ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনের সার্থক রূপচিত্রই অচিন্ত্যকুমারের গল্পসমূহের প্রাসঙ্গিক বিষয়। তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ *টুটাফুটা* (১৯২৮)-তে যৌনব্যাকুলতার উল্লাসই প্রধান উপাদান। এ গ্রন্থের "সন্ধ্যারাগ" গল্পটিতে মনস্তত্ত্ব সমর্থিত যৌন-প্রতিভাস বা যৌন প্রতিনিধিত্বের তত্ত্ব প্রখরতর হলেও যৌন উন্মাদনাই মুখ্য উপাদান। *ইতি* (১৯৩১) গল্পগ্রন্থের নাম গল্পে মনোবিকলন-আশ্রিত জীবনদর্শনের পরিচয় রয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও উগ্র নগ্নতার উল্লাস এ গল্পে স্তিমিত। বরং সৌন্দর্যপিয়াসী মনের পরিচয় এখানে উদঘাটিত। 'অরণ্য' গল্পটিতে আছে স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় মানুষের মনোবিশ্লেষণ; এই গল্পটি ছোটগল্প হিসেবে অত্যন্ত সার্থক। বিষয়বস্তু পরিবেশনায়, বিভিন্নমুখী চরিত্র সৃজনে এবং ঘটনা পরম্পরায় নির্দিষ্ট গতিপথে ধাবমান একমুখীনতা গল্পটিকে স্বকীয় মাত্রা এনে দিয়েছে। একান্নবর্তী পরিবারের মনস্তত্ত্ব নির্মাণে এ গল্পে লেখকের করণকুশলতার পরিচয় লক্ষণীয়। পরিবারের সকলে যখন একসঙ্গে মিলিত হয় তখন আতিশয্যের উচ্ছ্বাসে ধরা পড়ে না কোনটি আসল আর কোনটি কৃত্রিম। কিন্তু যখন তারা বিচ্ছিন্ন হয় তখনই ধরা পড়ে যায় তাদের পারস্পরিক আত্মিক সম্পর্কহীনতা। এরা সকলেই স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় ও আত্মমগ্ন। সকলের স্নেহের পাত্র রুশের দুর্ঘটনা এদের সকলকে এক বিন্দুতে এনে দাঁড় করিয়েছে এবং উপলব্ধ হয়েছে মানুষের অসহায় ও নৈরাশ্যবোধ।

"অমর কবিতা" গল্পে ফ্রয়েডীয় মনোবিশ্লেষণের সার্থক চিত্র লক্ষ করা যায়। প্রথম সন্তান খুকির মৃত্যুতে নির্মলা কবি হয়ে উঠেছে। খুকিকে সে বাঁচিয়ে রাখতে চায় শিল্পের ভুবনে। মৃত্যুশোকে কবিতা রচনা ও মৃত ব্যক্তির ছবি আঁকা হয়তো নতুন কিছু নয়। কিন্তু নির্মলার ক্ষেত্রে এটাই অসম্ভব রকমের হাস্যকর ও অধিক পর্যায়ে চলে গেছে বলে সে সকলের কাছেই হাস্যাস্পদ হয়ে উঠেছে এমনকি স্বামীর কাছেও। পুতুলকে খুকি কল্পনা করে দিনে রাতে তার কাঁথা পরিবর্তনের মধ্যে আর যাই হোক চেতনস্তরের স্বাভাবিক ক্রিয়া পর্যায়ে একে উন্নীত করা যায় না। অধিকাংশ সমালোচকই এই গল্পটিকে ফ্রয়েডীয় অবচেতনবাদের আলোকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। অবচেতনের কোনো প্রকারের পাপবোধ থেকেই তার এই চেতনা বিকৃতি।

অবচেতনে সুপ্ত থাকা কন্যা সন্তানের প্রতি অনীহাই চেতনস্তরের পরিবর্ত ক্রিয়ায় কন্যার মৃত্যুকে ঘোরতর অস্বীকৃতির মধ্যে তাকে টেনে এনেছে। কিন্তু বাস্তব যে নির্মমভাবেই সত্য, তাই অচিরেই তার চেতন সত্তার এই ব্যর্থ প্রয়াস বাস্তবের প্রতিঘাতে চূর্ণ হয়ে যেতেই অবচেতনের বাধাহীন আত্মপ্রকাশ ঘটেছে আত্মরতির মধ্য দিয়ে। কেননা মাতৃত্ব ও সন্তান বাৎসল্য একধরনের আত্মরতিই। সন্তানের মধ্যে মা নিজেকেই প্রত্যক্ষ করে। তাই পরিশেষে নির্মলা খুকির মূর্তি তৈরি করতে গিয়ে নিজের মূর্তি গড়েছে। মাতৃত্বের আদর্শগত মূল্যবোধের অন্তরালে তার নিরাবরণ রূপটিকে তুলে ধরে মানবসত্তার অসহায় দিকটিকে প্রকাশ করাই এ গল্পের উদ্দেশ্য।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে মনস্তত্ত্বের একাধিক প্রবাহে চিন্তা ও মননের ক্ষেত্রে যে যৌন প্রভাবের স্বীকৃতি এল তার পরিচয় কল্লোলের অধিকাংশ গল্পলেখকের রচনায় বিভিন্নভাবে অনুসৃত হয়েছে। আলোচ্য কালপর্বে কল্লোলগোষ্ঠীর লেখক হিসেবে আখ্যায়িত হলেও প্রেমেন্দ্র মিত্র ছিলেন কল্লোলবলয় থেকে ভিন্নতর এক জগতের বাসিন্দা। তাঁর গল্পে নাগরিক মধ্যবিত্তের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা এবং যৌনবিকৃতির চিত্র সূক্ষ্মভাবে অঙ্কিত হয়েছে। "শৃঙ্খল", "হয়তো", "পোনাঘাট পেরিয়ে" গল্পে দাম্পত্যজীবনের বিচিত্র মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার প্রান্ত উন্মোচনে গল্পকার প্রেমেন্দ্র মিত্র স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। "হয়তো" ও "শৃঙ্খল" গল্পে 'দাম্পত্যের ভেতরে অস্থিরতা, সন্দেহ বাতিকগ্রস্ততা, গল্পদুটিকে জটিল মনস্তত্ত্বের দিকে নিয়ে গেছে'।[১৮] দুটো গল্পের নায়ক চরিত্রের সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা তাদের দাম্পত্যজীবনের পথে অন্তরায় হয়ে উঠেছে। 'শৃঙ্খল' গল্পের নায়ক ভূপতি মানুষের

স্বাভাবিকতাকে, তার স্বাভাবিক স্নেহ, কোমলতাকে আঘাত করে যে এক নিষ্ঠুর আনন্দ লাভ করে, তা তার বিকৃত মানসিকতা ও বিকৃত রুচিরই পরিচয়বাহী। মানুষকে অহেতুক অপমান করে ভূপতির যে আত্মসুখ লাভ তা মূলত এক ধরনের আচরণগত বিকৃতি। আত্মসুখের জন্যে অপরকে নিগ্রহ করার এই আচরণগত বিকৃতি মনোবিজ্ঞানের পরিভাষায় 'সাদীয়রুচি' বা 'ধর্ষকাম' (Sadism) বলে অভিহিত করা হয়। আলোচ্য গল্পে প্রথম থেকেই ভূপতির মধ্যে এই নির্মমতা আমরা দেখতে পাই। বিয়ের পর প্রথম দিনের প্রথম আলাপেই ভূপতির অদ্ভুত আচরণে তার স্ত্রী বিনতি বিস্মিত হয়, আহত হয়, এমনকি ভীতও হয়। শুধু স্ত্রীকে আঘাত দিয়েই সে তৃপ্ত হয় না– গল্প থেকে আমরা জানতে পারি, যে মা তাকে পঁচিশ বছর ধরে অনেক ত্যাগ স্বীকার করে নানা দুঃখকষ্টের মধ্য দিয়ে মানুষ করেছেন, সেই মাকেও অহেতুক বাক্যবাণে বিদ্ধ করে, অপমান করে এক অদ্ভুত আনন্দ অনুভব করে ভূপতি :

> সংসারের মসৃণ সামঞ্জস্যকে ভাঙিয়া চুরিয়া বিশৃঙ্খল বিকৃত করে তোলায় ভূপতির যেন অহেতুক একটা আনন্দ আছে। তাহার চেয়েও বেশি-ছোটোখাটো নিষ্ঠুরতাই যেন তার বিলাস।[১৯]

ভূপতির এরূপ আচরণগত বিকার সমগ্র গল্পজুড়ে ক্রিয়াশীল থেকেছে। 'বিদ্বেষ ও বিতৃষ্ণার দুশ্ছেদ্য শৃঙ্খলে এই দম্পতি যেভাবে বাধা পড়েছে, প্রেমের চেয়েও তার তীব্রতা ও উন্মাদনা বেশি'।[২০] "হয়তো" গল্পটি পূর্ববর্তী গল্পের অনুরূপ আর এক নিষ্ঠুর গল্প। তবে বক্ষ্যমাণ গল্পে দুটি গল্প সন্নিবেশিত হওয়ায় গল্পের নামকরণ সার্থক হয়ে উঠেছে। এই গল্পের নায়ক মহিমও একজন বিকৃত মানসিকতার অধিকারী ; কিন্তু তার এই বিকৃতি আধুনিক ঔপনিবেশিক নগরজীবনের সংশয়, হতাশাজাত বিকৃতি নয়। তার বিকৃতি এসেছে অন্য এক পাপবোধ, অপরাধচেতনা থেকে। এক সময়ের সামন্ততান্ত্রিক বংশের শেষ প্রতিনিধি মহিমের পরিবারে নারীদের নিয়ে যে অসম্মান এবং অনাচার চলেছে, সেই অপরাধবোধ মহিমকে প্রতিমুহূর্তে দংশন করেছে। মহিমের অন্তর্জগতে বিদ্যমান সুপ্ত অপরাধবোধ থেকে মানুষের প্রতি, বিশেষত নারীর প্রতি তার সে সন্দেহ এবং অবিশ্বাস উদ্ভূত হয়েছে, সেগুলো প্রকাশ পায় তার অদ্ভূত অস্বাভাবিক আচরণে। কখনো সে রাতে শোবার সময় লাবণ্যের আঁচল তার কাপড়ের সঙ্গে গিঁট দিয়ে বেঁধে রাখে, লাবণ্য যদি কোথাও অন্তর্হিত হয় এই আতঙ্কে। আবার কখনো বাড়ির বাইরে কোথাও গেলেও সে লাবণ্যকে শিকল বন্ধ করে রাখে। মহিমের এই অস্বভাবী মনস্তত্ত্ব অত্যন্ত শিল্পসম্মতভাবে প্রেমেন্দ্র মিত্র গল্পে উপস্থাপন করেছেন। সন্দেহ ও দোলাচলবৃত্তি মানব মননের চিরন্তন বিষয় হলেও এই বিরল জটিলতা মানবমনের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে

সতত বিচরণশীল। লেখক এখানে অবচেতনের সেই অন্ধকার তলগুলো কয়েকটি বিচিত্র মানসিকতাসম্পন্ন চরিত্রের আচরণের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন।

দাম্পত্যজীবনের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা রূপায়ণের পাশাপাশি প্রেমেন্দ্র মিত্র যৌনমনস্তত্ত্ব নির্ভর কিছু গল্পও রচনা করেছেন যেগুলো ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনধর্মী পর্যায়ভুক্ত। এধারার একটি গল্প "স্টোভ", যা অসাধারণ একটি প্রতীকী গল্প, 'প্রতীকের তীক্ষ্ণমুখে মানুষের মনকে এমন কৌশলে ধরবার দক্ষতা প্রেমেন্দ্র মিত্র বোধহয় তেমনভাবে আর পারেননি'।[২১] গল্পে শশিভূষণ ও বাসন্তীর পাঁচ বছরের গড়ে ওঠা সংসারে শশিভূষণের প্রাক্তন প্রেমিকা মল্লিকা হঠাৎই বেড়াতে এসেছে। আলোচ্য গল্পে শশিভূষণ একজন ব্যক্তিত্বহীন পুরুষ, যে মল্লিকাকে জীবনে গ্রহণ করবে কথা দিয়েও তা রাখার মতো সাহস অর্জন করতে পারেনি। যদিও মল্লিকাকে তার বাড়ির সকলে চিনত। মল্লিকার কাছ থেকে দূরে পালিয়ে গিয়ে সে যেন দায়িত্ব এড়িয়ে গেছে। অপরদিকে বাসন্তী বিয়ের দিনই আত্মীয় ও তথাকথিত শুভাকাঙ্ক্ষীদের কাছ থেকে অবগত হয় মল্লিকার সঙ্গে তার স্বামীর প্রাক-বিবাহ প্রেমের বিষয়ে। এতে তার মন ভরে ওঠে তিক্ততায়, আর স্বামীর আশ্চর্য নীরবতা তাকে আরো ক্ষুব্ধ করে তোলে। ক্রমশ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার মনের ওপর পলি জমতে জমতে যখন তার বিক্ষোভ স্তিমিত হয়ে এসেছে, তখনই হঠাৎ একদিন মল্লিকা নিজেই অযাচিতভাবে তাদের বাড়িতে উপস্থিত হয়েছে। অতিথি আপ্যায়নে চা করার জন্য বাসন্তী একটি পুরনো স্টোভ জ্বালিয়েছে, যেটি যে কোনো মুহূর্তে ফেটে যেতে পারে। যে স্টোভটি বহুদিন অব্যবহৃত বিস্ফোরণ ঘটার ভয়েই, সেটি সেদিনই বাসন্তীকে ব্যবহার করতে দেখে শশিভূষণ সচকিত হয়ে উঠেছে। স্টোভটির দপ দপ করা, আঁচ নেমে যাওয়া আবার হঠাৎ তীব্র গর্জনে জ্বলে ওঠা–এসব কিছুই গল্পের চরিত্রসমূহের আচার-আচরণ এবং মনস্তত্ত্বকে নির্দেশ করে :

> মল্লিকা মাথা নিচু করেই হঠাৎ ঈষৎ চাপা গলায় বলে, 'এভাবে এসে বোধ হয় ভালো করিনি।' না, না, খারাপ আবার কিসের? শশিভূষণ কেমন একটু আড়ষ্ট ভাবেই জবাব দেয়। স্টোভটা হঠাৎ দপ দপ করে ওঠে, তারপর আঁচটা কেমন নেমে যায়। বোধ হয় নিজের অজান্তেই মল্লিকা একটু করে সরে বসে পাম্প দিতে আরম্ভ করে। স্টোভের শিখাটা বেড়ে ওঠার সঙ্গে কর্কশ আওয়াজটায় সমস্ত ঘর ভরে যায়। হঠাৎ শশিভূষণ অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে বলে, 'আরে, আরে করচ কী ! অত পাম্প দিয়ো না।' পাম্পটা নামিয়ে মল্লিকা

> শশিভূষণের দিকে চেয়ে একটু অবাক হয়েই জিজ্ঞাসা করে, 'কেন? 'মানে, স্টোভটা অনেকদিনের পুরোনো, খারাপ হয়ে গেছে, হঠাৎ ফেটে যেতে পারে।'
>
> শশিভূষণের চোখে পরিপূর্ণ স্থির দৃষ্টি দেখে মল্লিকা বলে, 'তা হলে ভয়ানক একটা কেলেঙ্কারি হয়, না ?' শশিভূষণ কেমন একটু সংকুচিতভাবে চোখটা সরিয়ে নেয়। মল্লিকা সমানে স্টোভটায় পাম্প দিতে থাকে। কেতলির তলা থেকে নীল আগুনের শিখা হিংস্র গর্জন করে চারিধারে যেন ফণা তোলে।[২২]

এখানে শশিভূষণের অন্তঃসারশূন্য মানসিকতা এবং মল্লিকার অবদমিত মনের ক্ষোভ, যন্ত্রণা স্টোভটিকে কেন্দ্র করে প্রকাশিত হয়েছে। আবার বাসন্তীও বিয়ের পর বহুদিন পর্যন্ত স্বামীর নির্বিকার ঔদাসীন্যে তার অবদমিত যৌনকামনার অপূরণে দিনের পর দিন ক্লান্ত হয়ে মৃত্যু কামনা করেছে স্টোভটির ভস্মীভূত হওয়ার মধ্য দিয়ে। সমালোচকের ভাষায় :

> ত্রিকোণ প্রেমের সমস্যাকে উপস্থাপিত করে মনস্তত্ত্বকে অসাধারণ দক্ষতায় বিশ্লেষণ করেছেন প্রেমেন্দ্র এই গল্পে, পুরোনো বাতিল করা একটি স্টোভ প্রতীকী মর্যাদা পেয়েছে যেমন এই গল্পে, সেই সঙ্গে গল্পটি মনস্তাত্ত্বিকতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে আছে বাংলা সাহিত্যে।[২৩]

'কল্লোলগোষ্ঠীর রোম্যান্টিক স্বপ্নাতুর গীতিকাব্যসুরভিত কথাশিল্পের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য স্রষ্টা বুদ্ধদেব বসু'র[২৪] গল্পে নারীর দেহসর্বস্বতাই একমাত্র বিষয় নয়, সেখানে কখনো কখনো প্রেমের মহিমার পরিচয়ও পাওয়া যায়। পাশাপাশি আধুনিক জীবনে প্রেমের জটিল মনস্তত্ত্বের চিত্রও তাঁর গল্পে অনুপস্থিত নয়। বলা যায় 'মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তিনি বাংলা সাহিত্যে অদ্বিতীয়'।[২৫] এ প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর সরল স্বীকারোক্তি :

> খুব সম্ভব আমি স্বাভাবিক গল্পলেখক নই। আমার উদ্ভাবনী শক্তি দুর্বল ; ঘটনার চাইতে বর্ণনার দিকে আমার ঝোঁক, নাটকীয়তার চাইতে স্বগতোক্তির দিকে, উত্তেজনার চাইতে মনস্তত্ত্বের দিকে।[২৬]

'কল্লোল' পত্রিকায় প্রকাশিত ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রকাশিত তাঁর প্রথম গল্প "রজনী হলো উতলা"-তে জীবনের আদিম জৈবপ্রবৃত্তির ছবি অঙ্কিত হয়েছে। 'এই গল্পে কামাতুরতা ও সম্ভোগ-স্পৃহা থাকলেও মানুষের আদিম-স্বভাবের দিকে লেখক গভীর ইঙ্গিত করেছেন'।[২৭] মুখ্যত 'মানুষের অবচেতন মনের যৌন পিপাসার আতিশয্য এক মধুর কাব্যরসবাহী ভাষায় রূপ লাভ করেছে এ গল্পে'[২৮] –সমালোচক কথিত এমন মন্তব্যের পূর্ণ প্রতিফলন নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিতে লক্ষণীয় :

> তার গন্ধে আমার সর্বাঙ্গ রিমঝিম ক'রে উঠলো।[২৯]

যৌন-জীবনে দেহ ও মনের, কাম ও কামনার, সম্ভোগ ও প্রেমের দ্বৈত সম্পর্ককে গল্পকার এই গল্পে অধিক গুরুত্ব দান করেছেন। একই সাথে নরনারীর সম্ভোগ-প্রবৃত্তি ও যৌন আকাঙ্ক্ষার বিশ্লেষণে এখানে বুদ্ধদেব যে কাব্যিক ভাষা ব্যবহার করেছেন তা সত্যিই প্রশংসার দাবিদার। একই ধারার গল্প "এমিলিয়ার প্রেম" (১৯৩২)-এ নরনারীর ভোগ ও সুখবাদের চিত্র অঙ্কিত হলেও তাতে বিষাদময় এক পরিণতি সৃষ্টি করে গল্পটিকে ভিন্ন আবহে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। গল্পে ইটালিতে বড় হয়ে ওঠা অভিজাত সুন্দরী এমিলিয়ার সঙ্গে গভীর প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে চিত্রকর ভাস্করের। এর মধ্যে প্রেম নেই, আছে শুধু সম্ভোগ তৃষ্ণা। এমিলিয়ার জীবনে যখন তার পূর্বপ্রণয়ীর পুনরাবির্ভাব ঘটল, কুশলী শিল্পীর মতো ভাস্কর দেহ সম্ভোগকালীন এমিলিয়াকে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করেছে। ঈর্ষা আর সন্দেহের বশবর্তী হয়ে ভাস্করের এরূপ আচরণগত বিকৃতি জটিল মনস্তত্ত্বেরই স্বাক্ষরবাহী।

বুদ্ধদেব বসু ছোটগল্পে নীতিশাস্ত্রের নির্দেশ মেনে মনস্তত্ত্বের প্রয়োগ করেননি। নিয়ম বহির্ভূত মনস্তত্ত্ব তাঁর নিজস্ব প্রতীতি। "রোদ" (১৯৩৫) গল্পের নায়ক সুরথকে বিগত দিনের শৈশবস্মৃতি আকুল করে তোলে। শৈশবের সেই মধুর দিনগুলোকে ফিরে পেতে অন্তর তার তৃষিত। কিন্তু সেই পরিস্থিতি যখন এল, রোদ গলা পিচে গলদঘর্ম অবস্থায় সে অনুভব করল যে শৈশবস্মৃতি যতই মধুর হোক না কেন, পরিণত বয়সের বাস্তবতাকে আর স্বীকার করে নিতে পারে না।

"বজ্রধর ও শর্বরী রায়" (১৯৩৬) গল্পে প্রেমের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে বুদ্ধদেব দেখিয়েছেন যে প্রকৃত প্রেমের অধিষ্ঠান হয় মানসলোকে, মানবচিন্তায় প্রেমের সুরবিতানই তার চিরস্থায়ী আসন। তাই প্রেমকে দিনের প্রাত্যহিক ব্যবহারের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে গল্পের নায়ক বজ্রধর তার প্রেমিকার কাছ থেকে দূরে সরে গেছে। জীবন সম্পর্কে উদাসীন দৃষ্টিভঙ্গি এবং একটানা বিষাদের স্বচ্ছ আবরণে আবদ্ধ বজ্রধরের মনস্তত্ত্ব নির্মাণে গল্পকারের কৃতিত্ব তুলনারহিত। মানব মনস্তত্ত্বের নানা অন্তর্গূঢ় জটিলতাকে, রহস্যকে আরো একধাপ এগিয়ে নিয়ে গেছেন 'কল্লোল' পর্বের অপর সাহিত্যিক মনীশ ঘটক। অচিন্ত্য সেনগুপ্ত *কল্লোল যুগ* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন :

> বলতে গেলে মনীশই 'কল্লোলে'র প্রথম মশালচী। সাহিত্যের নিত্যক্ষেত্রে এমন সব অভাজনকে সে ডেকে আনল যা একেবারে অভূতপূর্ব। তাদের একমাত্র পরিচয় তারাও মানুষ ... যে জীবন ভগ্ন, রুগ্ন, পর্যুদস্ত, তাদেরকে সে সরাসরি ডাক দিলে, জায়গা দিলে প্রথম পংক্তিতে ... দেখালে তাদের ঘা, তাদের পাপ, তাদের নির্লজ্জতা। সমস্ত কিছুর পিছনে দয়াহীন দারিদ্র্য।[৩০]

অচিন্ত্যকুমারের এই উক্তি থেকেই মনীশ ঘটকের দৃষ্টিভঙ্গির অভিনবত্ব ও আধুনিকতা সম্পর্কে আমরা ধারণা পেতে পারি। মূলত পটলভাঙার পাঁচালীকার মনীশ ঘটক 'অসঙ্গতি আর বীভৎসতার পঙ্কে পৌনঃপুনিক বিচরণ করেছেন ; তাই অসঙ্গতি, বিকৃতি আর যৌন-পঙ্কিলতার রূপচিত্রণে মনীশ ঘটক এক ক্লান্তিহীন শিল্পী।'[৩১] প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর ঘূর্ণাবর্ত পরিবেশে সমাজজীবনের ভয়ঙ্কর অন্ধকারের দিকে আলো ফেলে তিনি গল্প নির্মাণ করেছেন। *পটলডাঙার পাঁচালী* (১৯৫৬) গ্রন্থের গল্পগুলো যখন 'কল্লোল'-এর বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে, তখন থেকেই তাঁর ছোটগাল্পিক প্রতিভার দ্যুতি ছড়িয়ে পড়েছে। এসব গল্পে 'অন্ধকূপের' মানুষের নিরাবরণ জীবনের ছবি অঙ্কিত হয়েছে। 'এখানে প্রেম নেই, আছে মানুষের মত অবয়বগুলির নিরন্তর জৈব সংঘর্ষ, এখানে স্নেহ নেই, মমতা নেই, দাম্পত্যের বন্ধন নেই, শুধু আছে পিচ্ছিল নারকীয় উদ্দামতা। টর্চের আলো সরে যায়, বীভৎস, ভয়াল আদিমরূপ আলোর বৃত্তে এসে পড়ে।'[৩২] এই চিত্রকে জীবন্ত করে তোলার জন্য তিনি এই শ্রেণির মানুষের মুখের অসংযত ভাষাকেও ব্যবহার করেছেন গল্পের সংলাপে। ফলে তাদের জীবনচিত্রণে বাস্তবতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আমাদের কাছে যা অসুস্থ, অকল্পনীয়, তা-ই এসব অন্ধকার জগতের বাসিন্দাদের কাছে সত্য হয়ে ধরা দিয়েছে। 'তাদের জীবনে সামাজিক মূল্যবোধগুলো, স্বামীর-স্ত্রীর সুস্থ সম্পর্ক 'ভড়ং' ছাড়া আর কিছু নয়'।[৩৩] জীবনের বিকৃত ক্ষুধা, জীবনযাত্রার নগ্নরূপের চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে এসব গল্পে যা সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বধর্মী। 'কালনেমি' (ফাল্গুন ১৩৩১) গল্পের নায়ক

রেলে পা-কাটা ডাকু অকর্মণ্য হয়ে স্ত্রী ময়নাকে নিয়ে বাসা বেঁধেছে পটলডাঙার খেঁদি পিসির বাড়িতে। ভিক্ষাবৃত্তি করে দিন যাপন করলেও তাদের দাম্পত্যজীবন অসুস্থ, ক্ষণভঙ্গুর হয়ে ওঠে। কেননা পটলডাঙায় দাম্পত্যজীবন নিষিদ্ধ ; প্রেম-প্রীতি-বাৎসল্য এখানে অবান্তর, বিলাসিতা। তাই গল্পের শেষে বস্তির রতন কর্তৃক ময়না ধর্ষিত হলে এর 'বিহিত-ব্যবস্থা' করার জন্য যখন সে তার স্বামীর কাছে আসে, তখন ডাকু স্ত্রীর এই অসহায় অবস্থাকে নিজের অসহায়তায় আরও বাড়িয়ে দেয়। বিধ্বস্ত, বিপর্যস্ত ময়নাকে দেখে তার লালসা জাগে। বিস্মিত ময়নার কাছে পরপুরুষ আর স্বামীর ভেদরেখা দূরীভূত হয়। গল্পের শেষাংশে দেখি :

> অস্ফুট শুষ্ক গলায় ডাকু বলল, কোতা চললি ময়না ?
>
> -রতনার কাছে।
>
> সে চলতে শুরু করল।
>
> যেতে যেতে সে শুনতে পেল ডাকু বলছে, দোহাই তোর, একটিবার আসিস রেতে-[৩৪]

এখানে তিনটি মানুষের মনোবিশ্লেষণ যেভাবে গল্পে প্রযুক্ত হয়েছে তা সত্যিই বিরল। "রাতবিরেতে" (চৈত্র ১৩৩১) গল্পেও এক বিচিত্র অথচ কদর্য জীবনযাত্রার আরেক বিকৃতরূপ উন্মোচিত হয়েছে। আলোচ্য গল্পে ঝুমনের সদ্যজাত শিশু চুরি ও কেনা-বেচার অন্ধকার জগৎ আলোর বৃত্তে এসে সারা শরীরে যেন শিহরন তোলে। 'মদ্দার চেয়ে মাদীর দাম বেশি' এই বিশ্বাসে আস্থাশীল ঝুমনের যাবতীয় মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়া- আচরণের মধ্যে তার বীভৎস, কুৎসিত চিত্র গল্পে বর্ণিত হয়েছে। আসলে গল্পটিতে তরুণ মনের কিছু অতিরেক বা উগ্রতা প্রকাশ পেলেও লেখকের দৃষ্টি কখনই পঙ্কিল বা বিকৃত নয়। বৃহৎ জীবনকে তিনি নিছক সংকীর্ণ শুভ সামাজিক দৃষ্টিতে সীমিত করে দেখতে চাননি, চেয়েছেন জীবনের সত্য রূপকে তুলে ধরতে।

কল্লোল যুগের অন্যতম লেখক প্রবোধকুমার সান্যালের ছোটগল্পে যুদ্ধোত্তর বিপর্যস্ত সমাজ পরিবেশের চাপে আধুনিক মানুষের বিকৃত মনস্তত্ত্বের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। মূলত ছোটগল্পে 'মানবমনের বিকারের ছবি আঁকাতে তাঁর নৈপুণ্য দেখা যায়'।[৩৫] এ ধারার গল্পে মানবমনের নৈতিক অধঃপতনের পূর্ণ

প্রতিফলন ঘটে থাকে। এ প্রসঙ্গে "গুহায় নিহিত" গল্পটির কথা বলা যেতে পারে। গল্পটি লেখকের মনোবিকলন সংক্রান্ত একটি উল্লেখযোগ্য রচনা। মানুষের অন্তর্জীবনের মৌলিক সমস্যাভিত্তিক আলোচ্য গল্পে কলেজের অধ্যাপক প্রিয়কুমার ও তার অতি সরল গ্রাম্যবধূ প্রতিমার সংসারে প্রিয়কুমারের প্রাক্তন প্রেমিকা দেবীরাণীর আকস্মিক আগমনে এবং দু-তিনটি দিন যাপনের মধ্যে যে অলক্ষ্য প্রেমের, ঈর্ষার, চাতুরির অভিনয় চলতে থাকে, তা অতি নৈপুণ্যের সঙ্গে চিত্রিত করেছেন লেখক। তিনটি চরিত্রের মানস-আলোড়নের দ্বন্দ্বময় উন্মোচনে, মানব-অস্তিত্বের বহুধাবিস্তৃত ও জটিল স্বরূপসত্যের রহস্য আবিষ্কারে এবং পরিণামে সর্বজ্ঞ লেখকের সংশ্লেষ রচনার মধ্য দিয়ে গভীরতা, বিস্তৃতি ও ব্যঞ্জনালাভ করেছে। মনোবিশ্লেষণের প্রখরতায় তিনটি চরিত্রের আচরণ, অভিব্যক্তি প্রকাশে লেখক পূর্ণমাত্রায় সচেতন থেকেছেন। এছাড়া "মুক্তিস্নান", "বিষ" গল্পেও মনোবিকারের সার্থক চিত্রণ লক্ষ করা যায়।

ইন্দ্রিয়সচেতন, কাম-প্রবৃত্তি তাড়িত, নিয়তি-লাঞ্ছিত মানুষের মনোবিকলনের গল্পরচনায় সিদ্ধহস্ত এ পর্বের অন্যতম গল্পলেখক জগদীশ গুপ্ত কল্লোলের তরুণ লেখকদের চেয়ে বয়সে প্রবীণ হলেও তাঁর ছোটগল্পে কল্লোলের মূল প্রবণতা অভিব্যক্তি পেয়েছে। জীবনের তির্যক ও সর্পিল গতি অনুধাবন করে তিনি সংশয় আর অবিশ্বাসের চোরাগলিতে বিচরণ করেছেন। মানুষের মনোজগতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে তার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করাই তাঁর ছোটগাল্পিক সত্তার মৌল প্রেরণা। সমালোচক প্রবীর কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে :

> মানবমনের গভীরে প্রবেশ করাই তাঁর শিল্পধর্ম। কাজেই বহিরঙ্গমূলক ঘটনার সংঘাতের চেয়ে মানবমনের গভীরের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকেই তিনি বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন।[৩৬]

মানুষের অন্তর্নিহিত সত্যকে অনাবৃত করে জগদীশ গুপ্ত গল্পে নরনারীর মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে অগ্রসর হয়েছেন। বিশেষ করে প্রবৃত্তি-তাড়িত মানুষের ভোগাকাঙ্ক্ষা এবং তা থেকে সৃষ্ট বিভিন্ন মনোবিকলনের সার্থক রূপায়ণ তাঁর গল্পকে বিশেষত্ব এনে দিয়েছে। গল্পে ক্লিন্ন ও ভোগ-তৃষ্ণার কাছে পরাজিত মানুষের বীভৎস, বিকৃত মনস্তত্ত্ব তিনি তুলে ধরেছেন বিস্ময়কর নিরাবেগে। "আদি কথার একটি" গল্পে সুন্দরী বিধবা যুবতী কাঞ্চনকে ভোগ করার উদ্দেশ্যে নায়ক সুবল কাঞ্চনের পাঁচ বছরের

মেয়ে খুশিকে স্বেচ্ছায় বিয়ে করে তার লালসা চরিতার্থে প্রবৃত্ত হয়। এখানে সুবল ও কাঞ্চনের দেহকামনার জটিল আকর্ষণ ও বিকর্ষণের ফলে যে মনোবিকলনাশ্রিত পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে তা সত্যিই অভিনব। 'লিবিডো-তাড়িত মানুষের গুহানিহিত দেহ-বুভুক্ষা'র[৩৭] এমন সরস বিশ্লেষণ বাংলা ছোটগল্পের ধারায় এনে দিয়েছে স্বকীয় এক মাত্রা।

একই ধারার অন্যত্র গল্প "চন্দ্রসূর্য যতদিন" এ সতীন সমস্যার যৌন দিকটির প্রতি আলোকপাত করে লেখক কেন্দ্রীয় নারী চরিত্র ক্ষণপ্রভার অন্তর্লীন গভীর মনস্তত্ত্বকে অত্যন্ত সার্থক ও দ্বিধাহীনভাবে রূপদান করেছেন। ছোট বোন প্রফুল্লর সঙ্গে স্বামী দীনতারণের বিবাহের ফলে সৃষ্ট মানসিক জটিলতায় ক্ষণপ্রভার যে রূপান্তর গল্পে দেখি, তা ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনাশ্রিত। এখানে দ্বিতীয় স্ত্রীর উপস্থিতিতে স্বামী স্ত্রীর আবেগাত্মক সম্পর্কের মধ্যে যে জটিলতা দেখা দিতে পারে লেখক তা বিশ্লেষণ করেছেন। স্বামী স্ত্রীর পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং প্রেমের অভাবে একান্ত দৈহিক সম্পর্কও যে কীরূপ ভয়াবহ পরিণতির সৃষ্টি করতে পারে তার বিশ্লেষণ গল্পটিতে সততার সঙ্গে অনুসরণ করা হয়েছে। মনোজগতের এরূপ জটিলতার চিত্রণ 'জহর' গল্পেও লক্ষণীয়। আলোচ্য গল্পে নিজের ছোট বোনের সঙ্গে স্বামীর যৌন সম্পর্ক স্থাপিত হলে স্ত্রী কুসুম মানসিক পীড়ন অনুভব করে এবং তারই সূত্র ধরে তার মনোজগতে যে জটিলতার সৃষ্টি হয় তা ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন পর্যায়ভুক্ত। স্বামীকে পীড়ন করতে কুসুম গল্পের বক্তা বলাইয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করে তার কাম চরিতার্থতা প্রকাশ করে। এভাবে জগদীশ গুপ্তের গল্পে মানুষের মনের গুহায়িত প্রান্তর উন্মোচিত হয়েছে। হাসান আজিজুল হকের ভাষায়:

> মানুষের মনের ভিতরের যতো অন্ধকার এবং কালিমা সবই টেনে বের করে এনে তিনি তাঁর সাহিত্য জগৎটি অন্ধকার পরিপূর্ণ করে তুলেছিলেন। ফলে যা ঘটবার তাই ঘটে। প্রচলিত এবং অভ্যস্ত মূল্যবোধগুলি চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়, তথাকথিত মহৎবৃত্তিগুলি কালিমালিপ্ত হয় এবং সৌহার্দ্য, সহানুভূতি, দয়ামায়া, ত্যাগ ও সহযোগিতা ইত্যাদি যে মূল্যবোধগুলি উপর সমাজ দাঁড়িয়ে থাকে সেগুলি জগদীশ গুপ্তের সাহিত্যে লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়।[৩৮]

জগদীশ গুপ্তের মতো এ যুগের অন্যতম লেখক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের গল্পেও প্রবৃত্তি-তাড়িত মানুষের জটিল মনস্তত্ত্বের ছবি অঙ্কিত হয়েছে। কয়লাকুঠির পটভূমিতে এক গুচ্ছ গল্প রচনা করে তিনি ছোটগল্পের ধারায় উপস্থিত করেছেন অবজ্ঞাত-অনাদৃত কুলিমজুর আর সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বকে। তিনি নিজেই বলেছেন, 'আমার গল্পের সর্বপ্রথম পরিমণ্ডল কয়লাখনি এবং চরিত্রেরা সব কুলিমজুর'।[৩৯] কয়লাকুঠির এসকল কুলিকামিনরা কামপ্রবৃত্তিতাড়িত ; ফলে তাদের ইন্দ্রিয় লালসার নিপুণ চিত্র বিশ্লেষণে লেখক মনস্তত্ত্বের আশ্রয় নিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে "নারীর মন" ('কল্লোল', জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০) গল্পের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। বক্ষ্যমাণ গল্পের মুখ্য চরিত্র ভুলির স্বামী কীরু মাঝি স্ত্রী অপেক্ষা শ্যালিকা টুরনীর প্রতি অধিক প্রণয়াসক্ত। টুরনীও জৈবিক লালসার বাসনা পূরণে সংযমের সীমা অতিক্রম করেছে। কীরুর সঙ্গে অবাধ সংস্রবে তার কোনো দ্বিধা নেই। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কীরুর স্ত্রী ভুলির ঈর্ষা এবং তা থেকে সৃষ্ট জটিলতা গল্পটিকে মনোবিকলনধর্মী পর্যায়ে নিয়ে গেছে। গল্পের শেষাংশে স্বামীর স্নেহবঞ্চিতা ভুলি যখন মনের দুঃখে আসামের চা বাগানে চলে যেতে ট্রেনে চড়ে, তখন বিচ্ছেদের পূর্বমুহূর্তে স্বামীর জন্য নয় জীবনে এত বড় বিশৃঙ্খলার যে মূল কুশীলব, সেই টুরনীর জন্য তার চোখে জল আসে যা সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বধর্মী :

> ট্রেন ছাড়িয়া দিল। ভুলির চোখ দুইটা ছল ছল করিয়া আসিল। দূরে পলাশবনের ভিতর দিয়া টুরনী ছুটিতে ছুটিতে স্টেশনের দিকে আসিতেছিল ভগিনীকে একবার প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া লইয়া ভুলি জানালার পাশে সরিয়া বসিল।
>
> ভুলির চোখে জল দেখিয়া একটা সাঁওতালের মেয়ে বলিল–কাঁদছিস কেনে ?
>
> ভুলি চোখের জল মুছিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল,–ধ্যুৎ কাঁদব কেনে লো ?[৪০]

এখানে নারীহৃদয়ের এই মানসিক পরিবর্তন মনস্তত্ত্বসম্মত উপায়ে উদঘাটন করা হয়েছে। আসলে শৈলজানন্দ তন্ময় দৃষ্টিতে নরনারীর আদিম দেহ পিপাসার ছবি দেখেছেন, তাই শরীরীকামনার পটভূমিতে

বড় বিচিত্র এই পরিণতি ; তবে মানবমনের আসল পরিচয়ই এই বৈচিত্র্য। কয়লাকুঠির এসব নিম্নবিত্ত মানুষের পাশাপাশি মধ্যবিত্তসমাজকে নিয়েও কিছু মনস্তাত্ত্বিক গল্প শৈলজানন্দ রচনা করেছেন। সমালোচক হীরেন চট্টোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন :

> চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক গতিপ্রকৃতির গভীর অনুভবে এবং তার বাস্তবসম্মত নিঁখুত বিবরণে এইসব গল্প এক সমুচ্চ সাহিত্যিক মর্যাদা লাভ করেছে। গল্প তার নিজস্ব পথ পরিক্রমা করেছে অথচ চরিত্রগুলি মনস্তত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে। মানুষের মনের গভীরে প্রবেশ করবার মত তীব্র অনুভূতি ও সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তির যথেষ্ট পরিচয় এসব গল্পে উপস্থিত।[৪১]

মূলত এ ধারার গল্পে নর-নারীর সম্পর্কের বৈচিত্র্য এবং অদ্ভুত মনস্তত্ত্ব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। যেমন ধরা যাক, "ইহাদের ঘিরি ঘুরিছে পৃথ্বী" গল্পটি। গল্পের নায়ক কালীচরণের আচরণগত মনস্তত্ত্ব নারীসুলভ। যে বাড়ির ফ্ল্যাটে তার বসবাস সে বাড়ির অন্যান্য ফ্ল্যাটের বধূদের সঙ্গেই তার আন্তরিকতা অধিক। এমনকি তার গতিও অন্দরমহল এবং রন্ধনশালাতেই বেশি। এর নেপথ্যে রয়েছে তার স্বভাবগত মনস্তত্ত্ব। স্ত্রী বিভা স্বামীর এমন অদ্ভুত আচরণের সীমা মেনে নিতে অপারগ হয়ে অমরের মতো তৃতীয় শ্রেণির একটি লম্পটের সঙ্গে গৃহত্যাগে উদ্যোগী হলে অসহায় স্বামীর পরম নিশ্চিন্ত ভঙ্গি দেখে তার মানসিক রূপান্তর ঘটে। নিতান্ত একটি শিশুর মতো স্বামীকে ডেকে যখন বলে 'দ্যাখো তো বাইরে কে যেন'[৪২] তখন তার এই অদ্ভুত বদলে যাওয়া মনস্তাত্ত্বিক আচরণ গল্পটিকে উজ্জ্বল করে তোলে। নিপুণ পর্যবেক্ষণ এবং গভীর বাস্তববোধের সাহায্যে এ ধরনের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে শৈলজানন্দ ছোটগল্পের যে জগৎ নির্মাণ করেছেন তা এক কথায় তুলনারহিত।

শৈলজানন্দের শিল্প-প্রবণতার উত্তরসূরী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পেও মানুষের আদিম জৈব প্রবৃত্তি এবং জটিল মনস্তত্ত্বের পূর্ণ প্রকাশ ঘটেছে। তবে শৈলজানন্দ যেখানে কয়লাকুঠির নিম্নবিত্ত মানুষের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার চিত্র তুলে এনেছেন, তারাশঙ্করের দৃষ্টি তাঁর নিজস্ব ভৌগোলিক পরিমণ্ডল রাঢ় বাংলার মানুষের জীবনবৃত্তে স্থান পেয়েছে। এ প্রসঙ্গে সুকুমার সেন বলেছেন :

> তারাশঙ্করকে শৈলজানন্দের সহযাত্রী বলতে পারি। শৈলজানন্দ কয়লাকুঠির সাঁওতাল জীবন লইয়া সীমাবদ্ধ অঞ্চলের কাহিনী রচনার পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তারাশঙ্কর লইলেন তাঁহার দেশ দক্ষিণ-পূর্ব বীরভূমের সাধারণ লোকের জীবন।[৪৩]

মূলত জৈবচেতনার শৈল্পিক রূপ অঙ্কনের ক্ষেত্রে কল্লোলগোষ্ঠীর অন্যান্য লেখকের সঙ্গে তারাশঙ্করের মানসধর্মের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য উভয়ই অনুভব করা যায়। কল্লোল চেতনা যৌন প্রবৃত্তির বিচার ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে স্বভাবতই কুণ্ঠাহীন। ব্যর্থতা, হতাশা ও সংশয় কল্লোলগোষ্ঠীর চিরাচরিত বৈশিষ্ট্য। কিন্তু তারাশঙ্করের রচনায় এই হতাশা ও সংশয় নেই। ব্রাত্য সমাজের আদিমতার ক্ষেত্রে তাঁর ছোটগল্পে অঙ্কিত হয়েছে দুরন্ত জীবন পিপাসা ও সহজাত যৌন প্রবৃত্তি যা তাদের জীবন প্রতিবেশের সঙ্গে একান্তভাবেই মানানসই। মানবজীবনের জৈব চেতনা রহস্যময়ী, কেননা তার রূপ বিভিন্ন। তারাশঙ্কর তাঁর গল্পে জীবজগতের সঙ্গে মানব সম্পর্কের মধ্যে জৈব রহস্যের এক বিচিত্র রূপ অঙ্কন করেছেন।

"কালাপাহাড়" গল্পে যেমন আছে ভয়ঙ্কর মহিষের প্রবৃত্তিতাড়িত ভালোবাসার বিয়োগান্ত পরিণাম, "নারী ও নাগিনী" গল্পে তেমনি উঠে এসেছে নেশাখোর সাপুড়ে খোঁড়া শেকের নাগিনীর প্রতি তীব্র আসক্তি ও বিকৃত মনস্তাত্ত্বিক আচরণ। এ গল্পে জোবেদার প্রতি স্বামী খোঁড়ার আকর্ষণ স্বাভাবিক জৈবিক আকর্ষণ। কিন্তু সেটাই অস্বাভাবিক ও বিকৃত হয়ে ওঠে যখন নাগিনীর প্রতি খোঁড়ার জৈবিক আকর্ষণ প্রকাশ পায়। খোঁড়ার জীবনে এই অস্বভাবী মনস্তত্ত্ব উদ্ভূত হয়েছে তার সহজাত প্রবৃত্তির মধ্য দিয়ে। জোবেদার প্রতি আকর্ষণ সাহজিক ক্রিয়া, পক্ষান্তরে নাগিনীর প্রতি আকর্ষণ সুপ্ত বিকৃত যৌন প্রবৃত্তি হতে উপজাত। এর ফলে খোঁড়ার অবচেতন স্তরের বিকৃত কাম যেমন অনাবৃত হয়েছে, তেমনি তার অবচেতনের সুপ্ত রূপ তৃষ্ণা এই বিকৃত কাম প্রবৃত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ফ্রয়েড যেমন বলেছেন যার মনোজগত অসুস্থ বা অপ্রকৃতিস্থ তার সামাজিক ও নৈতিক অবস্থান যাই হোক না কেন তার যৌন জীবনও অপ্রকৃতিস্থ হবে। ঠিক এ গল্পে তারাশঙ্কর খোঁড়ার বিকৃত মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে ফ্রয়েডের উক্ত বক্তব্যেরই প্রতিধ্বনি করেছেন। তাই যুগ চেতনা ও ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনতত্ত্বের অবতারণায় গল্পটির গুরুত্ব অপরিসীম।

'বীভৎস আদিম প্রবৃত্তি এবং ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনের গল্পরূপ নির্মাণে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সিদ্ধি শীর্ষবিন্দুস্পর্শী এবং অনতিক্রান্ত'[৪৪] –সমালোচক কথিত এমন মন্তব্যের পূর্ণ প্রতিফলন দেখি বিজ্ঞানের ছাত্র, 'কল্লোলের কুলবর্ধন'[৪৫] মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পসমূহে। মূলত 'অবচেতন ও অচেতনের আঁধার-লোকে, মনোগহনের জটিল সর্পিল পথে, কূটৈষণার পথে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গোড়া থেকেই স্বচ্ছন্দ পরিক্রমা'[৪৬]; প্রবল আগ্রহ নিয়েই পড়েছেন যৌনবিজ্ঞান ও মানবমনস্তত্ত্ব[৪৭]। ফলে তাঁর প্রথম পর্বের গল্পে মানবমনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম জটিলতার প্রান্ত উন্মোচিত হয়েছে স্বাভাবিকভাবেই। মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রের কূটৈষণা, অবদমিত আকাঙ্ক্ষা এবং যৌন প্রবৃত্তির অন্তর্গূঢ় জটিলতার ফলে সৃষ্ট বিভিন্ন মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া যেমন মাতা ও পুত্রের আসক্তিজনিত ইদিপাস কমপ্লেক্স, পিতা-পুত্রীর ইলেকট্রা কমপ্লেক্স প্রভৃতির সার্থক রূপায়ণ গল্পে পরিবেশিত হয়েছে। যেমন : "শৈলজ শিলা", "মহাকালের জটার জট" গল্পে মাতার প্রতি পুত্রের এবং পিতার প্রতি কন্যার পক্ষপাতমূলক যৌন আকর্ষণ বর্ণিত হয়েছে। "মহাকালের জটার জট" গল্পে সুচিত্রা ও পঞ্চু এবং মনোরমা ও খোকার চরিত্রে ইদিপাস কমপ্লেক্স এর পরিচয় চিত্রিত হয়েছে। 'সন্তান হারানোর শোকে আত্মহারা মনোরমার পুত্র-সংক্রান্ত উপলব্ধির মধ্যে এর প্রকাশ "মহাকালের জটার জট" গল্পে অতিশয় স্পষ্ট'।[৪৮] এখানে মনোরমার এই আচরণ ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞান সম্মত। গল্পে দেখি শিশুকে আদর করতে গিয়ে তাকে বক্ষে জড়িয়ে ধরে মনোরমার যৌনপ্রবৃত্তি উদ্দীপিত হয়েছে। অতৃপ্ত যৌন আকাঙ্ক্ষাই তার এরূপ মনোবিকারের মূল কারণ। ফ্রয়েডের মতে মানসিক রোগের কারণ হল অচেতন মনে সঞ্চিত শৈশবকালের অবদমিত ও অতৃপ্ত বাসনা এবং আবেগ। এ গল্পে মনোরমার মনের অতৃপ্ত কামনার পরিপূর্ণতা লাভ করেছে শিশুপুত্রের মাধ্যমে। সমালোচকের মতে :

> মনোরমার স্বামী-সঙ্গ কামনার অনুরূপ কামনা সন্তানের মধ্যে লাভ করেছে। এখানে সন্তানের স্পর্শ স্বামীর অনুষঙ্গ এনেছে। এ থেকে প্রমাণিত হয় আমাদের মনের যাবতীয় ক্রিয়া হল কামজ।[৪৯]

মাতা-পুত্রের এরূপ আসক্তিজনিত বিকৃতির পাশাপাশি পিতা-পুত্রীর মনোবিকারের চিত্র "শৈলজ শিলা" গল্পে মানিক তুলে এনেছেন। আলোচ্য গল্পে দেখি নায়ক তার পালিত কন্যা শিলার প্রেমে মত্ত হয়ে তাকে বিয়ে করবে বলে মনস্থির করল। 'শিলার সঙ্গে রক্ত সম্পর্কহীন এই ব্যক্তি ঘটনাপরম্পরায় একান্ত বাধ্য হয়েই শিলাকে প্রতিপালনের দায়িত্ব নিলেও ধীরে ধীরে তার মধ্যে রূপজমোহ ও লালসার এক বিষবৃক্ষ পত্রপল্লবিত হয়।'[৫০] কিন্তু শৈলে যার জন্ম এবং শিলা যার নাম সে শক্ত, অনঢ়

হয়ে থেকেছে, দাদুর প্রেমে সে সাড়া দেয়নি। অসম বয়সী দাদুর এ আচরণ শিলার কাছে অসঙ্গত মনে হয়েছে। কিন্তু অকৃতদার এই দাদুর এরূপ যৌন আকর্ষণ শিলার দৃষ্টিতে অস্বাভাবিক মনে হলেও গল্পের নায়ক দাদুর কাছে তা স্বাভাবিক; তাই সুন্দরী শিলাকে সে পাত্রস্থ করতে চায় না, বিবাহ সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন উঠলেই এড়িয়ে যায়। এমনকি ভূপতি নামে একটি যুবকের প্রতি শিলা প্রেমে আবদ্ধ একথা জেনে সে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। মনোবিকারের এমন নিদর্শন বাংলা ছোটগল্পের ধারায় একেবারেই স্বতন্ত্র ও নতুন। আসলে মানুষের মনের অবচেতন স্তরে নিহিত ভয়াবহ বিকৃতি মানিকের এ সকল গল্পের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলা ছোটগল্পে তাই মানিক মানুষের নিভৃত মনের নিষিদ্ধ কামনাগুচ্ছকেই তার বৈচিত্র্য ও জটিলতাসমেত রূপময় করে তুলেছেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলা ছোটগল্পে বিশেষত 'কল্লোল'-পর্বে নরনারীর দেহকামনা বা যৌনমনস্তত্ত্বের পরিচয় এমনিভাবে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবেশিত হয়েছিল। এর পূর্ববর্তী সাহিত্যে অর্থাৎ প্রাক-প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সময়পর্বে এসবের কোনো অভাব ছিল না। কিন্তু মোহময় রোম্যান্টিক দৃষ্টিভঙ্গির আড়ালে এরূপ স্বচ্ছ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি পরিলক্ষিত হয়নি। তাই পাশ্চাত্য মনস্তত্ত্ববিদগণ যখন কল্লোলের সাহিত্যে আবির্ভূত হয়েছেন, তখনই দেখা দিয়েছে তার অভিনব পরিবর্তন। সমালোচক দেবকুমার বসু এ প্রসঙ্গে বলেছেন :

> কল্লোলগোষ্ঠীর কথাসাহিত্যে যে মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতা প্রকাশ পেয়েছিল, তার মূলে ছিল পূর্বকালীন সাহিত্যিকদের রক্ষণশীল মনোভাব ও শূচিতাবোধের প্রতি প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ, তৎকালীন সংস্কৃতি মানসের অনুবর্তন, পাশ্চাত্য জীববিদ্যা ও মনস্তত্ত্বের নতুন নতুন আবিষ্কার, বিশেষতঃ ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের প্রভাব।[৫১]

ফলে প্রেমের দেহজরূপ, সম্ভোগ-স্পৃহা, অবচেতন মন, ইন্দ্রিয়ের অসংযম-এ সকল বাস্তবতাকে আর অস্বীকার করা সম্ভব হয়নি। এই শিল্প-প্রবণতাকে রবীন্দ্রনাথ যতই 'লালসার-অসংযম' ও 'দারিদ্র্যের আস্ফালন' বলুন না কেন, তিনি যা পারেননি "চোখের বালি" কিংবা "নষ্টনীড়" এর মতো রচনায়-তাই প্রতিভাত হয়েছে, বিশ্লেষিত হয়েছে কল্লোলের সাহিত্যকর্মে। ফ্রয়েড-অ্যাডলার-ইয়ুঙ রচিত এবং ব্যাখ্যাত মনঃসমীক্ষণ বা Psychoanalysis এর প্রত্যক্ষ প্রেরণায় এ যুগের বাংলা সাহিত্য হয়েছে গৌরবদীপ্ত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলা ছোটগল্পে মানব মনস্তত্ত্ব রূপায়ণে এ যুগের লেখকদের

বিজ্ঞাননিষ্ঠ মন আর পাশ্চাত্য মনস্তাত্ত্বিকদের মতবাদ তাই গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রেখেছে। যেমনটা 'ফ্রয়েডের সংকেত অনুসরণে মানসিক সর্পিলতার পথে জীবন-রহস্যের মূল কেন্দ্র অনুসন্ধান করা প্রথম যুদ্ধোত্তর ইয়োরোপীয় কথাসাহিত্যের অন্যতম প্রধান ধারায় পরিণত হয়েছিল'।[৫২]

কল্লোলের কাল **১৯২৯** খ্রিষ্টাব্দে শেষ হলেও ত্রিশোত্তর বাংলা কথাসাহিত্যে কল্লোলের প্রভাব লক্ষ করা যায়। মূলত ত্রিশোত্তর বাংলা কথাসাহিত্যের ধারায় অর্থাৎ কল্লোলের পরবর্তীকালের সাহিত্যভূমিতে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি পটভূমিকার এক বিরাট পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। **১৯৩৯** খ্রিষ্টাব্দের ৩ সেপ্টেম্বর ঘোষিত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের[৫৩] প্রভাবে পৃথিবীর চেহারা আমূল বদলে যায়। ফলে জাতীয় প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। সমগ্র চল্লিশের দশক বিশ্বইতিহাসে যেমন ঘটনাবহুল, তেমনি ভারত তথা বাংলাদেশেও এই দশক সর্বাধিক স্মরণীয় ঘটনাবলিতে চিহ্নিত হয়ে আছে। ব্রিটিশ বিরোধী মুক্তি আন্দোলন, দেশীয় রাজনীতির নানা অভিঘাত, বিয়াল্লিশের 'ভারত ছাড়' আন্দোলন, তেতাল্লিশের মন্বন্তর, দুর্ভিক্ষ-আকাল প্রাকৃতিক দুর্যোগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, শ্রমিক-কৃষক-কর্মচারী আন্দোলন, ধর্মঘট-হরতাল, মিছিল-শোভাযাত্রা, বোমাতঙ্ক, দেশবিভাগ ও স্বাধীনতা প্রাপ্তি, উদ্বাস্তু স্রোত–এসকল ঘটনা এ সময়পর্বের এক চিহ্নিত সত্য। মোটামুটি টানা এক দশক জুড়ে চলমান সংঘটিত এ সকল ঘটনায় সমাজব্যবস্থার বিপর্যয় ঘটে, মানুষের মূল্যবোধেও আসে পরিবর্তন। বেকারত্ব, দারিদ্র্য, নারীদের উপার্জনে বেরিয়ে পড়া, পতিতাবৃত্তি, আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াই, আত্মিক সঙ্কট, নারীত্বের চিরাচরিত সংস্কারে ফাটল, দাম্পত্য বিচ্ছেদ এসব এই সময়েরই স্বাক্ষর বহন করে। আর এসব আঘাতে সর্বাধিক ক্ষত-বিক্ষত হয় মধ্যবিত্তজীবন। শুরু হয় ভাঙন-পতন, পচন, বিকৃতি। আত্মপ্রতারণা, স্ববিরোধিতা, দ্বিধাদীর্ণ মানসিকতা, ভণ্ডামি, গর্ব, অসূয়া, ভীরুতা, নীচতা, অন্যায়ের সঙ্গে আপস-সহবাস, সুবিধাবাদী ভূমিকা, নৈতিক অবক্ষয়–এসব নিয়েই মধ্যবিত্তজীবন নবজন্ম লাভ করে।

বাংলা সাহিত্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব প্রত্যক্ষ ও গভীর। এই যুদ্ধে সমাজ ও দেশের আমূল পরিবর্তনের ফলে সাহিত্যজগতেও আসে এর নিশ্চিত পালাবদল। আগমন ঘটে নতুন কালের নতুন লেখকদের যারা কল্লোলোত্তর সাহিত্যিক হিসেবে চল্লিশের দশকের এই সামগ্রিক বিপর্যয় আর বহ্নিবলয়কে পটভূমি করে সৃজন করেছেন তাঁদের গল্পসাহিত্য। সংশয়, বিদ্রোহ, মনস্তত্ত্ব, প্রশ্নাকুলতা

আর দুর্নিবার জীবন জিজ্ঞাসায় উত্তপ্ত এ সকল তরুণ লেখকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন সুবোধ ঘোষ (১৯০৯-১৯৮০), জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী (১৯১২-১৯৮৬), নরেন্দ্রনাথ মিত্র (১৯১৬-১৯৭৫), নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৮-১৯৭০), সন্তোষকুমার ঘোষ (১৯২০-১৯৮৫), বিমল কর (১৯২১-২০০৩), সমরেশ বসু (১৯২৪-১৯৮৮) প্রমুখ। এঁরা সকলেই সমসাময়িক কালের সামাজিক পটভূমিকার ওপর ভিত্তি করে সাহিত্য রচনা করেছেন। সামাজিক বিষয় ছাড়াও তাঁদের রচিত গল্পে যৌন মনস্তত্ত্বের নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে। প্রসঙ্গত সমালোচক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের অভিমত স্মরণযোগ্য :

> ভারসাম্যের বিচলন, মূল্যবোধের বিনষ্টি, সুস্থ জীবনবোধের অবসান, অবক্ষয়ের প্রতিষ্ঠা, বিপর্যয়ের বিজয়, স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতের বাংলার অর্থনৈতিক রাজনৈতিক মহিমার অবসান : এই পটভূমিতে লেখকরা চোখ মেলে তাকিয়েছেন, দেখেছেন ক্ষুব্ধ স্বদেশভূমি, অবাক মেনেছেন ভাগ্যের পদাঘাতে।[৫৪]

প্রখর কালসচেতন, বিচিত্র জীবনাভিজ্ঞতার অধিকারী ও বাস্তব পরিবেশের সন্ধানী এ সকল লেখক অন্তর্মুখী বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা মানব মনস্তত্ত্বের বিবিধ দিক উন্মোচনে অগ্রসর হয়েছেন। দুর্জ্ঞেয় মানবমনের রূপকার নরেন্দ্রনাথ মিত্র আপাত শান্ত মধ্যবিত্ত বাঙালি জীবনের সুখ-দুঃখ অভাব-অনটনের মধ্যে নিজেকে মূলত আবদ্ধ রেখে যুদ্ধ অভিঘাতের বিবিধ জটিলতা, অবক্ষয় আর মনস্তত্ত্বকে নিপুণভাবে উপস্থাপন করেছেন তাঁর গল্পে। বিশ্বযুদ্ধকালীন আত্মপ্রকাশ ঘটলেও তাঁর গল্পের বিষয়াংশ ও ঘটনাবলি যুদ্ধোত্তর সময়ের পটভূমিতে রচিত। যৌথ পরিবারে ভাঙন, মানসিকতার বিকৃতি, মূল্যবোধের অবক্ষয়, জীবন ও জীবিকায় অস্থিরতা, আত্মকেন্দ্রিকতার ভয়ঙ্কর বিপর্যস্ত রূপ নিয়ে বিশ্বযুদ্ধোত্তর যে পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল, নরেন্দ্রনাথ বেছে নিয়েছেন তাঁর গল্পসাহিত্যের উপজীব্য বিষয়। চল্লিশের লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে তিনি কিছুটা ব্যতিক্রম। জীবন যতই জটিল হোক না কেন, হোক না যতই বিকৃত, তবু তার মধ্যেই লুকিয়ে থাকে কিছু মহত্তর দিক নরেন্দ্রনাথ মিত্র সেই মহত্তর দিকের সন্ধানী। তিনি শল্যবিদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে গল্পে মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত মানসিকতার ব্যবচ্ছেদ করেছেন। "রস", "সৌরভ", "হেডমাস্টার", "একপো দুধ", "চোর" প্রভৃতি গল্প এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। যে মনস্তত্ত্বের চিত্র আমরা তাঁর গল্পে পাই "চোর" গল্পটি সেই মূল্যবোধের বিচ্যুতিজনিত মনস্তত্ত্ব প্রভাবিত গল্প। আলোচ্য গল্পে দেখি অমূল্য ও রেণু স্বামী স্ত্রী হলেও স্বভাব চোর অমূল্যকে রেণু মনে প্রাণে চুরির জন্য ঘৃণা করে। এমনকি স্ত্রীর পরিচয় দিতেও রেণুর সংকোচ হয়। অথচ চুরির জন্য যখন অমূল্যর চাকরিচ্যুতির সংবাদ সে অবগত হয়, তখন রেণুর স্বভাব সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। সে অমূল্যকে সমর্থন করে, অভাব থাকলে চুরি যেন অন্যায় নয়। ক্রমে সেও চৌর্যকার্যে

ব্রতী হয়। এবার অমূল্যই স্ত্রীর এই চৌর্যবৃত্তি সমর্থন করতে পারে না। এ যেন এক ভীষণ বিচ্যুতি-যে স্ত্রীর মূল্যবোধের জন্য সে গর্বিত ছিল, একদিন যে স্ত্রীর সান্নিধ্য থেকে সে ভালো হয়ে উঠতে পারত সেই স্ত্রীর মনস্তাত্ত্বিক আচরণগত বিচ্যুতিকে সে যেন মেনে নিতে পারে না।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের সমকালীন চল্লিশের দশকে বাংলা ছোটগল্পের ক্রমবিকাশমান ধারায় সম্পূর্ণ ভিন্ন মেজাজের অধিকারী জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী আত্মবিস্মৃত ও পাঠক সম্পর্কে উদাসীন হয়েও গল্পে 'অসমান সমাজের শেষ ভাঙচুর, মধ্য-নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনের একধরনের নিঃসঙ্গ অসহায়তা, নগ্নতা, যৌনতাকে সাবলীল স্বাভাবিকতায় প্রতীকায়িত করেছেন'।[৫৫] শিক্ষিত মধ্যবিত্তের আত্মিক অবনমন, আত্মম্ভরী আত্মাভিমান, বিপন্ন অস্তিত্ব, বুর্জোয়া সমাজের নির্মম লোলুপতা এসবই লেখকের উদাসীন নিরাসক্ত দৃষ্টিভঙ্গিতে গল্পে সন্নিবেশিত হয়েছে। "গিরগিটি" গল্পে এক বৃদ্ধের চোখে ভাড়াটে বাড়ির স্ত্রীর স্নানের দৃশ্যের মধ্য দিয়ে লেখক যৌন মনস্তত্ত্বের চিত্র উপস্থাপন করেছেন। আবার "চোর" গল্পে একটি পেঁপে চারাকে কেন্দ্র করে কিশোর মনে যে দ্বন্দ্ব-সংকট চিত্রিত, তা এক নিরাসক্ত মনোদর্শন বলা যেতে পারে। মানুষের মনোজগতে আকর্ষণ ও বিকর্ষণের টানাপড়েনে যে মানসিক বৈকল্য উদ্ভূত হয় তা এ গল্পে গল্পবক্তা ও কিশোর মদনের পেঁপে চারার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। সমালোচকের মতে:

> লেখক সুকৌশলে পেঁপেচারাটির উপর মানব ভাব আরোপ করেছেন। এই চারাটি যেন উদ্দীপক হয়ে উদ্দীপিত করেছে শুধু মদনকে নয়, গল্প বক্তাকেও। উদ্ভিদের উপর মানবধর্ম আরোপণের দ্বারা লেখক সুকৌশলে গল্পবক্তার মানসিক প্রবণতায় তার প্রভাবের স্বরূপ উদঘাটন করেছেন।[৫৬]

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের বেশ কয়েকটি গল্পে আমরা মনস্তত্ত্বকে প্রাধান্য লাভ করতে দেখি। ব্যক্তিমনের নানান জটিলতা, কুটিলতা, বিকার, অবচেতনা, আদিম জৈবএষণা তাঁর গল্পে দেখতে পাওয়া যায় । "দুর্ঘটনা" গল্পে মানবমনের অন্তর্নিহিত অবচেতন থেকে উঠে আসা হিংস্রতা আর চাপা আক্রোশে একটি নবীন নির্দোষ দম্পতির জীবনে অসুখের কালো ছায়া বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য গল্পে দেখি একটি স্টোভ দুর্ঘটনায় মুখ পুড়ে গিয়ে স্কুল শিক্ষিকা ইন্দিরা চৌধুরীর মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার চিত্র। নববিবাহিত দম্পতি বিভাস আর ইলার সুখী জীবন দেখে ইন্দিরার অবচেতনের গভীর শূন্যতাবোধ থেকে সৃষ্ট জটিলতায় সে প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়ে ওঠে। মানব মনের একটি স্বাভাবিক মনস্তাত্ত্বিক ধর্মই এখানে প্রকাশ পেয়েছে।

অবচেতন থেকে হঠাৎ জেগে ওঠা মনোবিকারের চিত্র "তাস" এবং "অমনোনীতা" গল্পে উপস্থাপিত হয়েছে। "তাস" গল্পে চরিত্রের মনোবিশ্লেষণকে সুন্দরভাবে নির্মাণ করা হয়েছে। সামান্য তাস খেলাকে কেন্দ্র করে ব্যক্তিমনের সচেতনতার আড়ালে দুটি নারী-পুরুষের মধ্যে রচিত হয় অবৈধ সম্পর্ক। তাস খেলায় পরস্পরের মধ্যে সাঙ্কেতিক ইশারা, চুরির নিষিদ্ধ আনন্দ ও জয় উচ্ছ্বসিত, রোমাঞ্চিত উত্তেজিত করে দুজনকেই। এই রোমাঞ্চিত, নেশা অবচেতনে দুজনকে এক ভয়ঙ্কর সম্পর্কের মধ্যে প্রলুব্ধ করে। মনের অন্তরঙ্গতা থেকে আসে শরীরের হাতছানি। সচেতন মনের অগোচরে তারা পরস্পর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের দিকে এগিয়ে যায়। কিন্তু দুজনের কাছেই এই ভয়ঙ্কর, অন্ধকার, নিষিদ্ধ পথ একদিন স্পষ্ট হয়ে দেখা দিলে তাদের অবচেতন মনের স্তরে সচেতন মনের আলো এসে পড়ে। চেতনার আঘাতে তারা নিষিদ্ধ, পরিণামহীন পথ থেকে প্রত্যাবর্তন করে। "অমনোনীতা" গল্পে ব্যক্তিমনের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা ও সংকটের চিত্র বর্ণিত হয়েছে। সন্দেহ প্রবণতা মানুষের একটি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। অবচেতনের গভীরে এই সন্দেহপ্রবণতা সুপ্ত থাকে। কোনো একটি আঘাতে তা বিকার ও জটিলতা নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। সদ্যবিবাহিত লোকেনের বাড়িতে একদিন নিমন্ত্রণ খেতে এসে বন্ধু সুখেন্দু লোকেনের মনের মধ্যে অসুখের বীজ বপন করে দিয়ে যায়। সুখেন্দু যাওয়ার আগে তাকে বলে যে তিনমাস আগে দুর্ঘটনায় নিহত দুলাল চৌধুরীর সঙ্গে লোকেনের স্ত্রী মনিকার বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছিল। কিন্তু দুলাল বিয়েতে সম্মত হয়নি। বন্ধুর উদ্দীপনে লোকেনের মনে স্ত্রীর প্রতি অকারণ সন্দেহ ও গভীর কৌতূহল তৈরি হয়। ফলে অজস্র প্রশ্ন এবং ভাবনার ব্যাধি তার মনের মধ্যে জমে ওঠে। একের পর এক নিদ্রাহীন দুঃস্বপ্নের রাত অতিবাহিত হলে তার মনোবিকার তীব্র হয়ে ওঠে যা গল্পের শেষাংশে যথাযথভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

সন্তোষকুমার ঘোষ সমসাময়িক লেখকদের থেকে ব্যতিক্রম। 'মননচিন্তায়, আত্মজৈবনিক দৃষ্টিতে, ব্যঞ্জনা সৃষ্টিতে, ব্যক্তির অস্তিত্ব বিশ্লেষণে, তীক্ষ্ণ মার্জিত ইঙ্গিতধর্মী ভাষায় হৃদয়ের সূক্ষ্মতম অনুভব প্রকাশে সন্তোষ কুমারের নৈপুণ্য সংশয়াতীত।'[৫৭] মানব মনস্তত্ত্বের ব্যভিচারী প্রবণতাই তাঁর গল্পের উপজীব্য বিষয়। অবৈধ প্রেম, অনাকাঙ্ক্ষিত যৌন সংযোগ, চেতনাস্তম্ভিত অন্ধকার জগতের ক্রিয়াকলাপ- এসবই তাঁর গল্পের মৌল প্রবণতা। তাঁর আদিম আকর্ষণকেন্দ্রিক গল্প "ঘ্রাণ", "সম্রাজ্ঞী", "মাটির পা"; আদিম রিপুর প্রাবল্যকেন্দ্রিক গল্প "বিষকণ্ঠ"', "কোন অসতীর কথা" প্রভৃতিতে মনোজগতের বিচিত্র জটিলতা রূপায়িত হয়েছে।

"মাটির পা" গল্পে বাড়িওয়ালা সুধীরকে কেন্দ্র করে দুই বোনের মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব আর আদিম আকর্ষণ সমগ্র গল্পটিকে জটিলতার দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। 'নানা তলের ও তালের মানুষের নিরন্তর বাঁচার লড়াই যাঁর গল্পের উপজীব্য'[৫৮] সেই সমরেশ বসুর গল্পেও মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম দিক উন্মোচিত হয়েছে। তবে মানব মনস্তত্ত্ব অপেক্ষা তাঁর গল্পে শ্রেণিমনস্তত্ত্ব অধিক মাত্রায় রূপায়িত হয়েছে। নাগরিক মধ্যবিত্তের বিচ্ছিন্নতা, যৌনবিলাস, সংশয়, সন্দেহ, স্বপভঙ্গ নিয়ে গল্প লিখেছেন তিনি। তবে কেবল মধ্যবিত্তজীবনেই সীমাবদ্ধ নয় তার গল্পজগৎ ; 'সমাজের নীচুতলার মানুষের দিকেই ছিল তাঁর বেশি দৃষ্টি',[৫৯] ফলে সে শ্রেণির মনস্তত্ত্ব অঙ্কনে তিনি স্বাভাবিকভাবেই অগ্রসর ও আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। "প্রতিরোধ", '"জলসা", "পসারিনী", "তৃষ্ণা" প্রভৃতি গল্প এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। এসব গল্পে নিম্নশ্রেণির মানুষের যৌনতা ও আদিম রিরংসা-বৃত্তির অতিচিত্রণ লক্ষণীয়।

আলোচ্য সময়পর্বে বিমল করও মনের গভীরে নেমে মানবমনের এক একটি ভাবকে শিল্পায়িত করেছেন। 'মনস্তাত্ত্বিক উপকরণগুলোকে দার্শনিকতার বনিয়াদে প্রকাশ করতে থাকলেন বিমল কর'[৬০] সমালোচক কথিত এমন বক্তব্যই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাঁর ছোটগল্পে। প্রচলিত মূল্যবোধে অনাস্থা, নিয়তির অমোঘতা, জীবনের নতুনতর তাৎপর্যসন্ধান, মানুষের নিঃসঙ্গতা তাঁর মনস্তাত্ত্বিক গল্পসমূহে প্রাতিস্বিক মাত্রা দান করেছে। 'মানুষের অন্তরে যে জটিলতা, অন্তর ও বাহিরে যে সূত্র-সম্বন্ধ, স্বপ্নে ও চিন্তায় তার যে অদ্ভুত প্রকাশ, নিঃসঙ্গ অন্তরজীবনের যে বেদনা ও অসহায়তাবোধ–এইসব বক্তব্য বিমল করের গল্পকে এমন এক স্বাতন্ত্র্য এনে দিয়েছে যাকে কিছুতেই পূর্বতন ধারার অনুসৃতি বলে মনে হয় না।'[৬১] বস্তুত মগ্নচেতনাপ্রবাহের শিল্পিত প্রয়োগে তিনি আলোকিত করেছেন মানবমনের গভীরতর প্রান্ত। "নিষাদ", "উদ্ভিদ", "পলাশ", "টেলিগ্রাফ", "সোপান", "জননী", "আত্মজা" প্রভৃতি গল্পে মনোগহনের গভীর তলদেশে বিচরণ করে তিনি নরনারীর মনস্তত্ত্ব উন্মোচন করেছেন।

মূলত কল্লোলোত্তর কথাসাহিত্যিক হিসেবে বিবেচিত আলোচ্য গল্পকারগণ সমগ্র চল্লিশের দশকে বাংলা ছোটগল্পে মানব মনস্তত্ত্বের রূপরেখা নির্মাণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। এরই ধারায় আমরা এ সময়ের অন্যতম অগ্রপথিক এবং প্রখর কালসচেতন গল্পকার সুবোধ ঘোষের সাক্ষাৎ পাই, যাঁর রচনায়

উঠে এসেছে বাস্তবতার নতুন রূপ তথা অন্তর্জীবনের নবপরিচয়, বিচিত্র চোরাগলির সন্ধান, বিকারগ্রস্ত মানসিক জটিলতার তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ। এ প্রসঙ্গে সমালোচক গোপালমণি দাস বলেছেন :

> মনস্তাত্ত্বিক গল্প রচনায় সুবোধ ঘোষের স্বাতন্ত্র্য অনস্বীকার্য। মনোলোকের জটিল সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ, তার বিচিত্র রূপান্তর আর জন্মান্তরের এক নিরাসক্ত নিপুণ শিল্পী সুবোধ ঘোষ।[৬২]

মূলত সুবোধ ঘোষের ছোটগল্পে মানব মনস্তত্ত্ব বিচিত্র রূপে উপস্থাপিত হয়েছে। নর-নারীর প্রেম-মনস্তত্ত্ব, ফ্রয়েডীয় যৌনমনস্তত্ত্ব রূপায়ণের পাশাপাশি তাঁর গল্পে বিভিন্ন মনস্তাত্ত্বিক বিকৃতি শিল্পসম্মত উপায়ে বিশ্লেষিত হয়েছে। পরবর্তী পরিচ্ছেদে এ সংক্রান্ত বিশ্লেষণধর্মী পর্যবেক্ষণ উপস্থাপন করা হয়েছে।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. প্রমথ চৌধুরী, 'পূর্ব ও পশ্চিম' শীর্ষক প্রবন্ধ, *প্রবন্ধ সংগ্রহ*, বিশ্বভারতী, গ্রন্থবিভাগ, কলিকাতা, ১৯৮৬, পৃ. ৪১৪

২. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, *কল্লোল-যুগ*, এম. সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, সপ্তম প্রকাশ, আশ্বিন ১৩৯৫, পৃ. ১৪৬

৩. বুদ্ধদেব বসু, "অতি আধুনিক বাংলা সাহিত্য" শীর্ষক প্রবন্ধ, *বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ*, তৃতীয় খণ্ড, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৮২, পৃ. ৫৬৪

৪. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, *বাংলা গল্প বিচিত্রা*, প্রকাশ ভবন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ পঞ্চম মুদ্রণ, আশ্বিন ১৪১০, পৃ. ১১১

৫. গোকুলানন্দ মিশ্র, *প্রতীচ্য প্রেরণা ও কল্লোলীয় সাহিত্য*, প্রজ্ঞা বিকাশ, কলকাতা, প্রথম প্রজ্ঞা বিকাশ সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০১, পৃ. ১৪৩

৬. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭

৭. পিনাকী ভাদুড়ী, *উত্তরসূরীদের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ*, টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর ১৯৮৮, পৃ. ৪

৮. Buddhadeva Bose, *An Acre of Green Grass*, Papyrus Reprint Series, 11 November, 1982, P.1

৯. গোকুলানন্দ মিশ্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০

১০. বিশ্বজিৎ ঘোষ, *বাংলা কথাসাহিত্য পাঠ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা প্রথম প্রকাশ, মে ২০০২, পৃ. ১৫০

১১. গোকুলানন্দ মিশ্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০

১২. শিবশংকর পাল, *সুবোধ ঘোষের ছোটগল্পে মানবিক মূল্যবোধ*, সুবর্ণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ১৮২

১৩. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, *কালের পুত্তলিকা বাংলা ছোটগল্পের একশ'দশ বছর/১৮৯১-২০০০*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ ২০১০, পৃ. ১৭৩

১৪. গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, *দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৩৮০, পৃ. ১৮৬

১৫. গোকুলানন্দ মিশ্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৭

১৬. বিশ্বজিৎ ঘোষ, *বাংলা কথাসাহিত্য পাঠ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫২

১৭. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৮

১৮. নবনীতা সান্যাল, *প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্প বিষয় ও শিল্পরূপ*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০১০, পৃ. ৫৪

১৯. প্রেমেন্দ্র মিত্র, *প্রেমেন্দ্র মিত্রের সমস্ত গল্প (১ম খণ্ড)*, ওরিয়েন্ট লংম্যান, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৯৮৯, পৃ. ৬৪

২০. অনিন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, *প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্প মননে ও সৃজনে*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০০৫, পৃ. ৭৭

২১. উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, *গল্প পাঠকের ডায়ারি*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০০৫, পৃ. ১০৭

২২. প্রেমেন্দ্র মিত্র, *প্রেমেন্দ্র মিত্রের সমস্ত গল্প (২য় খণ্ড)*, ওরিয়েন্ট লংম্যান, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৯৮৯, পৃ. ১৬৩

২৩. অনিন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৩

২৪. গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০২

২৫. নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, *বাংলা ছোটগল্প : সংক্ষিপ্ত সমালোচনা*, পরিভাষা কমিটি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা, পৃ. ১৮৭

২৬. জ্যোতিপ্রসাদ বসু, *গল্প লেখার গল্প*, বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা, শ্রাবণ ১৩৫৩, পৃ. ৫৫

২৭. গোকুলানন্দ মিশ্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৭

২৮. গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৫

২৯. বিশ্বজিৎ ঘোষ (সম্পা), *বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ গল্প*, আজকাল প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ২০০৪, পৃ. ৫

৩০. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬

৩১. বিশ্বজিৎ ঘোষ, *বাংলা কথাসাহিত্য পাঠ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৫

৩২. সত্যচরণ চট্টোপাধ্যায়, *বাংলা ছোটগল্পের ক্রমবিকাশ*, প্রজ্ঞা বিকাশ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৮, পৃ. ২৫৯

৩৩. অনিন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০

৩৪. যুবনাশ্ব, *পটলডাঙার পাঁচালী*, সেঞ্চুরী প্রেস, কলিকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৩৬৩, পৃ. ৩৩

৩৫. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৬

৩৬. প্রবীরকুমার চট্টোপাধ্যায়, *জগদীশগুপ্তর কথাসাহিত্য ফ্রয়েডীয় মনোবিশ্লেষণের আলোকে*, ভাষাবন্ধন প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯২, পৃ. ৫৪

৩৭. ভীষ্মদেব চৌধুরী, *জগদীশ গুপ্তের গল্প পঙ্ক ও পঙ্কজ*, ফুলদল প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, বৈশাখী, ১৩৯৫, পৃ. ৫৪

৩৮. সুবীর রায়চৌধুরী (সম্পা), *জগদীশ গুপ্তর গল্প* গ্রন্থের "কথাসাহিত্যে বিপরীত স্রোত" শীর্ষক হাসান আজিজুল হকের প্রবন্ধ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃ. ২৭৫

৩৯. জ্যোতিপ্রসাদ বসু, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৯

৪০. শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, *শৈলজানন্দের গ্রন্থাবলী (প্রথম খণ্ড)*, বসুমতি সাহিত্য মন্দির, কলকাতা, আশ্বিন, ১৩৬১ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১২৬

৪১. হীরেন চট্টোপাধ্যায়, *কথাসাহিত্যিক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০১০, পৃ. ৫৪

৪২. শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৮

৪৩. সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১৮৯১-১৯৪১)*, পঞ্চম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, জানুয়ারি ১৯৯৯, পৃ. ৩৫৫

৪৪. বিশ্বজিৎ ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৯

৪৫. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৫

৪৬. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪৪

৪৭. "আমি ছিলাম বিজ্ঞানের ছাত্র এবং যেমন আগ্রহ নিয়ে বিজ্ঞান পড়তাম তেমনি আগ্রহ নিয়েই আরম্ভ করেছিলাম যৌনবিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব আর বিশ্বসাহিত্য পড়া"। 'সাহিত্য করার আগে', *মানিক গ্রন্থাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ৯ মে ১৯৭৫, পৃ. ৫৫৭

৪৮. সৈয়দ আজিজুল হক, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প সমাজ চেতনা ও জীবনের রূপায়ণ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৮, পৃ. ১৪৫

৪৯. মধুমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, *মানিকের ছোটগল্পে মনস্তত্ত্ব*, কোলকাতা, প্রথম প্রকাশ, শ্রাবণ ১৪০৮, পৃ. ১৪০

৫০. সৈয়দ আজিজুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩১

৫১. দেবকুমার বসু, *কল্লোলগোষ্ঠীর কথাসাহিত্য*, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮০, পৃ. ১৮০

৫২. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৮

৫৩. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দের ৩ সেপ্টেম্বর, চলে একটানা ছয় বছর। ঐ বছর ১ সেপ্টেম্বর হিটলার কোনোরূপ যুদ্ধ ঘোষণা ছাড়াই পোল্যাণ্ড আক্রমণ করেন। এর আগে অস্ট্রিয়া এবং চেকোস্লোভাকিয়া রাষ্ট্র দুটি গ্রাস করে জার্মানি তার সীমা সম্প্রসারণ করে নেয়। ৩ সেপ্টেম্বর ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স পোল্যাণ্ডের সাহায্যার্থে জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। যুদ্ধের এক বছর পর জার্মানি, জাপান এবং ইতালি বিশ্বপ্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে নিজেদের মধ্যে এক চুক্তি সম্পাদন করে। ক্রমান্বয়ে হিটলারের জার্মান বাহিনী একে একে পোল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, নরওয়ে এবং পূর্ব ইয়োরোপের অধিকাংশ দেশ গ্রাস করে পরিশেষে রাশিয়া আক্রমণ করে (১৯৪১, ২২ জুন)। এদিকে জাপান পার্ল হার্বারে আমেরিকার রণতরী বাহিনীর ওপর আক্রমণ করে জার্মান অক্ষশক্তির সাথে সন্ধি করে এবং দ্রুতগতিতে ফিলিপাইন, ইন্দোচিন, ইন্দোনেশিয়া, মালয় এবং শেষে বর্মাদেশ অধিকার করে ভারতের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়। জার্মান কর্তৃক রাশিয়া আক্রমণের সাথে সাথে যুদ্ধের প্রকৃতি যায় পাল্টে এবং বিশ্বযুদ্ধ স্পষ্টত দুটো ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। একদিকে ফ্যাসিস্ত জার্মানি, ইতালি ও জাপান এবং অপরদিকে রাশিয়া, আমেরিকা, ব্রিটেন ও ফ্রান্স। প্রারম্ভিক পর্যায়ে ফ্যাসিস্ত শক্তির বিরাট জয় সূচিতে হলেও পরিশেষে তাদের পরাজয় ঘটে। নাৎসি জার্মানির সেনাবাহিনী মস্কো এস থেমে যায় এবং পরাজিত হয়ে আত্মসমর্পণ করে। জাপান ভারত সীমান্তে পোঁছেও শেষ মুহূর্তে পরাজিত হয়, শান্তির জন্য আবেদন করে এবং মিত্রশক্তির নিকট আত্মসমর্পণ করে (১৯৪৫, ১৪ আগস্ট)। ২ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দে জাপানের আত্মসমর্পণের সাথে সাথে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে।

৫৪. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, *সাহিত্য সন্ধান*, সাহিত্য বিহার, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, মার্চ ১৯৮৮, পৃ. ২৬২

৫৫. আনন্দ বাগচী, "ছোটগল্পের রূপান্তর" শীর্ষক প্রবন্ধ, *দেশ*, ২১ অক্টোবর, ১৯৮৯, পৃ. ৪৯

৫৬. সত্যচরণ চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩৬

৫৭. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, *কালের পুত্তলিকা বাংলা ছোটগল্পের একশ'দশ বছর/১৮৯১-২০০০*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭৫

৫৮. আনন্দ বাগচী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১

৫৯. সরোজমোহন মিত্র, *বাংলায় গল্প ও ছোটগল্প*, তুলসী প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম তুলসী সংস্করণ আগস্ট ১৯৯৭, পৃ. ২৭৮

৬০. নিতাই বসু, *বাংলাদেশ : সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স প্রকাশনা বিভাগ, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৯, পৃ. ৬৭

৬১. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯৬

৬২. গোপালমণি দাস, *দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলা ছোটগল্পে সুবোধ ঘোষ*, পাত্র'জ পাবলিকেশন, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০০৭, পৃ. ৪৪

প্রথম অধ্যায়

সুবোধ ঘোষের ছোটগল্পে ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন

আধুনিক জীবনের নানামুখী সংকট মানুষকে জটিল আবর্তের মধ্যে নিক্ষেপ করায় সেই জটিলতা তার মনের মধ্যেও পরিলক্ষিত হয়। কথাসাহিত্যে বিশেষত ছোটগল্পের ন্যায় দৃঢ়পিনদ্ধ শিল্পে তাই মানবমনের অপার রহস্যের দ্বার উন্মোচনের প্রয়াস দুর্লক্ষ্য নয়। প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যে, মহাকাব্য বা আখ্যানধর্মী রচনাসমূহের মধ্যে মানবসম্পর্ক ও তার মনোজগতের যে স্বরূপ উপস্থাপিত হয়েছে, তাতে সমাজবাস্তবতার সঙ্গে ধর্ম, মূল্যবোধ, প্রথা এবং সংস্কার লেখকদের মন-মানস অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করেছে। সেখানে মানুষের জৈবিক সম্পর্কের বিষয়টি ছিল সূক্ষ্মতাবর্জিত, স্থূল ও একরৈখিক-মনের জটিল প্রান্তগুলো তার বিচিত্র রূপ নিয়ে তাতে উপস্থাপিত হয়নি। আধুনিক যুগে যখন কথাসাহিত্যের আবির্ভাব ঘটে, তখন থেকেই মানুষের মন ও মনোজগতের অন্তরস্থ বিষয়সমূহ লেখকদের কাছে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হয়েছে। এক্ষেত্রে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভিক পর্যায়ে মানবমনস্তত্ত্ব-সংক্রান্ত সিগমন্ড ফ্রয়েডের (১৮৫৬-১৯৩৯) যুগান্তকারী আবিষ্কার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের অভিমত এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য :

> মনস্তাত্ত্বিক শাখাটিও ছোটগল্পের অন্যতম মুখ্য সমৃদ্ধি। এর বিকাশকে সবচাইতে আনুকূল্য করেছেন মনোবিজ্ঞানী সিগমুন্ড ফ্রয়েড। গল্পসাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধিতে ফ্রয়েডবাদের বিশেষ একটি ভূমিকা রয়েছে। এ যুগে এই পর্যায়ী গল্পেই লেখকের শক্তির পরিমাপ করা হয়ে থাকে।[১]

মানবমনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রবণতাসমূহের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে ফ্রয়েড ছিলেন অনন্য। বস্তুত মনোবিশ্লেষণসূত্রে মানবমনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াসংক্রান্ত যে অভিসন্দর্ভ তিনি উপস্থাপন করেছেন তা মানববিদ্যার ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। তাঁর এই অভিসন্দর্ভকে নিকোলাস কোপারনিকাস (১৪৭৩-১৫৪৩) ও চার্লস ডারউইনের (১৮০৯-১৮৮২) আবিষ্কারের তুল্যমূল্য গণ্য করা হয়। ফ্রয়েডই প্রথম আবিষ্কার করেন মানুষের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের নেপথ্য চালিকাশক্তি তার অবচেতন মন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'অবচেতনাই মানবমনের নিয়ামক' বা Sex is the main spring of our unconscious life. মানুষ তার ইচ্ছাশক্তির অধীন নয়–মানুষের ইচ্ছাশক্তি নিয়ন্ত্রিত হয় অবচেতন মনের গভীরে সুপ্ত অন্ধকার গুহাবাসী এক প্রবল জৈবিক শক্তির মাধ্যমে। ফ্রয়েডের এই বক্তব্য আধুনিক যুগের কথাসাহিত্যিকদের চেতনামূলে বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটিয়েছে। পুরনো বিষয় ও চিন্তাধারাকে নস্যাৎ করে নতুন মনোবিশ্লেষণ পদ্ধতির বিজ্ঞাননির্ভর এই ব্যাখ্যা শিল্পে-সাহিত্যে তো বটেই, উত্তরকালে ফ্রয়েডের শিষ্য আলফ্রেড অ্যাডলারের (১৮৭০-১৯৩৭) Individual Psychology ও কার্ল গুস্তাভ ইয়ুঙ (১৮৭৫-১৯৬১)-এর Analytical Psychology–র মধ্য দিয়ে

বিকশিত হয়। আধুনিক কথাসাহিত্যে মানবমনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ফ্রয়েডীয় মনোবিশ্লেষণ পদ্ধতির ব্যাপক ব্যবহারে সাহিত্যিকদের আগ্রহ লক্ষ করা যায়। সমালোচকের মতে :

> সামাজিক জীবনে ও লোক ব্যবহারে পরিচিত খণ্ড-মানুষের এই পূর্ণাঙ্গ সত্তাকেই আবিষ্করণের প্রয়াস শুরু হয়েছে। ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞানের যত সংযোজন ও পরিমার্জনই হোক না কেন সেখান থেকেই বর্তমান যে মনোগহনের দীপবর্তিকা লাভ করেছে তাতে মতদ্বৈধ নেই।[২]

ফ্রয়েড তাঁর গ্রন্থসমূহে[৩] মনঃসমীক্ষণধর্মী তত্ত্ব ও দর্শন উপস্থাপন করেছেন। তার বক্তব্যের সারাৎসার হচ্ছে ; মানুষের মনের জগৎ দুটি অংশে বিভক্ত– একটি চেতন, অপরটি অবচেতন। মানবমনের তিন চতুর্থাংশ বা তার বেশি অংশ জুড়ে রয়েছে অবচেতন মন যার ওপর মনের বা মানুষের নিজের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। অথচ এই অবচেতন মনই মানুষের সকল কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রণ করে প্রতিমুহূর্তেই। মানুষের অবচেতন মনে বা মগ্ন চৈতন্যে একচ্ছত্র অধিষ্ঠান কাম, ক্রোধ, হিংসা, স্বার্থপরতা প্রভৃতি রিপু। মানবমন যুক্তি দ্বারা চালিত নয়, কারণ সে তার ইচ্ছাশক্তির কর্তা নয়। মানুষের ইচ্ছা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে তার মনের অবচেতনলোকের অন্ধকারে সুপ্ত থাকা জৈবিক শক্তি দ্বারা। 'বাজিকর যেমন পর্দার আড়ালে বসে অদৃশ্য সূতার সাহায্যে পুতুলদের নাচায়, তেমনি করে এক অন্ধ জৈবিক শক্তি মানুষ-পুতুলদের নাচিয়ে বেড়াচ্ছে'[৪]। মানুষের জীবনে মাত্র দুটি প্রবৃত্তি আছে : জৈবিক প্রবৃত্তি ও বংশ প্রবৃত্তি– যা নিবৃত্তির জন্য মানুষ নিরন্তর ছুটোছুটি করে বেড়ায়।

মানুষের মনের ভেতর দুটি পরস্পর বিরোধী শক্তি কাজ করে–একটি জীবনমুখী, অপরটি মৃত্যুমুখী। জীবনমুখী শক্তিটির নাম ফ্রয়েডীয় প্রত্যয় অনুযায়ী এরস (Eros) এবং মৃত্যুমুখী শক্তিটির নাম থ্যানাটস (Thanatos)। মানুষের জীবনমুখী শক্তির বিকাশ হয় দুটো প্রধান প্রবৃত্তির মধ্য দিয়ে–আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি ও বংশবৃদ্ধির প্রবৃত্তি। 'আমরা যত রকম কাজ করি না কেন, তার মধ্যে এই দুটি প্রবৃত্তিই প্রকাশ পায়'[৫]। এই এরসকে ফ্রয়েড বলেছেন লিবিডো। লিবিডো হচ্ছে কাম তাড়না যা নারী-পুরুষের পারস্পরিক আকর্ষণের মূলে সর্বদা বিচরণশীল। লিবিডোর মূলে রয়েছে বংশবৃদ্ধির উদ্দেশ্য, আর বংশবৃদ্ধির মূলে রয়েছে মানুষের আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি। এভাবেই Eros জীবনকে সামনের দিকে নিয়ে যায়। ফ্রয়েডের মতে লিবিডোর পরিধি অনেক বিস্তৃত। সাধারণ অর্থে লিবিডো যে অর্থ প্রকাশ করে, ফ্রয়েডে তার অর্থ অনেক সম্প্রসারিত। সাধারণ অর্থে লিবিডো যৌন কামনা-বাসনার মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু ফ্রয়েডীয় প্রত্যয় অনুযায়ী যে কোনো রকম আকর্ষণকেই লিবিডো বলা যায়। তিনি দেখিয়েছেন যৌন আকর্ষণ থেকেই মানুষের সমস্ত আকর্ষণের উৎপত্তি ঘটে।

Dhaka University Institutional Repository

ফ্রয়েডের মতে মনের স্তর তিনটি : Id অর্থাৎ ইদম, Ego বা অহং Super Ego অর্থাৎ অধিসত্তা। ইদম হচ্ছে মানুষের সহজাত আদিম প্রবৃত্তি, যার প্রবল প্রভাব থাকে শৈশবাবস্থায়। এর লক্ষণ দুটো : ক্ষুধা ও রিরংসা। শিশুর বয়োবৃদ্ধি, পরিবেশ-সচেতনতা, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক চর্চার মাধ্যমে সৃষ্টি হয় ইগো বা অহং। ইদম পর্যায়ে মনের প্রবৃত্তি থাকে অনুশাসনমুক্ত ; কিন্তু পরিবেশ-সচেতনতার কারণে যে অহং-স্তরের সৃষ্টি হয় তার সঙ্গে ইদমের ঘটে তীব্র বিরোধ। এই বিরোধ হচ্ছে আদিম সত্তার সঙ্গে নৈতিক সত্তার বিরোধ। মানবমনের চূড়ান্ত বিকাশকে বলা হয় সুপার ইগো। একে বিবেকের সঙ্গে তুলনা করা যায় অনায়াসে। এটি হচ্ছে সেই মার্জিত অহং, যা মনোবিবর্তনের সর্বশেষ স্তর এবং যা শাসন করে ইগো ও ইদমকে। ত্রিস্তরে বিভক্ত মানবমনের প্রথম স্তর হচ্ছে দুর্জ্ঞেয়; কিন্তু মনের এই দুর্জ্ঞেয় প্রদেশ নির্জ্ঞান স্তরের শক্তি প্রবল ; এবং সে-শক্তিকে ফ্রয়েড বলেছেন যৌনতাত্ত্বিক মূল প্রাণনশক্তি বা লিবিডো। মানবমনের ইগো-সুপার ইগোর সঙ্গে ইদমের দ্বন্দ্ব সার্বক্ষণিক। এই দ্বন্দ্ব মূলত সচেতন বিবেকাংশের সঙ্গে অবচেতন নির্জ্ঞানের দ্বন্দ্ব। ফ্রয়েডের মতে, সচেতন মনের সঙ্গে লিবিডোকেন্দ্রিক ইদমের দ্বন্দ্ব যেমন যাবতীয় বিকারগ্রস্ততা, অস্বভাবী আচরণ, স্নায়বব্যাধি ও নিউরোসিসের আদি কারণ, তেমনি ইদম স্তরের এই লিবিডোই মানুষের সকল সক্রিয়তা ও উদ্যমের সংগোপন উৎস। লেখা বাহুল্য, ফ্রয়েড ব্যক্তির যৌন মনস্তত্ত্বের যে অজানা রহস্যকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে উন্মোচন করেছেন তারই বৈচিত্র্যময় স্বরূপ সুবোধ ঘোষের কয়েকটি গল্পে মুখ্য হয়ে উঠেছে। অবচেতনা অন্তর্গত তীক্ষ্ণ ইন্দ্রিয়জ-প্রবৃত্তি, তার আলো-আঁধারি রূপ, দুর্জ্ঞেয় রহস্যময়তা এবং তার বিনাশী শক্তি–যা প্রাত্যহিক নরনারীকে কখনো কখনো তাড়িত করে অস্বভাবী মনোবৃত্তিতে, তাকে নিক্ষেপ করে অন্ধকার কূপে, সেই দেহজ বাসনানির্ভর চরিত্রের সাক্ষাৎ মেলে সুবোধ ঘোষের বেশ কিছু গল্পে। বিচিত্র জীবনাভিজ্ঞতা, বিপুল পঠন পাঠনের অধিকারী সুবোধ ঘোষের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা[৬] সীমিত পরিসরে অর্জিত হলেও 'জ্ঞানার্জনের পথ থেকে তিনি এতটুকু সরে আসেন নি'[৭] বরং 'বিভিন্ন বিচিত্র জীবন-সংগ্রামের মধ্য দিয়েই বহু বিচিত্র অধ্যয়ন করেছেন তিনি। জীবন-সংগ্রামই ছিল তাঁর স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়। এভাবেই তিনি দর্শন, বিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব থেকে শুরু করে জ্ঞান জগতের সকল শাখাতেই স্বচ্ছন্দ বিচরণ করেছেন।'[৮] সমালোচক কল্যাণ মণ্ডলের মতে :

> বিদ্যায়তনিক কারখানায় সুবোধ ঘোষ বেশিদিন পড়েন নি। বড় বড় লম্বা চওড়া ডিগ্রিও তাঁর ছিল না। কিন্তু তাঁকে পড়তে হয়েছে প্রচুর, জানতে হয়েছে বিস্তর। জীবনের মুক্ত পাঠশালা থেকে তিনি সঞ্চয় করেছিলেন অজস্র বিচিত্রসব অভিজ্ঞতার ডালি। সেই ডালিগুলি ভরা ছিল কালোয়-ধলোয়, মানবজীবন ও মানবসম্পর্কের বিচিত্র সৌন্দর্য্যে ও কদর্যতায়, জটিলতায় আর মধুরিম সরলতায়। কলেজের পড়াশুনোর পাঠ তিনি চুকিয়ে দিয়েছেন মাত্র পনের বছর বয়সে, বলা চলে দোরগোড়া থেকেই তাঁর ফিরে যাওয়া জীবনের দুর্গম পথে। জীবিকার অন্বেষণ তাঁকে এক স্থান থেকে স্থানান্তরে টেনে নিয়ে গেছে। কিন্তু বিদ্যায়তনিক পড়াশুনো ছেড়ে দিতে হলেও সুবোধ ঘোষ কোনোদিনই তাঁর জ্ঞানার্জনের দুয়ার রুদ্ধ

> করেননি। বরং তাঁর জ্ঞানতৃষ্ণাকে নিবারিত করে চরিতার্থতা দেবার জন্য তিনি নিয়মিত স্বনির্ভর অধ্যয়নের মাত্রা ও পরিধিকে বাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করেছেন সর্বদাই। এ বিষয়ে তিনি নিজেই জানিয়েছেন: (হাজারিবাগ জেলা স্কুলের অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার) "দার্শনিক মহেশচন্দ্র ঘোষের লাইব্রেরি ছিল আমার নিজের ইচ্ছানুচালিত শিক্ষার একটি বড় সহায়। আমার এই আত্মনির্ভর শিক্ষার সিলেবাসে কাহিনী সাহিত্যের কোন স্থান একরকম ছিল না বললেই চলে। ইতিহাস, দর্শন ও ধর্মতত্ত্বের বই পড়বার দিকে আমার বেশি ঝোঁক ছিল।" বিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব কিংবা পুরাতত্ত্ব, নৃতত্ত্বেও তাঁর কম আগ্রহ ছিল না।[৯]

সমালোচকের এমন তথ্যবহুল বক্তব্য যে সর্বাংশে স্বীকার্য তা লেখকপত্নী মুকুলরাণী ঘোষের নিম্নোক্ত স্মৃতিচারণায় স্পষ্টভাবে প্রকাশিত:

> মাঝে মাঝে ভাবি, এত বই কি উনি পড়েছেন ? কিন্তু যে বইটাই খুলতে যাই, দেখি পেনসিলের দাগে আন্ডারলাইন করা কিম্বা মার্জিনে নোট লেখা ওঁর নিজের হাতে। ভোরে উঠে মুখ ধুয়ে চা খেয়েই লাইব্রেরিতে চলে যেতেন, লেখাপড়ার কাজ শুরু হয়ে যেত।[১০]

সুবোধ ঘোষ তাঁর লেখকজীবনের সূচনালগ্নে ফ্রয়েড সংক্রান্ত **১২**টি মূল্যবান প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। যেগুলো *সিগমুণ্ড ফ্রয়েড* নামে **১৯৪৩** খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তীসময়ে এই **১২**টি প্রবন্ধ নিতাই বসুর সম্পাদনায় ২০০০ সালের জানুয়ারি মাসে সাহিত্যলোক থেকে প্রকাশিত *সুবোধ ঘোষ : প্রবন্ধাবলী* গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'মনোবিজ্ঞান' শীর্ষক অংশে স্থানপ্রাপ্ত হয়েছে। প্রবন্ধগুলোতে মনস্তত্ত্বের বিভিন্ন দিক ও তার কারণ বিশ্লেষিত হয়েছে যুক্তিপরম্পরায়। ফ্রয়েডের মনস্তত্ত্বসংক্রান্ত তাত্ত্বিক বিষয় স্বীকরণ করে সুবোধ ঘোষ তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে প্রবন্ধগুলো রচনা করেছেন। কিছু ক্ষেত্রে লেখকের স্বাধীন মতামত প্রকাশের প্রবণতাও চোখে পড়েছে। এ প্রসঙ্গে সমালোচক বসন্ত লস্কর উল্লেখ করেন :

> সুবোধ ঘোষের 'সিগমুণ্ড ফ্রয়েড' সাধারণ পাঠকের ফ্রয়েড নিয়ে যাবৎ কৌতূহল তো মেটাবেই, এমনকি ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে ফ্রয়েডের একনিষ্ঠ ছাত্ররাও শ্রীঘোষের একান্ত technical বিষয়ের ও প্রাঞ্জল উপস্থাপনায় চমকিত হবেন। সিগমুণ্ড ফ্রয়েডকে যে তিনি শুধু পাঠক হিসেবে পড়েছেন তাই নয় : অসামান্য সব ছোটগল্পের স্রষ্টা সুবোধ ঘোষ যে একজন sub-creator হয়ে উঠতে পেরেছিলেন, তার সেই রহস্যের চাবি লুকানো আছে এই সত্যে যে, তিনি ফ্রয়েডকে আত্মস্থ করেছিলেন। যার ফলে 'সিগমুণ্ড ফ্রয়েড' ফ্রয়েডকে প্রাথমিক ভাবে জানার ক্ষেত্রেই সহায়ক বই মাত্র নয়, এই বই ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের transcreation.[১১]

আলোচ্য প্রবন্ধসমূহে সুবোধ ঘোষ ফ্রয়েডের তত্ত্বটিকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেছেন। ফ্রয়েড মনের সমগ্রতাকে যে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন তার উৎসও তিন রকম। যথা অদস বা ইদ (Id), অহং বা ইগো (Ego) এবং অধিশাস্তা বা সুপার ইগো (Super Ego)। আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা ইদ, ইগো এবং সুপার ইগো মনের এই ত্রি-উৎসকে যথাক্রমে 'child', 'adult' এবং 'parent' নামে

Dhaka University Institutional Repository

অভিহিত করতে অধিক পছন্দ করেন। কিন্তু নামের পরিবর্তনের সঙ্গে বিষয়ের কোনো পরিবর্তন হয় না। সহজাত যে মানসিক বৃত্তি তা হলো স্বয়ম্ভু আদিম ব্যক্তিত্ব, ফ্রয়েড যার নাম দিয়েছেন ইদ। বলা যায় ইদ ব্যক্তিত্বের সর্বাপেক্ষা গূঢ়তম অংশ, যার ইচ্ছা বহির্জগতের সংস্পর্শে এসে শুধু সুখভোগ করা, কিন্তু এর জন্যে সে বিচক্ষণ-অহংয়ের দ্বারস্থ হয়। অন্যদিকে অহং বিচারের রায় প্রার্থনা করে অধিশাস্তা বা বিবেকের কাছে। একে নৈতিক সত্তা বললেও ভুল হয় না। 'এ সত্তা সৃষ্টির মূলে প্রধানতঃ ক্রিয়াশীল হয় পিতামাতার শিক্ষা ও উপদেশ। এ ভিন্ন সামাজিক নিয়মকানুন ও অনুশাসন আর ধর্মও তার প্রভাব ঘটায়।'[১২] মূলত 'বাপ মা যেমন কিশোরকে শাসন করেন, পরা ইগোরও কাজই হল গুরুগিরি। এটা ঠিক, ওটা ভুল–নিরন্তর এই শাসন সে ইগোর উপর জারি রাখে।'[১৩] সুবোধ ঘোষ "মনের রথী ও সারথী" প্রবন্ধে বলেছেন :

> ইদ যেন সকল ইচ্ছার মূলাধার–প্রতিনিয়ত চরিতার্থতার জন্য উন্মুখ হয়ে রয়েছে। আর ইগো হলো সতর্ক সামাজিক বৃত্তি, যা হিসেব ও বিবেচনা করে চলে। ইগো ইদকে শাসিয়ে স্তব্ধ করে রাখতে চায়।[১৪]

ফ্রয়েডের মতে, ব্যক্তির স্বাভাবিক জীবন নির্ভর করে অদসের এই আত্মপ্রকাশের চেষ্টা ও অধিশাস্তার কাছে অহং-এর আত্মসমর্পণের ভারসাম্যের মধ্যে। এর ব্যত্যয় ঘটলে অচেতন-অবচেতনের বাসনাকে সীমাহীনভাবে ছেড়ে দিলে চেতনমনে অহংসত্তার বিলোপ ঘটবে এবং সেই ব্যক্তি বিভিন্ন মানসকূট ও অপচারের শিকার হয়ে পড়বেন। মানসকূট (complex) হলো ভাবনা বিকার এবং অপচার (perversion) হলো আচরণের বিকার। "মন ও মনসিজ" প্রবন্ধে সুবোধ ঘোষ বলেছেন, 'আচরণের ভেতর দিয়ে চরিতার্থতা লাভের অভাবেই লিবিডো মানসকূট সৃষ্টি করে।'[১৫] মনোচিকিৎসক ফ্রয়েড মানুষের ভাবনা ও আচরণের প্রেষণা হিসেবে লিবিডো (Libido) কেই একমাত্র দায়ী করেছেন। ফ্রয়েডের মতে, 'এই লিবিডো প্রকৃতিতে অত্যন্ত স্বার্থপর, দৈহিক সুখ-অন্বেষী, মানবীয় মূল্যবোধ কিংবা সমাজ ও ধর্মনীতি অনুসরণে অনাগ্রহী।'[১৬] মানবজীবনের শুরুতে এ লিবিডো বা রতি নিজেকে প্রকাশ করে আত্মপ্রীতির মাধ্যমে, যৌবনে যার রূপান্তর ঘটে প্রেমে। কিন্তু পার্থিবলোক লিবিডোর স্বচ্ছন্দ প্রকাশকে কোনোদিনই ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে পর্যবেক্ষণ করে না। ফলে লিবিডো আত্মপ্রকাশ ঘটায় মানসকূট অথবা অপচার-এর মাধ্যমে। মূলত মানবমনের ইদগত অচরিতার্থতায় মানসকূট সৃষ্টি করে লিবিডো মানুষকে সামাজিক অপরাধের দিকে ঠেলে দেয়। 'বাস্তবের সঙ্গে লিবিডোর প্রতিক্রিয়ার ফলে মনের মানুষ জটিল হয়ে পড়ে। নানা বাঁকাচোরা পথে লিবিডো আত্মপ্রকাশে তৎপর হয়ে ওঠে।'[১৭] বাস্তবের সঙ্গে লিবিডোর এই দ্বন্দ্বের ফলে নানা ধরনের বিকৃত মনোভাব বা মানসকূটের উদ্ভব ঘটে। সুবোধ ঘোষ "মন ও মনসিজ" প্রবন্ধে এ সংক্রান্ত মানসকূটের কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন। যেমন : অপরকে পীড়ন করে বা দুঃখ দিয়ে সুখলাভের প্রবণতা (Sadism), আত্মপীড়ন বা অপরের দ্বারা নিপীড়িত হয়ে উৎকট ধরনের আনন্দলাভের ইচ্ছা (Masochism), নিজের প্রতি

অনুরাগবশত আত্মাসক্তি (Narscism), নিজেকে অপরের নিকট আকর্ষণীয় করে তোলার প্রবণতা (Exhibitionism), বস্তুজগৎ বা পদার্থের প্রতি অকারণ মোহগ্রস্ত হবার ইচ্ছা (Fetishism) প্রভৃতি। এছাড়া লেখক তাঁর আলোচ্য প্রবন্ধে মাতা ও পুত্রের আসক্তিজনিত 'ইদিপাস' এবং পিতা-পুত্রীর 'ইলেকট্রা' মানসকূটের উল্লেখ করলেও এ সংক্রান্ত কোনো গল্পের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। ফ্রয়েডের মনোবিকলন সংক্রান্ত সুবোধ ঘোষের বেশ কিছু গল্প আমরা দেখি যেগুলোতে ব্যক্তির যৌন মনস্তত্ত্বের বিবিধ প্রান্ত উন্মোচিত হয়েছে। সুবোধ ঘোষের এই চেতনার গল্পগুলোর দুটি ধরন উল্লেখসূত্রে সমালোচক তপন মণ্ডল বলেছেন :

> একটিতে শুধু অসুস্থমনের বিকৃতির কথা অর্থাৎ মানসকূটের নিদর্শন, অন্যটিতে প্রকৃতই সুস্থতার অন্বেষণ অর্থাৎ চরিত্রগুলির আচরণগত অপচারের পরিবর্তন। একটি যদি হয় মানবমনের কুৎসিত দিকগুলির প্রতিচিত্রণ, অন্য দিকটি অবশ্যই কুৎসিতের মধ্যে সৌন্দর্য অনুধ্যান।[১৮]

প্রায় একই মন্তব্য করেছেন আরেক সমালোচক শিবশংকর পাল। তাঁর মতে :

> সুবোধ ঘোষের ফ্রয়েডিয় মনস্তত্ত্বমূলক গল্পগুলিতে দু ধরনের জীবন-বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। কোন কোন গল্পে ফ্রয়েডিয় মনস্তত্ত্ব ও মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতির সাহায্যে মধ্যবিত্তের অসুস্থতা, বিকার, জীবনবিমুখ অবক্ষয়িত মানসিকতার 'নষ্ট শসা,' 'পচা চালকুমড়া,' 'গলগণ্ড' সমন্বিত বীভৎস চেহারাটাকে উন্মোচিত করে দিয়েছেন। এ ধরনের গল্পগুলিতে কোন চরিত্রের সুস্থ উত্তরণ লেখক দেখান নি। তিনি নিজেই যেন খানিকটা জীবনবিমুখ হয়ে পড়েছিলেন এ গল্পগুলিতে। আবার কিছু কিছু গল্পে মনঃসমীক্ষণের সাহায্যে বিকারগ্রস্ত, অসুস্থ, উন্মত্ত মানুষগুলির চাপা পড়ে থাকা মানবিকতায় নতুন টাটকা রক্ত সঞ্চার করে তাদেরকে সুস্থ পৃথিবী ফিরিয়ে এনেছেন। এই গল্পগুলিতে লেখকের মানবিক মূল্যবোধ চর্চা অব্যাহত থেকেছে।[১৯]

সুবোধ ঘোষের প্রথম প্রকাশিত গল্প 'অযান্ত্রিক'[২০] (১৯৪০)-এ ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন-আশ্রিত বস্তুরতির সার্থক চিত্র উপস্থাপিত। আলোচ্য গল্পের নায়ক আর্থিক দিক থেকে প্রায় সহায়-সম্বলহীন এবং সাংসারিক ও পারিবারিক দিক থেকেও বিবিক্ত, অসহায় বিমলের একমাত্র সঙ্গী একটি জরাজীর্ণ গাড়ি 'জগদ্দল' যা 'সাবেক আমলের একটা ফোর্ড, প্রাগৈতিহাসিক গঠন, সর্বাঙ্গে একটা কদর্য দীনতার ছাপ'[২১] ; এরূপ প্রাণহীন পদার্থের প্রতি নায়ক বিমলের যে আকর্ষণ গল্পে উপস্থাপিত হয়েছে তা তার বস্তুরতিবাদের সার্থক দৃষ্টান্ত বলা যেতে পারে। *Three Essays on the theory of Sexuality* গ্রন্থে ফ্রয়েড মানুষের যৌনচেতনার বিচিত্র ধরনধারণ নিয়ে যে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন তার একটি তাৎপর্যপূর্ণ অংশ হলো বস্তুরতি (Fetishism)।[২২] এর লক্ষণ হলো, বস্তু নিচয়ের প্রতি অকারণ মোহজাত হৃদয় দৌর্বল্য। গল্পে বিমল তার গাড়ি জগদ্দলের প্রতি যে আচরণ প্রকাশ করেছে তা ফ্রয়েডীয় বস্তুরতির অনুগামী। যন্ত্র হিসেবে নয়, জগদ্দলকে একান্ত আপনজন হিসেবে বিবেচনা করে বিমল তার প্রতি ভালোবাসা, মমত্ববোধ, রাগ, দুঃখ, অভিমান এসকল অনুভূতি প্রকাশ করেছে।

'যন্ত্রের প্রতি মানুষের যে স্বাভাবিক আচরণ প্রকাশিত হয় তা থেকে ভিন্নতর এক অযান্ত্রিক সম্পর্কে বিমল আর জগদ্দল নিত্য স্পন্দিত হয়েছে।'[২৩] কেবল তা-ই নয়, এই গাড়িটি কখনো বিমলের কাছে স্ত্রীসদৃশ হয়ে ওঠে। তাই পিয়ারা সিং যখন বিমলকে তার এ আপনজনকে মুক্তি দিয়ে নতুন গাড়ি ক্রয়ের প্রস্তাব দেয় বিমল তার জবাবে প্রতিবাদী হয়ে বলে ওঠে, 'হুঁ, তারপর তোমার মতো একটা চটকদার হাল-মডেল বেশ্যে রাখি।'[২৪] এখানে জগদ্দলকে বিদায় করে হাল আমলের গাড়ি কেনা বিমলের কাছে স্ত্রীকে বিদায় দিয়ে বেশ্যাকে বাড়িতে আনারই নামান্তর। এছাড়া নিজের হাতঘড়ি, বাসনপত্র এমনকি আসনের তক্তপোশটা পর্যন্ত বিক্রি করে 'জেনুইন পার্টস' আনিয়ে জগদ্দলকে নতুন করে সাজায় বিমল যা তার বস্তুরতিবাদের সার্থক চিত্রায়ণ বলা যেতে পারে। কাহিনীর নায়ক বিমল হলেও এখানে পৃথকভাবে যেন একটি জীবিত সত্তা হয়ে ওঠে জগদ্দল নিজেও। বিমলের বেদনার জগৎকে যথাযথভাবে চিত্রিত করার জন্য সার্থকভাবে নির্মিত হয়েছে জগদ্দল চরিত্রটি। মনুষ্যেতর প্রাণীকে এইভাবে গল্পের মূল আখ্যানে তুলে এনে মানুষের মতো আচরণ সার্থকতার সঙ্গে সম্পন্ন করার গল্পের পৃথক একটি চরিত্র করে গড়ে তোলার নিদর্শন বাংলা সাহিত্যে আমরা এর আগেও প্রত্যক্ষ করেছি। প্রসঙ্গত প্রভাতকুমারের "আদরিণী", শরৎচন্দ্রের "মহেশ", তারাশঙ্করের "কালাপাহাড়" প্রভৃতির উল্লেখ করা যায়। কিন্তু কোনো যন্ত্রকে গল্পের কেন্দ্রে চরিত্র হিসেবে স্থাপন করে গল্পআখ্যান নির্মাণ বাংলা সাহিত্যে এই প্রথম। বীরেন্দ্র দত্তের মতে বিমল গল্পের নায়ক হলেও জগদ্দল গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র ; কারণ :

> বিমলের যা কিছু চিন্তা-ভাবনা, ক্ষোভ, ক্লেশ, দুঃখ-কষ্ট, অসহায়তা, আনন্দ, উল্লাস-সব কিছুই জগদ্দলকে কেন্দ্র করে, তাকেই মানবজীবনের তথা বিমলের পক্ষে বিশাল শ্রমজীবনের একমাত্র ভিত্তি করে।[২৫]

বস্তুরতির এমন সার্থক দৃষ্টান্ত বাংলা ছোটগল্পে প্রায় দুর্লভ বলা যায়। নিঃসঙ্গ বিমলের পনেরো বছরের এই আপনজন যখন বিক্রি হয়েছে চোদ্দ আনা মণ দরে, তখনও তার জগদ্দলের প্রতি ভালোবাসা অন্তর্হিত হয়নি। এখানেই গল্পটি বিশিষ্ট ও অনন্য হয়ে উঠেছে। সমালোচক জগদীশ ভট্টাচার্য আলোচ্য গল্প প্রসঙ্গে বলেছেন :

> 'অযান্ত্রিকে' যন্ত্রযুগ যেন কথা কয়ে উঠল! জড়ে আর জীবে, যন্ত্রে আর মানুষে এ যুগের জীবন যে অবিচ্ছেদ্যভাবে গ্রথিত, এই সত্যই যেন নতুন করে উদ্ভাসিত হল এই গল্পে।[২৬]

অপর সমালোচক চলচ্চিত্রকার ঋত্বিক ঘটকের মতে :

> সবচেয়ে নাড়া দিয়েছিল গল্পটার philosophi implication. এই একটি গল্প যেটা আমাদের সাহিত্যে একটা নতুন ধরনের সম্পর্কের রূপদান করেছে-মানুষ ও যন্ত্রের মধ্যে অবশ্যম্ভাবী তাৎপর্যপূর্ণ যে সম্পর্ক। --- কথাটা হলো, আমাদের ঐতিহ্যের সাথে ভবিষ্যৎকে একীভূত করার পথটা আমাদের বাছতে হবে,

> যন্ত্রযুগকে স্বাগত জানাবার হৃদয়বৃত্তি অর্জন করতে হবে। 'অযান্ত্রিক' গল্পটি ঠিক এই সত্যটিকেই আমাদের সাহিত্যে সর্বপ্রথম বুঝিয়ে দিল।[২৭]

বস্তুরতির পাশাপাশি মানবমনস্তত্ত্বের অপর বিকৃত অস্বভাবী আচরণ আত্মবিজ্ঞাপনের রুচি বা (Exhibitionism) এর সাক্ষাৎ মেলে সুবোধ ঘোষের "গরল অমিয় ভেল"[২৮] (১৯৪২) শীর্ষক ছোটগল্পে। গল্পটি 'সুবোধ ঘোষের নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম ব্যক্তি মনস্তাত্ত্বিক ছোটগল্প।'[২৯] দ্বিতীয় মহাসমরকালীন পর্বে রচিত এ গল্পটিতে এক মধ্যবিত্ত তরুণীর জটিল মনস্তত্ত্বের রূপরেখা এবং তার অবচেতন মনের রহস্যময় প্রবৃত্তি অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে অঙ্কন করেছেন লেখক। সুবোধ ঘোষ আলোচ্য গল্পে চন্দ্রবাবুর কন্যা মালা বিশ্বাসের হীনন্মন্যতা এবং পুরুষের জন্য প্রেমার্তিজনিত বিকৃত আত্মরতির চিত্র উপস্থাপন করেছেন সার্থকভাবে। কেবল কেন্দ্রীয় চরিত্র মালা বিশ্বাস নয় ; গল্পের পরিপ্রেক্ষিত নারী চরিত্রসমূহের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা আর পুরুষের জন্য তাদের অবদমিত আকাঙ্ক্ষার স্বরূপটিও এখানে উন্মোচিত হয়েছে। সমালোচকের মতে :

> এই চিত্র আঁকার প্রয়াসে আছে অভিনবত্ব। গল্পের উপস্থাপনা কৌশল আদ্যন্ত পাঠকদের রুদ্ধশ্বাস আড়ষ্টতায় ধরে রাখে। 'গরল অমিয় ভেল' গল্পে সুবোধ ঘোষ এক ব্যক্তি নারীর (মালা) মনের জগতের আধুনিকা স্বভাবের বিকারকে যেমন এঁকেছেন, তেমনি কয়েকজন যুবতী নারীদের একত্র সমবেত করে শিক্ষিত যুবতীদের মধ্যে mass psychology-র সূত্রে অসাধারণ দক্ষতায় তাদের আকর্ষণ করেছেন। আলোচ্য গল্পটি অবশ্যই জটিল মনস্তত্ত্বের এক রহস্যময় এ্যালবাম-যার মধ্যে আছে পুরুষদের ভিড়ে কয়েকটি রমণীর অন্ধকার মনোলোকের ছবি।[৩০]

আলোচ্য গল্পের নারী চরিত্র মালা বিশ্বাসের বিকৃত মানসিকতার মূলে ক্রিয়াশীল তার কদর্যরূপ। তাই সে উগ্র আধুনিকা :

> সকলেই চেনে মালা বিশ্বাসের মুখের বসন্তের দাগগুলি, কালো মোটা চেহারা, চোখে অদ্ভুত রকমের চশমা, হাতে ছাতা, তার শাড়ি, রঙ-এর বৈচিত্র্য আর পরবার কায়দায় হাঁ করে তাকিয়ে দেখার মতো।[৩১]

লেখা বাহুল্য, মালা বিশ্বাসের অবচেতনলোকে বিচরণশীল তার স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য। কেননা 'নিজেকে পুরুষের সামনে আকর্ষণীয় করে তুলতেই হবে, নচেৎ তার নারীজীবন বৃথা।'[৩২] মালা বিশ্বাসের এরূপ আচরণের মূলে রয়েছে তার অপরিণত ব্যক্তিত্ব ও হীনন্মন্যতা। কেননা :

> মানসিক অপরিপক্কতা থেকেই প্রদর্শনকামের উৎপত্তি ঘটে। অপরিণত ব্যক্তিত্ব, সামাজিক দক্ষতার অভাব এবং ব্যক্তি পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপনে অপটুত্বের জন্যই প্রদর্শনকামীরা এরূপ অস্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় যৌন তৃপ্তি লাভের চেষ্টা করে।[৩৩]

আলোচ্য গল্পে মালা নারীমহলে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের শিকার হয়ে যোগ দেয় স্কুলের বার্ষিক উৎসবে। তার এ অপমানের তীব্রতা প্রকাশ পায় ক্রসরোডের মোড়ে অবস্থিত কালো পাথরের টিলায় অজ্ঞাতনামা এক লিপি-বিশারদ কর্তৃক লিখিত শহরের অচেনা মেয়েদের নামে কলঙ্ককীর্তনের অপপ্রচারে। তাদের মধ্যে মহীতোষ বাবুর কন্যা পূর্ণিমা, কোনো এক সুমিতা নন্দী, সুধা দত্ত, প্রীতি মুখার্জী, মালা বিশ্বাসের বান্ধবী মুক্তি রায় প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। মালার জীবন আরো দুর্বিষহ হয়ে ওঠে যখন কুৎসার এই অপপ্রচার এসকল নারীর জীবনে প্রশস্তি হয়ে আবির্ভূত হয়। শহরজুড়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী এ নারীদের বিপরীতে মালা এক গভীর যন্ত্রণাদায়ক শূন্যতায় নিক্ষিপ্ত হয় :

> সার্থক জীবন পূর্ণিমাদের। ওরাই প্রার্থিতা। আড়াল থেকে মুক্ত করে এনে সংসার ওদেরই মুখ দেখতে চায়। ওরা দয়িতা-কামনার লীলাকুরঙ্গী। কুৎসা কলুষও ধন্য হতে চায় ওদেরই আশ্রয়ের প্রসন্নতায়। আর সকল কামনার সীমানার ওপারে এক বেদনাহীন বিরাগের মরুস্থলীতে দাঁড়িয়ে আছে মালা। সে একা, সে নিঃস্ব।[৩৪]

নৈঃসঙ্গ্যের বেড়াজাল থেকে মুক্তি পেতে অবচেতনের অন্ধ আবেগে তাড়িত হয়ে মালা এক চাঁদ-ওঠা সন্ধ্যেয় লোকচক্ষুর আড়ালে নিজেই নিজের নামে কুৎসা-কলুষ বাণী কালো পাথরের বুকে সাদা খড়ির আঁচড়ে প্রচার করে। গল্পের শেষে লেখক তাই নিরাসক্ত স্বভাবে মালা বিশ্বাসের পতনকে একেবারে নিখুঁত নির্মমতায় অঙ্কন করেছেন। দৃষ্টান্ত :

> মালা বিশ্বাস, তোমায় দূর থেকে সেলাম করি। এক দুই তিন চার --- থাক, বেচারাদের নাম আর করবো না। কত পতঙ্গের পাখা পুড়ে গেল। আর সংখ্যা বাড়িও না। তোমার চিঠির তাড়া রাণী ঝিলের জলে ভাসিয়ে দিয়ে এবার সুস্থির হও।[৩৫]

মূলত সুবোধ ঘোষ 'এ গল্পে মালা চরিত্রের নির্মাণে আধুনিক মনোবিজ্ঞানের যথার্থ প্রয়োগ করেছেন।'[৩৬] মালার হীনন্মন্যতা, তার আচার-আচরণের আপাত অসংলগ্নতা, প্রদর্শনকামের মতো বিকৃত মনস্তত্ত্ব লেখক সংকেতে ও ইঙ্গিতে গভীর তাৎপর্যময় করে গল্পে পরিবেশন করেছেন। সমালোচক অরিন্দম গোস্বামী তাই বলেছেন :

> গভীর মনস্তাত্ত্বিকতায় দ্বন্দ্বমুখর এই গল্পে সুবোধ ঘোষ পরতে পরতে নারীর মনোগহনকে প্রকাশিত করেছেন। অন্যের কামনার ধন হিসেবে নিজেকে প্রকাশ করাতেই যে নারীজীবনের সার্থকতা একথা তিনি বলেননি কোথাও। কিন্তু গল্পের শেষে এই সত্য আমরা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করি। কুরূপা রমণীর হীনন্মন্যতা, তার প্রেমের জন্য অকুণ্ঠ পিপাসা, বোধবুদ্ধিহীন আচরণ, ঈর্ষান্বিত প্রতিশোধ সমস্ত কিছুই এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে গভীর সাংকেতিকতায়।[৩৭]

"সুন্দরম্"[৩৮] শীর্ষক গল্পটিতে ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনের যথার্থ চিত্র লক্ষণীয়। আলোচ্য গল্পের মনোবিকলনজনিত সংকট মধ্যবিত্ত সন্তান সুকুমারের বিবাহকে অবলম্বন করে আবির্ভূত হয়েছে।

সুকুমারের বিবাহ সংক্রান্ত সমস্যা এবং পাত্রী নির্বাচনের আপাত ব্যর্থতাই গল্পের মূল বিষয়বস্তু বলে প্রথমার্ধে মনে হলেও আখ্যানের কাহিনীকে জটিল করে তুলেছে ভিখারিনী তুলসীর আকস্মিক আগমন। গল্পের শুরুতে দেখি ময়নাতদন্তের অভিজ্ঞ ডাক্তার কৈলাসবাবুর নিদারুণ সাংসারিক বৈভবের মাঝে পুত্র সুকুমার ব্যর্থ ব্রহ্মচর্য-সাধনায় রত। সমালোচকের মতে :

> সুকুমার চরিত্রটিকে মনোবিজ্ঞানের আলোয় প্রকাশ করেছেন লেখক। সে মনোরুগী। তার ব্রহ্মচর্য্য পালনের পদ্ধতিটি তার মনোরোগেরই প্রকাশ। তাই জীবনমুখী ও স্বাভাবিক নয়।[৩৯]

প্রাণায়াম আর যোগশাস্ত্রে অভ্যস্ত সুকুমারের এরূপ ধ্যানের জগৎ পিতা কৈলাসবাবুর ভাষায় প্রোটিনের অভাব আর অপরদিকে 'সুকুমার চোখ বুজলেই মুক্তির পিপাসায় ডাকছে–মুক্তি দে, মুক্তি দে।'[৪০] "মনোবিজ্ঞানের আবির্ভাব" প্রবন্ধে সুবোধ ঘোষ ইদগত কামনার অন্বেষণে একটি বাক্যে বলেছেন, 'মনের অতলজলের আবর্তে এক মজ্জমান কামনা সুন্দরী ডাকছে–আমায় উদ্ধার কর।'[৪১] সংসারবিমুখ সুকুমারের এরূপ মানসিকতার পরিবর্তন সাধনে তাই তৎপর ভগ্নিপতি কানাইবাবু তাকে নীচ রিপুরসের বর্ণনামূলক একটি উপন্যাস পড়িয়েছেন, ঘন ঘন সিনেমায় নিয়ে গিয়েছেন। ফলে সুকুমারের মন ক্রমশ বলে উঠেছে, 'কানাইবাবু, মানুষের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।'[৪২] মনোবিজ্ঞানীরা মানুষের ব্যর্থ ইচ্ছার কামনাকে 'Trauma' নামে চিহ্নিত করেছেন, যা সুকুমার-চরিত্রে ব্রহ্মচর্য সাধনা। যৌনতা (Sex) প্রসঙ্গে ফ্রয়েডের অভিমত হলো মানুষের অন্তশ্চেতনা জুড়ে যে কাম প্রবৃত্তি বিরাজ করছে তা অহং বা আত্মাশ্রয়ী নয়, এর জন্যে বাস্তব উদ্দীপকের প্রয়োজন হয়। এই বাস্তব উদ্দীপক প্রথমে সুকুমার চরিত্রে নীচ-রসের উপন্যাস পাঠ কিংবা সিনেমা দেখা এবং পরবর্তী সময়ে স্খলিতবসনা তুলসীর দেহজ আকর্ষণ সূত্রে গল্পে বর্ণিত হয়েছে। এরই প্রতিক্রিয়ায় গল্পে আমরা দেখি সুকুমারের তুলসীকে কেবল ভোগ করাই নয়–বিষ- মিশ্রিত পাউরুটি ভোক্ষণ করিয়ে তাকে হত্যা করার চিত্র। আসলে সুকুমারের কামাবেগ সার্থকতার সঙ্গে সঙ্গে তার চরিত্রে ইদ ও ইগোর দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যায়। তাই তার অহংসত্তা পরাভূত হয়ে সমাজগত ভয়ে আচরণগত অপচারে দৃষ্টি নিমেষ করতে বাধ্য হয়েছে। মনের গহনলোকে বিদ্যমান এ ধরনের প্রাণান্তকর ইচ্ছাকে মনঃসমীক্ষণের পরিভাষায় 'Sadism complex'[৪৩] বা ধর্ষকাম বলা হয় অর্থাৎ নিজের সুখ ও স্বার্থে অপরকে নিগ্রহ করার দুরন্ত আমোদ। 'সমগ্র গল্পটি এই কূটের শিকার হয়েছে মধ্যবিত্ত পরিবারের মেকি সৌন্দর্যতত্ত্বে বিশ্বাসী পাত্র-পাত্রীর মনোভাবের দ্বন্দ্বে।'[৪৪] তাই দেখা যায় পরিবারের সদস্যগণ সুকুমারের বিয়ের এক একটি সুন্দরী পাত্রী অপছন্দতেই তৃপ্তিলাভ করতে উৎসাহী ও তৎপর। অপরদিকে সুকুমার চরিত্রের অন্তরালে অবগাহন করে লেখক তার যৌনবিকারের চিত্র উন্মোচিত করেছেন যথাযথভাবে। বস্তুত তুলসীকে ঘিরে সুকুমারের যৌনাসক্তি ও তার যে বিকারগ্রস্ত মনের পরিচয় গল্পে চিত্রিত হয়েছে তা সংক্ষিপ্ত ও ইঙ্গিতবহ ভাষায় ব্যক্ত করতে সুবোধ ঘোষ শিল্পসার্থকতার স্বাক্ষর রেখেছেন।

মানুষের সর্বাপেক্ষা মৌলিক প্রবৃত্তি আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভের ইচ্ছা। আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করতে অসমর্থ হলে মানুষের ভেতর হীনতাবোধ দেখা দেয়। হীনতাবোধ থেকে বিভিন্ন মানসিক জট (Inferiority complex) উদ্ভূত হয় যাকে ব্যক্তির স্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব বিকাশের প্রধান অন্তরায় রূপে চিহ্নিত করা যায়। ফ্রয়েডের ধারণা অনুযায়ী এ পৃথিবী প্রধানত দুটি ভাগে বিভক্ত। একটি হলো অন্তর্লোক বা মনোজগৎ, অন্যটি বহির্লোক বা প্রতিবেশ। এই অন্তর্লোক ও প্রতিবেশের মধ্যে সুচারু সম্পর্ক গড়ে তোলাই সমাজজীবনের অন্যতম প্রধান সমস্যা। আমাদের মানসলোকের নিরন্তর চাঞ্চল্য ও বিক্ষোভের একটি প্রধান কারণ হলো–বহির্জগৎ তথা প্রতিবেশের সঙ্গে অন্তর্জগতের সংঘর্ষ। জন্মমুহূর্ত থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত এই প্রতিবেশ আমাদের ঘিরে রয়েছে। অথচ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই প্রতিবেশ কিংবা বাস্তবলোক আমাদের কাছে চরম বিরক্তিকর ও দুঃখদায়ক। অপ্রীতিকর প্রতিবেশে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের মানসিক প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। কেউ বা একে অবিচলচিত্তে গ্রহণ করেন, আবার কেউ কেউ বাস্তবকে এড়িয়ে যান নানা প্রতিক্রিয়ার সাহায্যে। ফ্রয়েড এই ক্রিয়াসমূহকে 'Escape Activity' বা পলায়নী কর্মবৃত্তি বলে আখ্যা দিয়েছেন। সমালোচক মানস রায়চৌধুরী তাঁর *লোকজীবন মনস্তত্ত্ব শিল্পসৃষ্টি* গ্রন্থের "পলায়নী মনোবৃত্তি" শীর্ষক প্রবন্ধে বলেছেন :

> শৈশবকালেই যে ব্যক্তি বাস্তবতাবোধে দীক্ষিত এবং বাস্তব পৃথিবীকে সহ্য করার মনস্তাত্ত্বিক প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন, তিনি অনিচ্ছাসত্ত্বেও নিজেকে পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেন। অন্যদিকে যে ব্যক্তির মানসিক স্থিতি তেমন দৃঢ় নয়, তিনি পরিবেশের জটিলতায় বিপর্যস্ত হয়ে পলায়নের নানা পন্থা আবিষ্কার করেন।[৪৫]

বাস্তবজগৎকে এড়িয়ে এরূপ মানসিক জটের শিকার হয়ে মানুষ নানাবিধ অপচারেও জড়িয়ে পড়ে। সুবোধ ঘোষের "গোত্রান্তর"[৪৬] (১৯৪০) গল্পের নায়ক মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধি সঞ্জয়ও পলায়নী কর্মবৃত্তি ধারণ করে তার অবদমিত যৌনাকাঙ্ক্ষা পূরণে উদ্যোগী হয়েছে। সঞ্জয় চরিত্রের এই জটিল ব্যক্তি পরিচয়কেই মনস্তাত্ত্বিক ও আর্থ-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করে সুবোধ ঘোষ গল্পে উপস্থাপন করেছেন। অর্থনীতিতে এম. এ. পাস করেও সঞ্জয় কর্মহীন, তাই 'বিংশ শতাব্দীর বিপ্লবী ধনবিজ্ঞানের সূত্রগুলি তার জানা আছে।'[৪৭] যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও চার বছর ধরে চাকরির চেষ্টালাভে ব্যর্থ হয়ে সে হতাশ ; এমনকি সাংসারিক বলয়ে এবং প্রেমের ব্যর্থতায়ও সে তিক্ত। তাই তার আত্মোপলব্ধি :

> সময় থাকতে সরে পড়া চাই। নইলে এই নিলামী মহলে তার সব মনুষ্যত্ব অতি সস্তায় বিষিয়ে যাবে। এই ভণ্ডহাস ভদ্র সংসারের ছলনাকে পেছনে রেখে চলে যেতে হবে। বোকার মত নিছক একটা গোত্রমোহের তাড়নায় সমস্ত জীবনের ইষ্ট এখানে সে বাঁধা রাখতে পারবে না। এই গৃহকূটের রহস্য সে ধরে ফেলেছে।[৪৮]

গৃহকূটের রহস্য অনুধাবন করতে সক্ষম হলেও তার চরিত্রে বিদ্যমান মানসকূটের সন্ধানে সে ছিল অসমর্থ। আর তাই গল্পে দেখি গোত্রান্তরিত হয়ে সে রতনলাল সুগার মিলে তিরিশ টাকা মাইনের চাকরি নিয়ে সেখানকার কুৎসিত, হাড়িয়ায় আসক্ত, বুকে প্লুরিসি নেমিয়ারের বোন রুক্মিণীকে ভোগ করার কদর্য উল্লাসে মত্ত হয়ে ওঠে। আদিবাসী বস্তিতে গোত্রান্তরের প্রাথমিক আনন্দ উচ্ছ্বাসে সঞ্জয় যেমন হাড়িয়ার আসরে বসতে পেরেছে, তেমনি রুক্মিণীর দেহ ভোগ করতেও তার মানসকিতায় বাধেনি বরং তার মনে হয়েছে– 'জ'লো দাম্পত্যের চেয়ে এ ঢের ভালো।'[৪৯] এখানে প্রতিকূল পরিবেশই সঞ্জয়কে বাধ্য করেছে যুক্তিহীন পাশবিক আচরণ করতে। তার এতদিনকার অবদমিত যৌনাকাঙ্ক্ষা তাই রুক্মিণীকে পেয়ে তা পূরণে সম্ভব হয়েছে। সমালোচকের মতে :

> অবদমনের ক্ষেত্রে আমরা এমন একটি অবাঞ্ছিত প্রবৃত্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকি যার অস্তিত্ব স্বীকার করতে চাই না এবং আত্মমর্যাদার স্বার্থে ভুলে যাই যে, আমরা যেন তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে মোটেই সচেতন নই। তথাপি অবদমিত প্রবৃত্তি একেবারে মন থেকে নির্মূল হয় না, বরং তা নির্জ্ঞান মনে থেকে অস্বাভাবিক জটিলতার সৃষ্টি করে।[৫০]

আসলে সঞ্জয়ের এরূপ যুক্তিহীন আচরণের মূলে আছে প্রক্ষোভ। সামাজিক কিংবা প্রাকৃতিক দুই রকমের কারণই প্রক্ষোভকে প্রভাবিত করে। প্রক্ষোভের প্রবলতম অভিব্যক্তিকে ইংরেজিতে বলা হয় 'Affect'। ফ্রয়েডের মতে, তীব্রতম আবেগ ভূমিকম্পের মতো আমাদের নাড়া দিয়ে যায়। কোনো কিছু আর তখন যুক্তি বুদ্ধির নিয়ন্ত্রণে থাকে না। সেই মুহূর্তে ব্যক্তি মানুষ হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়ে অবৈধ, অসামাজিক যে কোনো কাজ করে বসতে পারে। আলোচ্য গল্পে সঞ্জয় যা কিছু করেছে সবই নিরাপত্তার কারণে এবং ব্যক্তিগত সুখ ও কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার জন্য। তার আচরণ স্বাভাবিক দৃষ্টিতে আদিম ও অসৎ কিন্তু এর সবই হলো অবদমিত প্রক্ষোভতাড়িত, সমাজ ও পরিপার্শ্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-সঞ্জাত। এখানে সঞ্জয়-রুক্মিণীর অবচেতন মন পরস্পরের প্রতি লুব্ধ, তৃষিত ও উন্মুখ ; কিন্তু সামাজিক বিধি-নিষেধ ও মনের অর্জিত সচেতন বিবেকাংশ উভয়ের মিলনের প্রতিবন্ধক। তাই গল্পের পরিশেষে সঞ্জয়ের যে মনোজাগতিক অব্যবস্থা ও বিপর্যয়, তাকে লিবিডো তাড়নার সঙ্গে সচেতন বিবেকাংশের দ্বন্দ্ব ছাড়া কোনোভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। সুতরাং এ- সত্য স্পষ্ট যে, "গোত্রান্তর" গল্পের সঞ্জয়-রুক্মিণীর ঘটনাংশ ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনতত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিত।

মানুষের মন কখনোই সরলরৈখিক নয়। বহু বঙ্কিম পথে তার বিচরণ ঘটে। তাই মানুষের চেতন সত্তা যদি বিলুপ্ত হয়, তাহলে বাস্তবজীবনে তার ভারসাম্য বিনষ্ট হতে বাধ্য। এরকম অবস্থায় তার চৈতন্য ফিরিয়ে আনতে চিকিৎসক রোগীর জীবনের কোনো উল্লেখযোগ্য ঘটনার আঘাত দিয়ে অথবা তার মূল

ধরে নাড়া দিয়ে রোগীর পূর্বাবস্থা ফিরিয়ে আনেন। লুপ্ত চৈতন্য উদ্ধারের বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা পদ্ধতির নাম 'সাইকোথেরাপি'। সুবোধ ঘোষের 'শকথেরাপি'[৫১] তেমনই একটি গল্প। আলোচ্য গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র ওয়াটকিনস্ মূরের ছেলে বেসিল মূর মানসিকভাবে অপ্রকৃতিস্থ। তার এ অপ্রকৃতিস্থ আচরণ ছোটনাগপুরের বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজ গ্রহণ করতে পারেনি। তাই বেসিলকে দেখা যায় তার স্বশ্রেণী অপেক্ষা নিম্নআয়ের বিড়িওয়ালা, সবজি বিক্রেতা, কারখানার মিস্ত্রীদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক। বিশেষত সবজি বিক্রেতা প্রাণকুমারের স্ত্রী চম্পা আর তার ছেলে কিসটোর সঙ্গে তার ভাব অধিক। চম্পা ও বেসিলের সম্পর্ক নিয়েও বিভিন্ন মুখরোচক গল্প তৈরি করে এলাকাবাসী। তবুও অপ্রকৃতিস্থ বেসিল চম্পাকে ভালোবাসে। তার মধ্যেই বেসিল দেখতে পেয়েছে একজন সত্যিকারের 'ইন্ডিয়ান লেডি'। এরূপ অপ্রকৃতিস্থ বেসিলের পরস্ত্রীর প্রতি এমন আচরণ ফ্রয়েডীয় লিবিডো বা যৌনচেতনারই নামান্তর। মানুষ মাত্রেই জৈব প্রবৃত্তির অধিকারী। প্রবৃত্তির অচরিতার্থতা থেকে সাধারণত এরূপ অপ্রকৃতিস্থতা তৈরি হয়। ফলে ব্যক্তি মানুষ অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। গল্পে বেসিল মূর চম্পার সঙ্গে যৌনসম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী হয়ে উঠলেও সচেতন চম্পা তাতে সায় দেয়নি। গল্পকারের বর্ণনাংশ নিম্নরূপ :

> চম্পা জানে প্রাণকুমার আজ আসবে না। কোন বছরই হোলির দিনে সে আসে না। দুটো দিন সে যেন নিশ্চিহ্ন হয়ে কোথায় মিলিয়ে যায়। কিন্তু চম্পা আজ ভাবছে–বেসিল আজ যদি আসে ! দাওয়ার ওপর মচমচ জুতোর আওয়াজ। এক মুঠো ফাগ নিয়ে বেসিল এসে দাঁড়াল।
>
> –চম্পা।
>
> ডাক শুনে ঘরের ভেতর শিউরে উঠল চম্পা। বেসিল আজ চম্পাকেই নাম ধরে ডাকছে, অন্যদিন ডাকে কেষ্টকে।
>
> –আজ হোলি হ্যায় চম্পা!
>
> বাইরে আসতে হলো চম্পাকে। বেসিল হাতের ফাগ নিয়ে লেপে দিল চম্পার মুখে। আঁচলে চোখমুখ মুছে একটু সুস্থির হয়ে চম্পা দাঁড়িয়ে রইল। নেশায় তরল চোখের তারা দুটো তুলে চম্পার দিকে তাকিয়ে বেসিল বলে–চম্পা !
>
> –কি বেসিল ?
>
> –তোমায় আজ একটা কথা বলব।
>
> ভয় পেয়েছে চম্পা। কিন্তু পালিয়ে যেতেও অক্ষম, পা দুটো অচল অনড় হয়ে গেছে। একটু ভেবে নিয়ে চম্পা শেষে হাতজোড় করল। মিনতি করে বললো–না, বলো না।
>
> –উপায় নেই। আমি বলবই।
>
> –না, বলো না বেসিল।
>
> মাথাটা থেকে-থেকে ঝুঁকে পড়ছে সামনে। কপালটা একহাতে টিপে ধরে বেসিল তবু দাঁড়িয়ে আছে। চম্পা কপালের ঘাম আর চোখের কোণ দুটো আঁচলে মুছে নিয়ে যেন দম ছেড়ে নিল। বললো–আচ্ছা আর একদিন বলো।[৫২]

Dhaka University Institutional Repository

অবদমিত যৌনাকাঙ্ক্ষা পূরণে ব্যর্থ বেসিল তাই অবসাদগ্রস্ত হয়ে ওঠে। অথচ তার এই অপ্রকৃতিস্থ অবসাদগ্রস্ততা দূরীভূত হয়েছে গল্পের শেষাংশে কালাজ্বরে মৃত চম্পার চিতায় দগ্ধীভূত হবার দৃশ্যে। চম্পার মৃতদেহের ওপর নারকীয় অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে বেসিল প্রথম আক্রমণ করে পুরুতমশাইকে। আসলে চম্পার হৃদয়বিদারক মৃত্যু ও মৃত্যু পরবর্তী আচরণাদি এবং প্রবল শারীরিক আঘাত বেসিলের লুপ্ত চৈতন্য জাগিয়ে তুলেছে। এভাবেই হয়েছে শকথেরাপি। সমালোচকের মতে :

> গল্পের নামকরণের মধ্যেও মনঃসমীক্ষণের বিশেষ রীতিটিও উদঘাটিত। যদিও এখানে কোন তত্ত্ব বা সূত্রের আকারে লেখক কোন বক্তব্য উপস্থিত করেন নি। ফলে যা তত্ত্বভারাক্রান্ত হয়ে উঠবার সম্ভাবনা ছিল তা অত্যন্ত শিল্পসুন্দর হয়ে উঠেছে। ঘটনার প্রবল আবর্ত থেকেই শোকাহত বেসিল আত্মপরিচয় ও আত্মচৈতন্য লাভে সক্ষম হয়েছে।[৫৩]

ফ্রয়েড ব্যক্তির সকল আকর্ষণের মূলে যে লিবিডোকেই একমাত্র কারণ বলে বিবেচনা করেছেন তার অতিরিক্ত প্রভাবে ব্যক্তিমনে বিভিন্ন ধরনের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। দ্বন্দ্ব এমন একটি অবস্থা বা পরিস্থিতি যা ব্যক্তির মধ্যে একই সময়ে একাধিক পরস্পর বিরোধী প্রতিক্রিয়া উদ্রেক করে। যেহেতু প্রতিক্রিয়াগুলো পরস্পর বিরোধী, সেহেতু ব্যক্তির পক্ষে একই সময়ে উক্ত প্রতিক্রিয়াগুলো সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। সুতরাং কোন প্রতিক্রিয়াটি করবে, সে বিষয়ে ব্যক্তিকে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। এ সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যর্থ হলেই দেখা দেয় বিভিন্ন দ্বন্দ্ববহুল মানসিকতা। মনোবিজ্ঞানীরা ব্যক্তির দ্বন্দ্ব সমূহকে চারটি শ্রেণিতে ভাগ করে থাকেন। এগুলো হচ্ছে আকর্ষণ-আকর্ষণ দ্বন্দ্ব, বিকর্ষণ-বিকর্ষণ দ্বন্দ্ব, আকর্ষণ-বিকর্ষণ দ্বন্দ্ব এবং দ্বি-আকর্ষণ-বিকর্ষণ দ্বন্দ্ব। সুবোধ ঘোষের 'উচলে চড়িনু'[৫৪] (১৯৪১) গল্পে ব্যক্তির দ্বিআকর্ষণ-বিকর্ষণ দ্বন্দ্বের চিত্র লক্ষণীয়। এ গল্পের নায়ক স্বাস্থ্যবান দীনেশ দত্ত কোম্পানির অভ্রখনির ওভারম্যান, পঁয়ত্রিশ টাকা বেতনে চাকরি করায় তার বিয়ের সম্বন্ধ আসে আর ভেঙে যায়। এমতাবস্থায় বাধ্য হয়েই তার জৈবপ্রবৃত্তি অসামাজিকতার চোরা-পথ অবলম্বন করে। গল্পে দেখি তার জৈবপ্রবৃত্তি পূরণে দুটি নারীর সপ্রতিভ উপস্থিতি যা তাকে দ্বিআকর্ষণ-বিকর্ষণ দ্বন্দ্বে সমর্পণ করেছে :

> কোন ব্যক্তি যখন এমন দুটি লক্ষ্যের মাঝখানে উপস্থিত হয় যে দুটি লক্ষ্যের ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আকর্ষণ ক্ষমতা আছে–এ অবস্থায় তখন দ্বৈত আকর্ষণ-বিকর্ষণ দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। ব্যক্তিকে এমন দুটি লক্ষ্য বস্তুর মধ্যে একটিকে নির্বাচন করতে হবে যে দুটি লক্ষ্যেরই আকর্ষণীয় ও খারাপ দিক উভয়ই আছে। একটিকে নিলে আরেকটিকে বাদ দিতে হয় অথচ দুটিরই ভাল ও মন্দ দিক সমান জোড়ালো। সাধারণত এ অবস্থায় দ্বন্দ্বের মীমাংসা করা খুবই দুরূহ হয় এবং ব্যক্তির দ্বিধা ও দোদুল্যমানতা এত বেশী হয় যে ব্যক্তি অনেক সময়ই নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে।[৫৫]

একদিকে খনির মজুরনি বিলাসী, অপরদিকে ইরানি বেদের মেয়ে সারা এই দুই নারীর দ্বিআকর্ষণ-বিকর্ষণের দ্বন্দ্বে সৃষ্ট দীনেশের অস্বভাবী মনস্তত্ত্ব গল্পে উপস্থাপিত হয়েছে। আলোচ্য গল্পে অভ্রখনির অন্ধকার সুড়ঙ্গ পথের রূপ যেমন উন্মোচিত হয়েছে, তেমনি সেখানকার আদিবাসী জীবনের পরিচয়ও বেশ কিছুটা বর্ণিত হয়েছে। সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় দীনেশের জীবনে দুই নারীর এই দ্বৈত আকর্ষণ-বিকর্ষণের দ্বন্দ্বকে অসামঞ্জস্য বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে :

> লেখকের বিরুদ্ধে পাঠকের অভিযোগের প্রধান করাণ এই যে, বিলাসীকে কখন যাযাবরীর যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বিনীরূপে দেখান হয় নাই, দীনেশ কখনও তাহার প্রতি কোন সত্যকার টান অনুভব করে নাই। সে ভাগ্যের প্রতি গাত্রজ্বালা প্রশমনের জন্যই মাঝেমধ্যে এই অন্ত্যজপ্রেমকে বুকে টানিয়েছে–কিন্তু পাতালপুরীর হৃদয়দৌর্বল্য মর্ত্যের আলোকে লজ্জিত হইয়াছে। এই ভারসাম্যের অভাবে গল্পটির রস পূর্ণভাবে জমাট বাঁধে নাই।[৫৬]

গল্পটির শিল্পরস ক্ষুণ্ন হলেও নায়ক দীনেশের জীবনে দুই নারীর আকর্ষণ-বিকর্ষণ দ্বন্দ্ব অক্ষুণ্ন থেকেছে। তাই সে বিলাসীর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী হলেও সমাজের কারণে তা পারেনি। রুচিবান, শিক্ষিত দীনেশ তাই বিলাসীকে গ্রহণ করতে পারেনি। অন্যদিকে সারাকে কাছে পেয়ে তাকে ভোগ করতে দীনেশের এতটুকু সংকোচ লাগেনি। কারণ সারা যাযাবরী, পরিচিত গণ্ডির বাইরে তার অবস্থান। অতৃপ্ত সারা দীনেশকে তাই বলেছে :

> তুমি আমায় কিনে নাও। যতদিনের জন্যে ইচ্ছে কিনে নাও। যেদিন খুশি ছেড়ে দিও। কিছু টাকা দিলে মালিককে দিয়ে তোমার কাছে চলে আসি।[৫৭]

এখানে যাযাবরী নারী সারার যে জৈবিক প্রবৃত্তির উতরোল আহ্বান তা ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনাশ্রিত। তার অতৃপ্ত যৌনাকাঙ্ক্ষা তাকে এরূপ সংলাপ গ্রহণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। বস্তুতপক্ষে দীনেশের জীবনে দুই নারীর এই দ্বৈত আকর্ষণ-বিকর্ষণ দ্বন্দ্বসূত্রে ব্যক্তির অবদমিত আদিম যৌনাকাঙ্ক্ষার পূর্ণাঙ্গ চিত্র গল্পে উপস্থাপিত হয়েছে। এখানে দীনেশ যা করেছে তা প্রেমের দ্বারা চালিত নয়, বরং মধ্যবিত্ত জীবনের বঞ্চনাজাত বিকৃত অভিমান ও অস্বভাবী মনস্তত্ত্ব থেকে সৃষ্ট জটিলতা প্রেরণা জুগিয়েছে।

ফ্রয়েডীয় অবচেতন তত্ত্ব থেকে উদ্ভূত মনোবিকলনের সার্থক প্রয়োগ ঘটেছে লেখকের 'একতীর্থা'[৫৮] শীর্ষক গল্পে। আলোচ্য গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র বীণা দিদিমণির অবদমিত যৌন কামনার ফলে সৃষ্ট বিভিন্ন অস্বভাবী আচরণ গল্পকার অতি সূক্ষ্মভাবে এতে তুলে এনেছেন। এ গল্পটি সম্বন্ধে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, 'এক বৃদ্ধা শিক্ষয়িত্রীর শিষ্য-বাৎসল্য ও সিনেমা-প্রীতির চমৎকার বর্ণনা'।[৫৯] কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গল্পটিতে বৃদ্ধা নায়িকার শিষ্য-বাৎসল্য ও সিনেমাপ্রীতিই মুখ্য বিষয় হয়ে ওঠেনি,

বরং 'অবদমিত কামনার ঘুরপথ পরিতৃপ্তি ঘটাতেই নায়িকার শিষ্য-বাৎসল্য ও সিনেমাপ্রীতির অবতারণা করেছেন লেখক।'[৬০] অকাল বৈধব্যের শিকার নিঃসন্তান স্কুল শিক্ষিকা বীণা দিমিমণি তার বঞ্চিত, অবহেলিত জীবনের সুখ-কামনা পূরণে নানাবিধ অস্বভাবী ক্রিয়ায় অবতীর্ণ হয়েছে যা ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনধর্মী। "বাতিক ও সাইকো-এনালিসিস" শীর্ষক প্রবন্ধে সুবোধ ঘোষ উল্লেখ করেছেন :

> বাতিক কথাটা একটা সাধারণ নামকরণ মাত্র ; এর অর্থের পরিধির ভেতর বহু বিভিন্ন উপসর্গের শ্রেণীবিভাগ আছে। সেই সব উপসর্গের বাহ্যিক প্রকাশ রূপে ও রীতিতে যতই পৃথক হোক না কেন, তাদের উৎপত্তির ইতিহাস এক মূলসূত্রে গ্রথিত আছে। এক কথায় বলতে পারা যায় : বাতিকের উদ্ভব দ্বন্দ্ব (Conflict) থেকে। কিসের দ্বন্দ্ব ? উত্তর নানাভাবে দেওয়া যায়। (ক) ইগো বনাম ইদ, ইগো বনাম বাস্তব জগৎ, ইগো বনাম পরা-ইগো–মনের ভেতর এদের যে কোন দু'জনের দ্বৈরথ যুদ্ধে বাতিক অবস্থা অবশ্য সৃষ্টি হয়। (খ) অথবা মনের যে কোন দুটি ক্রিয়াশক্তির (Psychic forces) পারস্পরিক বিরোধে বাতিক অবস্থা তৈরী করতে পারে। কিম্বা ; মোটামুটিভাবে বলা যায় (গ) অচেতন ও চেতন মনের দ্বন্দ্ব। যেভাবেই বলা যাক্, বাতিক রহস্যের মূল সত্যটা অবিকল থাকে–দমিত ইচ্ছাবৃত্তির আত্মস্ফূর্তির আবেগ। এর সঙ্গে ডাক্তার ফ্রয়েডের আর একটা মন্তব্য বা সিদ্ধান্ত স্মরণে রাখা উচিত। যাকে দমিত ইচ্ছাবৃত্তি বলা হচ্ছে, সেটা নিশ্চয় কামজীবনের কোন অভিজ্ঞতা থেকে প্রসূত। এই অভিজ্ঞতা আসলে বাধাজনিত অভিমান। আদি কামাবেগের অতৃপ্তি নিরোধ ও ব্যর্থতা থেকে অন্তশ্চেতনায় যে জটিল বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়, সেটাই চেতন মনের আবহাওয়াকে বাতিকের ঝড়ে অশান্ত করে তোলে।[৬১]

আলোচ্য গল্পে আদ্যন্ত বীণা দিদিমণির আচরণ স্বাভাবিক নয়। তাই তার মনোজগতে একাধিক বাতিক প্রবণতা মুহুর্মুহু ক্রিয়াশীল হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। গল্পকারের ভাষায় :

> বীণা দিদিমণি বেশ আছেন। সিনেমাতে ছবি দেখার বাতিকটা তাঁর নতুন। এর আগে গ্রামোফোন রেকর্ড শোনার শখ ছিল বীণা দিদিমণির। তার আগে পড়তেন উপন্যাস। তারও আগে শুধু চিঠি লিখতেন–চেনা, আধ-চেনা, একেবারে অচেনা, কোনো একটা সম্পর্ক আর প্রসঙ্গ পেলেই তাদের চিঠি লিখতেন। --- তারও আগে শুধু ব্রত করার বাতিকে পেয়েছিল বীণা দিদিমণিকে। এই সব পুরনো ইতিহাসের ঘটনা বলতে গেলে প্রায় চল্লিশ বছর আগের কথা এসে পড়ে। তখন সবে একটি বছর মাত্র হয়েছে-স্বামী হারিয়েছেন বীণা দিদিমণি।[৬২]

এই তথ্য পরিবেশন করে লেখক বীণা দিদিমণির অবদমিত মনের অসুস্থ বিকৃতি গল্পে পরিবেশন করেছেন যথাযথভাবে। একাকী, অবলম্বনহীন এ নারী তার চার ছাত্রী গৌরী, লীলা, শান্তি আর অর্চনাকে নিয়ে সিনেমা দেখতে গেলে কোনো অস্বস্তিকর দৃশ্যের অবতারণা হলে তাদেরকে সতর্ক করে দেন। পরবর্তীকালে প্রথম তিন ছাত্রীর বিয়ে হয়ে গেলে তাদের দাম্পত্যজীবনের চিঠিপত্র জোর করেই পড়তেন তিনি। এখানে বীণা দিদিমণির এরূপ আচরণের মূলে রয়েছে তার অবদমিত

যৌনাকাঙ্ক্ষা থেকে সৃষ্ট জটিলতার পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ। কেবল তা-ই নয়, বিধবা ছাত্রী অর্চনার অবদমিত যৌনাকাঙ্ক্ষা বীণা দিদি বুঝতে পেরে রূপালী পর্দায় পরিবেশিত যৌনদৃশ্য দেখতে পূর্ব নিষেধাজ্ঞা তিনি প্রত্যাহার করেছেন :

> বীনা দিদিমণি একটু নড়ে বসলেন। অর্চনার দিকে তাকালেন। অর্চনা নিমেষের মধ্যে চোখ নামিয়ে ফেললো। দিদিমণি আর একবার ছটফট করে উঠলেন। তারপর আস্তে আস্তে ডাকলেন–অর্চনা ? শুনছো? চোখ নামাতে হবে না। মাথা ওঠাও। ছবি দেখ।[৬৩]

না পাওয়া দাম্পত্যজীবনের অবদমিত যৌনাকাঙ্ক্ষার স্বাদ উপভোগ করতেই বিধবা অর্চনাকে অবাঞ্ছিত দৃশ্য দেখার অনুমতি দানের নামে প্রকারান্তরে তাকে যৌনজীবনে যাওয়ার ছাড়পত্র দিয়েছেন বীণা দিদি। এখানে বীণাদিদির যে মনস্তাত্ত্বিক আচরণ প্রকাশিত, তা ফ্রয়েডের অবচেতন তত্ত্বকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। ফ্রয়েড বিশ্বাসযোগ্য দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখিয়েছেন, মানুষের বেশিরভাগ কাজ মনস্তাত্ত্বিক শক্তি দ্বারা তাড়িত হয়ে করা। যেমন একটি বরফ খণ্ডের বেশিরভাগ পানিতে ডুবে থাকে, মানুষের মনও তেমনি অবচেতনে একইভাবে সক্রিয় থাকে। মানুষের কাজের বেশিরভাগ অংশ হচ্ছে এই অবচেতনের ফল, তাঁর মতে, মানুষের প্রত্যেকটি মানবিক আচরণই যৌনতা দ্বারা তাড়িত হয়ে করা। অবদমিত কামনা বাসনা এর সঙ্গে যুক্ত। গল্পে বীণা দিদিমণির মনস্তাত্ত্বিক আচরণসূত্রে ফ্রয়েডের উক্ত অবচেতন তত্ত্ব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

সুবোধ ঘোষ সামাজিক বিন্যাস ও স্তরভেদের ফলে সৃষ্ট মানুষের মনোব্যাধির বিস্তার ও সংক্রমণের জটিলতা তাঁর "কাঞ্চন সংসর্গাৎ"[৬৪] (১৯৪৪) শীর্ষক গল্পে তুলে ধরেছেন। এ গল্পে দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে বিহারের রামগড়ের অধিবাসী অটলনাথ চৌধুরী ক্রমশ ধনকুবের 'বাণিজ্যবীর' এ উত্তীর্ণ হয়ে ওঠেন। স্ত্রী মণিমালার গার্হস্থ্য দায়িত্ব সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে উপার্জনের উন্মাদ আকূতিতে কৃচ্ছসাধন, পরিশ্রম ও পাটোয়ারি বুদ্ধির দাপটে ক্রমে একজন অভিজ্ঞ দালাল-ব্যবসায়ী হয়ে উঠেছিলেন এককালের ছাতুখেকো গরীব অটলনাথ। 'বিশ শতকের আধুনিকোত্তর মুরারি শীল'[৬৫] হিসেবে বিবেচিত এ ব্যক্তির দারিদ্র্য থেকে সৃষ্ট মানসিক বিভ্রম তাকে জটিল এক মনোরোগীতে পরিণত করেছে। সমালোচক বলেছেন :

> সামাজিক বিন্যাস ও স্তরভেদ (নিম্ন বনাম উচ্চ) মনোব্যাধির বিস্তার ও সংক্রমণের সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত। সমাজের নিচু মহলেই বেশি মনোব্যাধি। অর্থনৈতিক দুরবস্থার সঙ্গেও মনোব্যাধির বিশেষ যোগ।[৬৬]

আলোচ্য গল্পে অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা থেকে উদ্ভূত অটলনাথের মনোজগতে যে বিকৃতির উল্লেখ, তা উপস্থাপনসূত্রে সুবোধ ঘোষ শিল্পসচেতনতার স্বাক্ষর রেখেছেন। বন্ধুর ছেলে কান্তিকুমারকে নিজের আয়ত্তের মুঠিতে এনে অটল তাই যাবতীয় অপকর্ম তাকে দিয়ে সাধন করলেও প্রকারান্তরে তার মনোবিকৃতি ধীরে ধীরে কান্তি-প্রেমিকা জয়ার আকর্ষণসূত্রে গল্পে প্রকট হয়েছে। মনোবিজ্ঞানী ফিনের মতে :

> বিত্তহীনতার কালচার মূলত এক মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা। এই তথাকথিত পরিমণ্ডলে যে মানুষ বাস করে, সে অনুভব করে বৃহত্তর সমাজের বিবিধ সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও প্রাতিষ্ঠানিক বৈভবের অংশীদার সে নয়। এক বিচ্ছিন্নতার অনুভূতি ও বোধ, উদ্দেশ্যহীনতার, শিকড়হারা অসূয়া ও সিনিসিজম এবং উদাসীনতা তার নিত্যসঙ্গী।[৬৭]

স্ত্রীর মৃত্যুর পর অটলনাথ কান্তিকুমারের প্রেমিকা জয়ার প্রতি যৌন লালসায় মত্ত হয়ে ওঠার নেপথ্যে ক্রিয়াশীল তার বিত্তহীন অবস্থানে সতত বিচরণশীল ব্যক্তিক অন্তঃসারশূন্যতা ও বিচ্ছিন্নতাজাত উপলব্ধি। জয়ার সমস্ত আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের বিনিময়ে তাকে কিনে নেয় অটলনাথ। এর প্রতিক্রিয়ায় অটলনাথ যে যৌন লালসায় জয়াকে ভোগ করতে উদ্যত হয় তা ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনের পর্যায়ভুক্ত:

> আহত জানোয়ারের মত আচমকা হিংস্র মূর্তি ধরে একটা লাফ দিয়ে ছাতাটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো কান্তিকুমার। সামনের সোফার উপর পড়ে এক বৃদ্ধ অজগর যেন কুণ্ডলী পাকিয়ে লালসায় কাতরাচ্ছে। কিন্তু আবার সেই সতত সৎপথে চলা, কৃতজ্ঞতায় বাঁধা, পরোপকারে ডগমগ ও পুরস্কার-প্রীত একটি অতিভদ্রের পরবশ আত্মা ঘাড় গুঁজে চেয়ারের ওপর আবার একেবারে সুস্থির হয়ে বসে।[৬৮]

স্বার্থপর, কুটিল ও আত্মসর্বস্ব অটলনাথকে কেন্দ্র করে তার বন্ধুপুত্র কান্তিকুমারের মনোজগতে যে প্রতিহিংসাপরায়ণতা জেগে উঠেছে তাতে ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বই কাজ করেছে বলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে। কেননা ফ্রয়েড মানুষকে হিংস্র বন্যপ্রাণীর সদৃশ মনে করেছেন এবং মানুষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোনো আশার কথা বলতে না পারার জন্য দুঃখবোধ করেছেন।[৬৯] অটলনাথকে কান্তির হত্যার প্রচেষ্টার মধ্যে ফ্রয়েডীয় থ্যানাটাসকেই স্মরণ করায়। এই থ্যানাটাসই পরঘাতী। অপরদিকে অটলনাথের মধ্যে যে লিবিডোর প্রকাশ তা আত্মরক্ষামূলক। নিজের একাকিত্ব দূরীকরণে জয়াকে ভোগ করে তাই তিনি আত্মরক্ষা করতে তৎপর হয়েছেন। ফ্রয়েড লিবিডোকে সম্পূর্ণ জৈবধর্মী বলেছেন, সাধারণত যৌন আকর্ষণের মধ্যেই এই প্রকার লিবিডো নিজেকে প্রকাশ করে থাকে। আসলে অটলনাথের হৃদয়হীনতা বা নিষ্ঠুরতাই তাকে এরূপ বিকৃতিতে উৎসাহী করে তুলেছে। সমালোচক সাবিত্রী নন্দ চক্রবর্তী বলেছেন:

> মধ্যবিত্ত মানুষের নৈতিক সংকটের ভয়াবহ রূপ কাঞ্চন সংসর্গাৎ গল্পটি। শঠ ধনী পিশাচ অটলনাথের কাছে মনুষ্যত্বের চরম অবমাননা হয়েছে, কান্তিকুমার ও তার প্রেমাস্পদের কাছে নিজের অধিকারের জোর হারিয়ে ফেলেছে অর্থের অভাবে, সে অন্যায়ের প্রতিবাদ করার শক্তিটুকুও হারিয়ে ফেলেছে। এই দুর্বলতাই তার নৈতিক সংকট ডেকে এনেছে।[৭০]

প্রকৃতপক্ষে উচ্চ ও মধ্যবিত্তের মনস্তত্ত্বের মৌলিক ব্যবধানগুলিকে এমন সুচারু তীক্ষ্ণতায় উপস্থাপন করার কৃতিত্বে সুবোধ ঘোষ তাঁর অসামান্য দূরদর্শিতার স্বাক্ষর রেখেছেন।

জতুগৃহ গল্পগ্রন্থের অপর গল্প "চতুর্ভুজ ক্লাব" (১৯৫১)-এ ও সুবোধ ঘোষ ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনের চিত্র অঙ্কন করেছেন। মানুষের মনের প্রত্যয়গামী ব্যবহারিক প্রমোদবিধায়ক ইচ্ছাশক্তির অস্তিত্ব নির্ভর করে অজ্ঞাতজ্ঞান এবং জ্ঞাত অজ্ঞানতা–উভয়ের দ্বন্দ্বের ওপর। ফ্রয়েড মানুষের চারিত্রিক ও ব্যবহারিক প্রমোদগুলোকে তাই দুটি ভাগে ভাগ করেছেন– (১) ভ্রমাত্মক কর্ম এবং (২) বিলক্ষণ কর্ম। পূর্বোক্ত যে সকল গল্প বিশ্লেষিত হয়েছে, সেগুলো অজ্ঞাত-জ্ঞানজাত ভ্রমাত্মক কর্মের ; কিন্তু আলোচ্য গল্পে সুবোধ ঘোষ জ্ঞাত-অজ্ঞানতাজাত বিলক্ষণ কর্মের পরিণতি বর্ণনা করেছেন। 'শারদীয় আনন্দ বাজার' পত্রিকায় প্রকাশিত এ গল্পে এক নারীকে কেন্দ্র করে চতুর্ভুজ ক্লাবের চার পুরুষ সদস্যের অবদমিত যৌনাকাঙ্ক্ষা লেখক সুনিপুণভাবে চিত্রিত করেছেন। শুরুতেই এ গল্পের কথক আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন, 'গল্পটাকে আমাদের চেংড়া বয়সের নিছক একটা গল্প মনে করবেন না মশাই। ওটা যে আসলে মানুষজাতির চেংড়া বয়সের গল্প, অন্তত এটুকু আপনার বোঝা উচিত।'[৭১] বিনু, দীপু, নরু এবং গল্পকথক ভবানী এই চতুর্ভুজ ক্লাবের চার কিশোর সদস্য। এর মধ্যে বিনু একটু বেশি বয়সের এবং পরিপক্ব চেতনার অধিকারী। তাদের এই ক্লাবের বিনু ব্যতীত প্রত্যেকের এক একটি ভালোবাসার জিনিস আছে। গল্পকথক ভবানীর গ্রামোফোন, দীপুর সাইকেল এবং নরুর ক্যামেরায় চারজনের সমান অধিকার। গল্পের সমগ্র পরিবেশ জুড়ে এই চার বন্ধুর উচ্ছ্বাস সমান অংশে চিত্রিত হয়েছে। কিন্তু বিনু যেদিন টুকু বৌকে তার একমাত্র অন্তরের সামগ্রী হিসেবে চতুর্ভুজ ক্লাবে নিয়ে এসেছে, সেদিন ক্লাবের নিয়ম অনুযায়ী সকলে তাদের নিজের ভেবে টুকু বৌকে ব্যবহার করতে গিয়ে মারাত্মক ভুল করেছে। কেবল তাই নয় টুকু বৌ তাদের নিকট ক্লাবের প্রধান আকর্ষণ রূপে পরিগণিত হয়েছে। গল্পকথকের ভাষায়, 'টুকু বৌকে নিয়ে আমরা চারজন যেন পৃথিবী থেকে পালিয়ে একটা নীল আকাশের দেশে এসে পড়েছি।'[৭২] এখানে চারজন সদস্যের এরূপ মনোভঙ্গি তাদের অবচেতনে ক্রিয়াশীল যৌনানুভব থেকে সৃষ্টি হয়েছে। সমালোচক সমীরণ চট্টোপাধ্যায় বলেছেন :

> মনোবিশ্লেষণে সকল গূঢ়ৈষাই কামজ এবং প্রায় সকলগুলি শৈশবে সৃষ্ট বলিয়া ধরা হয় ; কিন্তু সকল মনোবিদ ইহা স্বীকার করেন না। তবে অধিকাংশ গূঢ়ৈষাই যে কামজ তাহা নিশ্চিত এবং বহু রোগের কারণ

> যে শৈশবে সৃষ্ট গূঢ়ৈষা, ইহাও সত্য। যেদিক দিয়াই দেখা যাউক সকল গূঢ়ৈষাই যে কম বেশি সক্রিয়, নির্জ্ঞান যে সক্রিয় তাহা সকল মনোবাদীরাই স্বীকার করেন।[৭৩]

অবচেতনে বিচরণকারী লিবিডো তাই সক্রিয় হয়ে উঠেছে তাদের এরূপ মনোভঙ্গি প্রকাশে। গল্পে তাই দেখি বিনু, কথক চরিত্র, দীপু ও নরু যথাক্রমে টুকু বৌকে চিমটি কেটে সুখ উপভোগ করেছে তার পিঠ, হাত, পায়ের পাতা এবং ঘাড়ের ওপর। ফ্রয়েড এরূপ অপচারী ব্যক্তিদের আচরণ পরীক্ষা করে প্রমাণ করেছেন যে :

> কামাবেগ তুষ্ট করার জন্য সর্ব্বদা জননাঙ্গ ব্যবহারের প্রয়োজন না হতে পারে। অন্যতর যে কোন একটি ইন্দ্রিয় রতিসুখের সাড়া যোগাতে পারে এবং অপচারী মানুষের তাতেই তৃপ্তি চরম হয়ে ওঠে।[৭৪]

কেবল ইন্দ্রিয় আকর্ষণের দ্বারা এই চারজন তাদের অবদমিত যৌনাকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেনি, টুকু বৌ যেদিন চারজনের জন্যে খিচুড়ি রান্না করেছে, সেদিন বিনু ব্যতীত সকলে একে একে টুকুর সম্মুখে গিয়ে তাদের মনের অব্যক্ত কথা বলেছে :

> বড় ইচ্ছে করছে টুকু বৌ, আজ শুধু আমি আর তুমি দু'জনে এঘরে বসে একসঙ্গে খিচুড়ি খাই। ওদের সবাইকে খেতে দিও দাওয়ার পর। এখানে শুধু তুমি আর আমি, আর কেউ নয়।[৭৫]

গল্পে টুকু বৌ এর খিচুড়ি-পোড়ার গন্ধ আছে। খিচুড়ি রান্নাটিও এক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ। পোড়াগন্ধটির পাশাপাশি গল্পকার বিনু চরিত্রটিকে, টুকু বৌ-এর যথার্থ স্বামী-সত্তাকে চিত্রিত করেছেন। তার চরিত্রে মানসকূট নেই। গল্পের প্রধান নারী চরিত্র হিসেবে টুকু বৌ নিজেকে দুঃখ-কষ্টে জর্জরিত করে একধরনের তৃপ্তিকামী অভিমানাত্মক আচরণ প্রকাশ করেছে যা ফ্রয়েডীয় পরিভাষায় 'আত্মনিগ্রহের রুচি' বা 'Masochism' বলা যেতে পারে। এরই সফলতম অভিব্যক্তি দেখি নিম্নোক্ত সংলাপে :

> ইচ্ছে করছে এখন চারজনের কাঁধে চেপে শ্মশানে চলে যাই। তোমরা চারজনে মিলে আমাকে ছাই করে দিয়ে হাত ধুয়ে ঘরে ফিরে আসবে, ব্যস্। এর চেয়ে বেশি সুখ চাই না।[৭৬]

মানুষের সরাসরি জৈব প্রবৃত্তি আর প্রেমের দ্বন্দ্ব নিয়ে সুবোধ ঘোষ রচনা করেছেন অসাধারণ মনোবিকলনধর্মী গল্প 'বৈদেহী' (১৯৫৩)। বস্তুত এ গল্পে জৈব তাড়না আর প্রেম যে সম্পূর্ণ পৃথক তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আলোচ্য গল্পে বিবাহিত বিকাশের স্থূলকাম জীবনে প্রেমের কোনো স্থান নেই, কারণ সে ভিন্ন নারী সংসর্গে আসক্ত। স্ত্রী মল্লিকার প্রতি তাই তার ঘৃণা আর বিদ্বেষ তাকে জটিল করে তুলেছে। সমালোচক মানস রায় চৌধুরী এ প্রসঙ্গে বলেছেন :

> কোনো নারীর প্রতি একজন পুরুষের ভালোবাসার সঙ্গে ঘৃণা ও বিদ্বেষের নানা কারণ থাকতে পারে। প্রথমত আমাদের সমাজে প্রেমে ও বিবাহে একনিষ্ঠ থাকাটাই আইনসিদ্ধ হলেও মানসিক জগতে মানুষ

এখনো বহুকামী। তাই প্রত্যেকটি পুরুষ চায় স্ত্রী আমার প্রতি আসক্ত থাকুক, কিন্তু আমি পুরুষ, কাজেই অল্পস্বল্প বিবাহোত্তর প্রেম আমার ন্যায়সংগতভাবে প্রাপ্য।[৭৭]

অনেকক্ষেত্রে মানুষ নিজের এই বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব বাইরে প্রকাশ না করে তা অবদমন করতে চায়। অন্য যে কোনো অবদমনের মতোই বিদ্বেষের ন্যায় প্রবল শক্তিকে অবদমিত করলে ফল শুভ হয় না। আলোচ্য গল্পের নায়ক বিকাশও তাই স্ত্রী মল্লিকার প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব সরাসরি প্রকাশ করতে না পারায় তার ভেতর উদবেগ ও উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হয়েছে। প্রেম আর জৈব প্রবৃত্তির দ্বন্দ্ব তাকে ক্রমাগত অসুস্থ, বিকৃত চরিত্রের অধিকারী করে তুলেছে। তাই রাত দশটা হলেই বিকাশের নগ্নকাম সরীসৃপের মতো মল্লিকার প্রেমের দীপ্ত চেতনাকে অন্ধকারময় করে দুঃসহ করে তুলেছে। টেলিফোনে বিকৃত ক্ষুধা পূরণের আহ্বান তাই বিকাশকে বাধ্য করেছে গভীর অন্ধকারে বাড়ির বাইরে যেতে। বিকাশ ও মল্লিকার কথোপকথনে তাদের মানসিক উত্থান-পতনের চিত্র গল্পে উঠে এসেছে এভাবে :

বিকাশ বলে–তোমার আর এখানে দাঁড়িয়ে থাকার কোন অর্থ হয় না। যদি বুঝতাম যে ক্ষমতা চাইতে এসেছো তবে না হয় ---।

মল্লিকা–ক্ষমা ?

বিকাশ–হ্যাঁ।

মল্লিকা বলে–তোমার কাছে ক্ষমা চাইব, এটা কি আর এমন কঠিন কাজ ?

বিকাশ–তবে চলো আমার ঘরে।

অভিমানীর কণ্ঠস্বর নয়, নিতান্ত এক প্রয়োজনের আর নিছক এক ক্ষুধার কণ্ঠস্বর। দুঃসহ।

দপ্ করে জ্বলে ওঠে মল্লিকারও কণ্ঠস্বর– ছিঃ।

গম্ভীর হয় বিকাশ–এর মানে ?

মল্লিকা–কেন যাব তোমার ঘরে ? টেলিফোনে তোমার একটা নেমন্তন্ন এসেছে বলে ভয় পেয়ে ?

আমি টেলিফোন নই, কলিংবেলও নই, আমি মানুষ।[৭৮]

মল্লিকার এই আত্মসচেতনতা আর তার দেওয়া আঘাতের প্রবল অভিঘাতই বিকাশকে ধীরে ধীরে অন্ধকার গুহায়িত জীবন থেকে আলোর দিকে ধাবিত করেছে। নিষিদ্ধ অতল প্রবৃত্তিলোক থেকে মুক্তি পেয়ে বিকাশের মধ্যে জন্ম নিয়েছে নববিকশিত এক প্রণয়ী। জৈব প্রবৃত্তি আর প্রেমের দ্বন্দ্বে শেষ পর্যন্ত তাই জয়ী হয়েছে প্রেমের।

'সামগ্রিক জীবন যৌনজীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে, যৌন জীবন সমগ্র জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে না'[৭৯] –কিন্তু যখন কোনো ব্যক্তি কেবল যৌনজীবন দ্বারা সমগ্র জীবনের ছক তৈরি করে তখন ভারসাম্যচ্যুত সে জীবন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় অবধারিতভাবেই। সুবোধ ঘোষের "শরীরিণী" (১৯৫৫) গল্পের নায়ক

ভাস্কর্য শিল্পী শোভন সেন যৌন বিকারগ্রস্ত। প্রেম ও কামঘটিত যৌন প্রবৃত্তি সংক্রান্ত বিশৃঙ্খল চরিত্রের অধিকারী একজন বায়ু রোগী। তাই নগ্ন নারীকে মডেল করে মূর্তি নির্মাণ তার সেই অবদমিত যৌনাকাঙ্ক্ষা থেকে সৃষ্ট বায়ুরোগেরই নামান্তর। গল্পে দেখি পছন্দমতো মডেল না পেয়ে শেষে বিজ্ঞাপন দিয়ে শোভন সেন নায়িকা নীতা মিত্রকে মডেল হিসেবে নির্বাচিত করেন। অপরদিকে দরিদ্র পরিবারে দুপয়সা সাহায্য করবার জন্য তার এ পথে আসা। নীতাকে পেয়ে শোভন সেনের চোখের খুশি আর হাতের তুলি উল্লাসে কাজ করতে থাকে। কিন্তু একসময় ক্লান্ত হয়ে ওঠে নীতা। অনুধাবন করতে পারে শোভন সেনের লুব্ধক দৃষ্টি। যৌনসর্বস্ব হয়ে ওঠে শোভন সেনের মনস্তত্ত্ব। একদিন একটি বিশেষ মুহূর্তে নীতা শোভনকে কফি বানিয়ে তার হাতে পেয়ালা তুলে দিলে শোভন তার অবদমিত যৌন প্রবৃত্তির চরিতার্থতা প্রকাশ করে। বর্ণনাংশটি নিম্নরূপ :

> শোভন সেন ডাকেন–নীতা !
>
> নীতা–বলুন।
>
> শোভন সেন– কাল আবার আসবে তো ?
>
> নীতা– হ্যাঁ।
>
> শোভন সেন হাসেন– কফি তৈরি করবার জন্য ?
>
> নীতাও হাসে– হ্যাঁ।
>
> শোভন সেন– এ কাজ কতদিন ভাল লাগবে ?
>
> নীতা– আপনি যতদিন বলবেন, ততদিন।
>
> শোভন সেন–যদি বলি রোজই, চিরকাল করো।
>
> নীতার দু'চোখে বাগানের সব লতাপাতার ছায়ার দোলানি যেন ঝড়ের মত এসে লাগে। বুকের ভিতর টিপটিপ করে আছাড় খায় নিঃশ্বাসগুলি। নিজের কান দুটোকে যেন বিশ্বাস করা যায় না।
>
> শুনতে ভুল হয়নি তো ?
>
> শোভন সেন বলেন–বলো নীতা।
>
> নীতা বলে–চিরকাল করবো।[৮০]

আবেগে আপ্লুত হয়ে নীতা এমন প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করলেও পরবর্তীসময়ে সে এ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে। বেহায়া শরীর প্রদর্শনের চুক্তি শেষ না হতেই মডেলের কাজ ছেড়ে দিয়ে সে বিয়ে করে অন্যত্র। চুক্তিভঙ্গের ক্ষমা চাইতে এসে নীতা পুনরায় শোভনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। 'বিয়ের আগে ও পরে নীতার এই মানসিক পরিবর্তনও সম্পূর্ণতই মনস্তত্ত্বসম্মত।'[৮১] অন্যদিকে নীতাবিহীন স্টুডিয়োর দিকে তাকিয়ে শোভনের মনে হয় 'নিষ্ঠুর এক দাবির গরাদ ভেঙ্গে'[৮২] পালিয়ে গেছে নীতা মিত্র। আসলে শিল্পের জগতের বাসিন্দা হলেও শোভন সেনের সামগ্রিক জীবনযাপনে যৌনতা তথা লিবিডোই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। তাই নীতার অনুপস্থিতি তাকে জটিল এক মানসিক রোগীতে পরিণত করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

সুবোধ ঘোষ লিবিডো-তাড়িত মানুষের কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ দ্যোতক "আসক্তি ও আসঙ্গ" প্রবন্ধে বলেছেন, 'কাম প্রবৃত্তির পূর্ণ প্রকাশ দেখা যায় যৌনাসঙ্গে।'[৮৩] এর অতৃপ্তিজনিত মানুষের মনের বিকার-জাত আচরণের অপচার দেখা দিতে পারে। এরই সার্থক ও পূর্ণাঙ্গ নিদর্শন "মনোলোভা"[৮৪] গল্পটি। গল্পে দুই বিপরীত শ্রেণির দম্পতির অবদমিত যৌনাকাঙ্ক্ষা বর্ণিত হয়েছে। 'একটি পরিবার হলো ভ্রান্ত এটিকেট আর মরালে সজ্জিত ঐশ্বর্য সমেত মৃগেন বিশ্বাস আর মিতা বিশ্বাসের দাম্পত্য আর অন্যটি এদেরই ট্যাক্সি ড্রাইভার ও তার স্ত্রী–নরেশ ও সুধা।'[৮৫] আর্থ-সামাজিক পটভূমিতে রচিত গল্পটিতে দাম্পত্য সম্পর্কের ক্ষয়ের ছবি অঙ্কিত হলেও এতে লেখক চরিত্রসমূহের মনোবিকলনের দিক অনুন্মোচিত রাখেননি। তাই উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধি মৃগেন আর মিতার মনোবিকলন গল্পে সুস্পষ্টভাবেই বর্ণিত হয়েছে। নিয়মনিষ্ঠ দাম্পত্যজীবনে তাদের প্রতিটি আচরণ নির্দিষ্ট ; ফলে তারা বাতিকগ্রস্ত। গল্পকার উল্লেখ করেছেন :

> সকাল ঠিক আটটার সময় একবার ড্রইংরুমের ভিতরে মৃগেন বিশ্বাস ঠিক দেখতে পায় মিতা বিশ্বাসকে। সকাল ছটা থেকে আটটার মধ্যেই যে যার প্রসাধনের কাজ সেরে ফেলে। ঠিক ন'টা পর্যন্ত মিতার হাতে হাত রেখে বসে থাকে মৃগেন। মিতা ঠিক দু'বার হাসে। মৃগেন যখন বলে–ভাল ঘুম হয়েছিল তো মিতা, তখন একবার। আর একবার, ঠিক ন'টার সময় চেয়ার ছেড়ে যখন উঠে দাঁড়ায় মৃগেন, তখন মিতার মুখে ঝিক করে হাসি ফুটে ওঠে। মিতা বলে–তোমার ঘুম হয়েছিল তো ?[৮৬]

শুধু তাই নয়, লেখক বিবৃতি দিয়ে রেখেছেন যে, সপ্তাহের মধ্যে মাত্র শনিবার রাত আটটায় আহার পর্ব শেষ করে রাত দশটা পর্যন্ত তারা মিলিত হয় দুজনে, তারপর যে যার কাছ থেকে বিদায় নেয়। এরূপ বাতিকের উদ্ভব হয় চেতন-অবচেতনের দ্বন্দ্ব থেকে–দমিত ইচ্ছাবৃত্তির আত্মস্ফূর্তির আবেগ থেকে। তাই তারা নরেশ ও সুধার প্রতি একে অপরে আকর্ষণ অনুভব করেছে। তাদের এরূপ আকর্ষণ অনুভবের নেপথ্যে দাম্পত্যের অন্তঃসারশূন্যতাই সক্রিয় হয়ে উঠেছে। তাই তাদের দাম্পত্য ভোগে নিগ্রহামোদ (Sadism) নেই। অন্যদিকে নরেশ ও সুধা উভয়েই তার চরম শিকার হয়ে গল্পে চিত্রিত হয়েছে। ফ্রয়েড বলেছেন, 'এক্ষেত্রে নিগ্রহ করেন যিনি এবং নিগৃহীত হন যিনি–উভয়েই সমান সুখ ভোগের অংশীদার।'[৮৭] মৃগেন বিশ্বাস আর মিতা বিশ্বাস গোপনে সুধা আর নরেশের রতি দৃশ্য দেখে সম্মোহিত হয়েছে। মিতা বিশ্বাস লক্ষ করেছে :

> সুধার একটা হাতকে এক হাত দিয়ে মুচড়ে নিয়ে ধরে রেখেছে নরেশ। হেলে পড়েছে সুধার ছিপছিপে চেহারাটা। তবু আধ-কুঁজো হয়ে পিঠ বাঁকা করে মুখ ফিরিয়ে ছটফট করছে সুধা। বারবার ফসকে যাচ্ছে নরেশের হাত, কিছুতেই সুধার টোল-খাওয়া থুতনিটা ধরতে পারছে না। চোখ বড় করে, ভ্রূকুটি করে আর দাঁতে দাঁত চিবিয়ে নরেশ বলছে–তোমার সব দুষ্টুমি আমি আজ এক কামড়ে খেয়েই ফেলবো।[৮৮]

কেবল মিতাই নয়, মৃগেনও অলক্ষ্যে লক্ষ করেছে কেমন করে নরেশের স্ত্রী সুধা তার সুন্দর অঙ্গকান্তি, যৌবনের উচ্ছলতা নিয়ে তাকে প্ররোচিত করে :

> ভোরবেলায় আমার ঘুম ভাঙিয়েছিলে কেন বলো? নরেশ বলে–বেশ করেছি।
>
> সুধা বলে–প্রতিশোধ নেব।
>
> নরেশ–কি ?
>
> সুধা–আমিও তোমাকে আজ সারা রাত ঘুমাতে দেবোনা।
>
> নরেশ–সাধ্যি কি তোমার ? আমি ঘুমিয়ে পড়লাম বলে। নরেশ সত্যিই চোখ বন্ধ করে। মরিয়া হয়ে নরেশের পিঠে চিমটি কাটে সুধা, নাকের উপর একটা টোকা দিয়ে সরে পড়ে। আবার তখনি ফিরে এসে আচঁলের কোণ পাকিয়ে নরেশের কানে সুড়সুড়ি দেয়। নরেশ ছটফট করে, কিন্তু নরেশের নকল ঘুম ভাঙেনা। কোমড়ে আঁচল জড়ায় সুধা। তারপর সেই দুই ছিপছিপে হাতে নরেশের গলা জড়িয়ে ধরে। তামাকের পাইপের উত্তাপ হাতের মধ্যেই চেপে রেখে ধীরে ধীরে সরে যায় মৃগেন।[৮৯]

আসলে মৃগেনের সম্ভোগে অতৃপ্তিজনিত মানসিক অবদমন তাকে এরূপ আচরণ প্রকাশে বাধ্য করেছে।

সুবোধ ঘোষ লিবিডোতাড়িত মানুষের অস্বাভাবিক মনস্তত্ত্ব চিত্রণে বেশ সার্থকতার স্বাক্ষর রেখেছেন। এ ধারার একটি গল্প "কথামালা"[৯০]। রাইচরণ মল্লিকের কন্যা বিনীতা মল্লিক আলোচ্য গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র, বস্তুত সে-ই গল্পের কথামালা। কথা আর সুন্দর ব্যবহারে এ নারী ধ্রুবজ্যোতিদের পরিবারে একান্ত আপনজন হয়ে উঠেছে। কিন্তু বিনীতার মূল লক্ষ্য যে ধ্রুবজ্যোতি, তা এ বাড়ির সকলে প্রথমে অনুধাবন করতে পারেনি। বিনীতার অবদমিত মনোরাজ্যে ধ্রুবজ্যোতির একচ্ছত্র অধিষ্ঠান ; তাই সে প্রতিবার ধ্রুবর বিয়ের জন্য আসা প্রস্তাব কৌশলে ভেঙে দিয়েছে। এর নেপথ্যে রয়েছে বিনীতার অবচেতনে বিরাজমান ধ্রুবজ্যোতিকে পাওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা। তাই লিবিডোতাড়িত বিনীতা ধ্রুবজ্যোতিকে বিভিন্নভাবে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করেছে। গল্পের পরিণামী অংশে দেখি বিনীতার বুভুক্ষ নারীহৃদয় ধ্রুবজ্যোতির লিবিডোতাড়িত আহ্বানে তাকে স্তব্ধ, মূক করে দিয়েছে। কথা দিয়ে যে সকলের হৃদয় হরণ করেছিল, সে-ই আজ ধ্রুবজ্যোতির এরূপ আহ্বানে বাকরুদ্ধ হয়ে উঠেছে :

> বিনীতার একেবারে চোখের কাছে এসে শক্ত হয়ে দাঁড়ায় ধ্রুবজ্যোতি সেন। চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে বাইরের দরজার পর্দা ঠেলবার আগে হঠাৎ আশ্চর্য হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন মেজবউদি। একি ! কথামালা যে এখনও আছে, এখনও এই ঘরের ভিতর বসে আবোল-তাবোল কথা ছড়াচ্ছে।
>
> –না না না, আপনি সত্যিই ঠকবেন। পৃথিবীর এত ভালো মেয়ে থাকতে আপনি কেন ভুল করে --- মিছিমিছি --- আপনার মতো মানুষ কেন --- আ ঃ ।
>
> নীরব হয়ে গেল কেন কথামালা ? কথা বলে না কেন বিনীতা ? দরজার পর্দা আস্তে সরিয়ে ঘরের ভিতরে উঁকি দিতেই চমকে ওঠেন আর সরে আসেন মেজবউদি। ঠিকই তো ! কথা বলবে কেমন করে মেয়েটা ? ওভাবে মুখ বন্ধ করে দিলে কোন মেয়েই কথা বলতে পারে না।[৯১]

ফ্রয়েডের মতে লিবিডোর প্রকাশ ভালোবাসা বা আকর্ষণে। এখানে ধ্রুবজ্যোতির আচরণ সেই লিবিডো তাড়িত ভালোবাসা থেকে উদ্ভূত হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে।

আমাদের যাবতীয় ইচ্ছা ও উদ্যমের মূলে যে সক্রিয় যৌন প্রবৃত্তি, সেই যৌন আকাঙ্ক্ষার ফলেই সৃষ্টি হয় মানসিক বিকার। কাঙ্ক্ষিত সময়ে কামনার মানুষটিকে না পেলে ব্যক্তি নানাবিধ অপচারে জড়িয়ে যেতে পারে। ফলে দেখা দেয় হিংসা, বিদ্বেষ, অন্তর্দ্বন্দ্ব আর বিবিধ স্নায়বিক উত্তেজনা। এরকম একটি ঘটনা আর বিষয় উপজীব্য করে সুবোধ ঘোষ রচনা করেছেন "ঠাণ্ডা যুদ্ধের অবসান" শীর্ষক গল্প। কলেজ পড়ুয়া এক তরুণী রিক্সা আরোহিনীকে কেন্দ্র করে দুই তরুণ রিক্সাচালকের পারস্পরিক লড়াই আর স্নায়বিক উত্তেজনা গল্পটিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। রায়ের হাট স্টেশনের দুই রিক্সাচালক নিতাই আর রামচরণের মধ্যে মাস ছয়েক পূর্বেও যে অন্তরঙ্গতা ছিল তা হঠাৎই চিড় ধরে যায় জনৈক কলেজ ছাত্রীকে কেন্দ্র করে। প্রতিবেশী চালকদের দৃষ্টিতে যারা রাম-লক্ষ্মণ নামে বিবেচিত, সেই নিতাই ও রামচরণ তাদের জনৈক আরোহিনীকে হস্তগত করার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টায় রত। গল্পে তাই উঠে এসেছে ছাত্রীটিকে রিক্সা করে কলেজ পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার জন্য নিতাই আর রামচরণের মধ্যে শুরু হওয়া এক ঠাণ্ডা যুদ্ধের লড়াই। কেবল নিতাই আর রামচরণ নয়, তাদের রিক্সা দুটিও যেন মুখোমুখি আক্রোশের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকে সর্বক্ষণ। আসলে অবচেতনে বিদ্যমান নিতাই ও রামচরণের মনোজাগতিক যে অব্যবস্থা ও বিপর্যয়, তারই ফলে এরূপ বিকৃত, অসুস্থ প্রতিযোগিতায় তারা অবতীর্ণ হয়েছে। যদিও এই প্রতিযোগিতায় কেউই জয়ী হয়নি। কারণ মাসাধিক অদর্শনের পর উভয়ই দেখতে পায় সেই কলেজ ছাত্রীটি স্টেশনের ফটক পার হয়ে এসেছে এক অন্য সাজে। সিঁথিতে সিঁদুর, কানে কান পাশা, সঙ্গে একজন সুবেশ ভদ্রলোক। এক রিক্সা আরোহিনীকে কেন্দ্র করে দুই তরুণ রিক্সাচালকের এরূপ বিকৃত মনোলোকের বিচিত্র রহস্য উদঘাটনে সুবোধ ঘোষ অর্জন করেছেন এক অতুল্য সিদ্ধি।

মানুষের মনোজগতের জটিল অতল প্রবৃত্তিলোক, সেখানকার দ্বন্দ্ব-সংঘাত, মথিত হয়ে ওঠা প্রবৃত্তির তাড়না ও দুর্দমনীয় বিক্ষোভ, সংরাগ, কুণ্ডলায়িত আবেগের স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ সুবোধ ঘোষের আলোচ্য গল্পসমূহে এক বিশিষ্ট ও স্বকীয় মাত্রা এনে দিয়েছে। আধুনিক মধ্যবিত্তের জটিলমনের রহস্য উদঘাটনে মনস্তত্ত্বকে নানাভাবে প্রয়োগ করেছেন সুবোধ ঘোষ। কেননা 'দুর্বোধ্য, দুর্জ্ঞেয়, রহস্যময় মনের জটিলতাই মনস্তত্ত্বমূলক গল্পের উপাদান।'[৯২] তাই সুবোধ ঘোষের এ ধারার গল্পে মনোবিকলনের পূর্ণাঙ্গ চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে সার্থকভাবে। তাছাড়া গল্পের চরিত্রগুলোও অস্বভাবী আচরণ ও লিবিডো আক্রান্ত জটিলতায় ঘূর্ণমান।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, *সাহিত্যে ছোটগল্প*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, প্রথম 'মিত্র ও ঘোষ' সংস্করণ, শ্রাবণ ১৪০৫, পৃ. ২০৯

২. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, *বাংলা গল্প-বিচিত্রা*, প্রকাশ ভবন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, পঞ্চম মুদ্রণ, আশ্বিন ১৪১০, পৃ. ৬০

৩. ফ্রয়েডের প্রথম গ্রন্থ *Aphasia* প্রকাশিত হয় ১৮৯১ সালে। এরপর প্রকাশিত হতে থাকে তাঁর বেশ কিছু গ্রন্থ, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো *The Interpretation of Dreams (১৯০০), Three Essays on the Theory of Sexuality (১৯০৫), Jokes and Their Relation to the Unconcious (১৯০৫), Character and Anal Erotism (১৯০৮), Contribution to the Psychology of Love (১৯১০), Totem and Taboo (১৯১৩), Psychopathology of Everyday Life (১৯১৩), The Repression (১৯১৫), The Unconcious (১৯১৫), Metapsychology (১৯১৫), A General Introduction to Psycho-Analysis (১৯২০), Group Psychology and the Analysis of the Ego (১৯২১), Introductory Lectures on Psycho-Analysis (১৯২১), The Ego and the Id (১৯২৩)*

৪. অচ্যুত গোস্বামী, *বাংলা উপন্যাসের ধারা*, পাঠভবন, কলকাতা, ১৯৬৮, পৃ. ৩৫৯

৫. সুনীলকুমার সরকার, ফ্রয়েড, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, তৃতীয় প্রকাশ, মার্চ ১৯৯০, পৃ. ১৫

৬. সুবোধ ঘোষের শৈশব-কৈশোর এবং তরুণ জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয়েছে বিহারের হাজারিবাগে। এই হাজারিবাগেই তাঁর জন্ম ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ সেপ্টেম্বর। বাবা সতীশচন্দ্র ঘোষ, সরকারি জেলখানার সামান্য কর্মচারী। মা কনকলতা দেবী গৃহিণী। পিতা মাতার পাঁচ পুত্র ও দুই কন্যার মধ্যে তিনি ছিলেন দ্বিতীয়। হাজারিবাগ জেলা স্কুলের ছাত্র ছিলেন তিনি। এখান থেকেই বিজ্ঞান বিভাগ থেকে তিনি ম্যাট্রিক পাস করেন। পরবর্তীসময়ে হাজারিবাগের সেন্ট-কলম্বাস কলেজে বিজ্ঞান শাখায় ভর্তি হলেও প্রবল দারিদ্র্যের কারণে তাঁকে কলেজের পড়াশুনা ছেড়ে দিতে হয়েছিল।

৭. শিবশংকর পাল, *সুবোধ ঘোষের ছোটগল্পে মানবিক মূল্যবোধ*, সুবর্ণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ৬৬

৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৭

৯. কল্যাণ মণ্ডল, "সুবোধ ঘোষের জীবন-পরিচয়" শীর্ষক প্রবন্ধ, *কোরক* সাহিত্য পত্রিকা, প্রাক্ শারদ সংখ্যা ১৪১৫, পৃ. ৩৯৯

১০. মুকুলরাণী ঘোষ, "স্মৃতির সৌরভ" শীর্ষক প্রবন্ধ, *ভরা থাক সুবোধ ঘোষ স্মৃতি-তর্পণ*, সুবোধ ঘোষ স্মৃতি সংসদ, কলকাতা, ১৯৯১, পৃ. ৮৩

১১. বসন্ত লস্কর, "সিগমুণ্ড ফ্রয়েড-সুবোধ ঘোষ" শীর্ষক প্রবন্ধ, উত্তম পুরকাইত সম্পাদিত সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ষান্মাসিক পত্রিকা *উজাগর, শতবর্ষে সুবোধ ঘোষ সংখ্যা* ১৪১৫, পৃ. ২১০

১২. অমল শঙ্কর রায়, *মনীষা ও মনঃসমীক্ষণ*, পুস্তক বিপণি, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪, পৃ. ৬

১৩. বসন্ত লস্কর, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১১

১৪. নিতাই বসু (সম্পা), *সুবোধ ঘোষ: প্রবন্ধাবলী*, সাহিত্যলোক, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০০০, পৃ. ১৭৩

১৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৬

১৬. সৈয়দ আজিজুল হক, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প সমাজচেতনা ও জীবনের রূপায়ণ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৮, পৃ. ১৩২

১৭. নিতাই বসু (সম্পা), পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৬

১৮. তপন মণ্ডল, *গল্পকার সুবোধ ঘোষ: জীবনদৃষ্টি ও নির্মাণ শিল্প*, জ্ঞান বিচিত্রা প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জুলাই ২০০৭, পৃ. ৫৯

১৯. শিবশংকর পাল, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৫

২০. লেখকের প্রথম গল্প "অযান্ত্রিক" 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র বার্ষিক দোল সংখ্যায় ১৯৪০ সালে প্রকাশিত হয়।

২১. সুবোধ ঘোষ, "অযান্ত্রিক", *গল্পসমগ্র*-১, আনন্দ প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, জানুয়ারি ১৯৯৪, পৃ. ৪৫১

২২. Sigmund Freud, *Three Essays on the theory of Sexuality*, in Standard Edition of the Complete Phychological works of Sigmund Freud, Vol. vii, 1981, Hogarth Press Newyork, P. 147-148

২৩. অরিন্দম গোস্বামী, *সুবোধ ঘোষ কথাসাহিত্য*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, আগস্ট ২০০১, পৃ. ৯৯

২৪. সুবোধ ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫২

২৫. বীরেন্দ্র দত্ত, *বাংলা ছোটগল্প : প্রসঙ্গ ও প্রকরণ*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, আগস্ট ১৯৮৫, পৃ. ৪৭৫

২৬. জগদীশ ভট্টাচার্য (সম্পা), *সুবোধ ঘোষের শ্রেষ্ঠ গল্প*, প্রকাশ ভবন, কলকাতা ১৪০৪, পৃ. ২

২৭. ঋত্বিক ঘটক, "কেন অযান্ত্রিক করি' শীর্ষক প্রবন্ধ, *ভরা থাক সুবোধ ঘোষ স্মৃতি তর্পণ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩

২৮. 'দেশ' পত্রিকার নবম বর্ষ ৫০ সংখ্যার ৩১ অক্টোবর ১৯৪২ সালে "গরল অমিয় ভেল" গল্পটি প্রকাশিত হয়।

২৯. সুদীপ কুমার চক্রবর্তী, *ছোটগল্পের সুবোধ ঘোষ*, প্রকাশভবন, কলিকাতা, প্রকাশকাল উল্লেখ নেই, পৃ. ৬৬

৩০. বীরেন্দ্র দত্ত, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯৯-৫০০

৩১. সুবোধ ঘোষ, "গরল অমিয় ভেল", *গল্প সমগ্র*-২, আনন্দ প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম আনন্দ সংস্করণ এপ্রিল ১৯৯৪, পৃ. ১৫২

৩২. তপন মণ্ডল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬২

৩৩. মঞ্জুর আহমদ, *অস্বভাবী মনোবিজ্ঞান*, জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ২০০১, পৃ. ১৯১

৩৪. সুবোধ ঘোষ, "গরল অমিয় ভেল", পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬০

৩৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬১

৩৬. সুদীপকুমার চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত, পৃ, ৬৫-৬৬

৩৭. অরিন্দম গোস্বামী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৪-১০৫

৩৮. "সুন্দরম্" গল্পটি ১৯৪১ সালে বার্ষিক 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে এটি লেখকের প্রথম গল্পগ্রন্থ *ফসিল*-এ অন্তর্ভুক্ত হয়।

৩৯. সুদীপকুমার চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত, পৃ, ৫১

৪০. সুবোধ ঘোষ, "সুন্দরম্", *গল্প সমগ্র*-২, আনন্দ প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, এপ্রিল ১৯৯৪, পৃ. ১৩৭

৪১. নিতাই বসু (সম্পা), পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮০

৪২. সুবোধ ঘোষ, "সুন্দরম্", পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৮

৪৩. Sadism : According to Freud, the love-hate ambivalence manifested in the feelings and actions of friends and loves all come from the libido drive and the cruelty of the sadist who obtains sexual satisfaction only when subjecting his lovemate to torture could also, so it seemed at first, be merely a distoration of the libido. (*Contemporary School of Phychology*, Robert s. Woodworth

৪৪. তপন মণ্ডল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬০

৪৫. মানস রায়চৌধুরী, *লোকজীবন মনস্তত্ত্ব শিল্পসৃষ্টি*, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০০১, পৃ. ৬৫

৪৬. "গোত্রান্তর" গল্পটি ১৯৪০ সালে প্রকাশিত হয়।

৪৭. সুবোধ ঘোষ, "গোত্রান্তর", *গল্প সমগ্র*-২, পৃ. ১১৫

৪৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৬

৪৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৯

৫০. মধুমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, *মানিকের ছোটগল্পে মনস্তত্ত্ব*, অলকা প্রিন্টার্স, কোলকাতা, প্রথম প্রকাশ, শ্রাবণ ১৪০৮, পৃ. ৭৭

৫১. ১৯৪০ সালে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় "শক থেরাপি" গল্প প্রকাশিত হয়।

৫২. সুবোধ ঘোষ, "শক থেরাপি", *গল্প সমগ্র*-১, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১১

৫৩. শিবশংকর পাল, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৮

৫৪. লেখকের দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ *পরশুরামের কুঠার*-এ অন্তর্ভুক্ত "উচলে চড়িনু" গল্পটি ১৯৪১ সালে প্রকাশিত হয়।

৫৫. নীহাররঞ্জন সরকার, *মনোবিজ্ঞান ও জীবন*, জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৭৩, পৃ. ৩২৭

৫৬. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, সপ্তম পুণর্মুদ্রণ সংস্করণ, ১৯৮৪, পৃ. ৬৪৯

৫৭. সুবোধ ঘোষ, 'উচলে চড়িনু', *গল্প সমগ্র*-৩, আনন্দ প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম আনন্দ সংস্কারণ, জুন ১৯৯৪, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪৬

৫৮. "একতীর্থা" গল্পটি লেখকের তৃতীয় গল্প সংকলন *শুক্লাভিসার*-এ অন্তর্ভুক্ত হয়।

৫৯. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৫২

৬০. শিবশংকর পাল, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৬

৬১. নিতাই বসু (সম্পা), পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮২-১৮৩

৬২. সুবোধ ঘোষ, "একতীর্থা", *গল্প সমগ্র*-১, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭১

৬৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৫

৬৪. ১৯৪৪ সালে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত "কাঞ্চন সংসর্গাৎ" গল্পটি লেখকের চতুর্থ গল্প সংকলন *জতুগৃহ*-তে অন্তর্ভুক্ত হয়।

৬৫. সুমনস্বরাট ঘোষ, "কাঞ্চন সংসর্গাৎ : হিতোপদেশের পুনর্নির্মাণ" শীর্ষক প্রবন্ধ, উত্তম পুরকাইত সম্পাদিত সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ষান্মাসিক পত্রিকা *উজাগর, শতবর্ষে সুবোধ ঘোষ সংখ্যা* ১৪১৫, পৃ. ১৩৪

৬৬. মানস রায়চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৬

৬৭. সমীরণ চট্টোপাধ্যায়, *মনস্তত্ত্বের গোড়ার কথা*, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলিকাতা, ১৩৫৮, পৃ. ৬৬

৬৮. সুবোধ ঘোষ, "কাঞ্চন সংসর্গাৎ", *গল্প সমগ্র-১*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৫

৬৯. Men are not gentle, friendly creatures, wishing for love, who simply defend themselves if they are attacked but a powerful measure of desire for aggressiveness has to be reckoned as part of their instinctual endowments. (Civilization and Discontents, 1930)

৭০. সাবিত্রী নন্দ চক্রবর্তী, *আধুনিক বাংলা ছোটগল্প : মূল্যবোধের সংকট*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জুন ২০০৪, পৃ. ৮৩

৭১. সুবোধ ঘোষ, 'চতুর্ভুজ ক্লাব,' *গল্প সমগ্র-১*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮২

৭২. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯১

৭৩. সমীরণ চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩

৭৪. নিতাই বসু (সম্পা), পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮২-১৮৩

৭৫. সুবোধ ঘোষ, 'চতুর্ভুজ ক্লাব', পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৫

৭৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯১

৭৭. মানস রায়চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭০

৭৮. সুবোধ ঘোষ, "বৈদেহী", *গল্প সমগ্র-১*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৫

৭৯. ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, *পাভলভ পরিচিতি*, কলকাতা, পরিমার্জিত অখণ্ড সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০০, পৃ. ৩৩২

৮০. সুবোধ ঘোষ, "শরীরিণী", *গল্প সমগ্র-১*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৭

৮১. অরিন্দম গোস্বামী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৯

৮২. সুবোধ ঘোষ, "শরীরিণী", পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৭

৮৩. নিতাই বসু (সম্পা), পূর্বোক্ত, পৃ. ২১২

৮৪. "মনোলোভা" গল্পটি *থির বিজুরী* গল্পগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৮৫. তপন মণ্ডল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৫-৬৬

৮৬. সুবোধ ঘোষ, "মনোলোভা", *গল্প সমগ্র*-১, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৪-১৬৫

৮৭. সুনীলকুমার সরকার, *ফ্রয়েড*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭

৮৮. সুবোধ ঘোষ, "মনোলোভা", পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৭

৮৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৮

৯০. "কথামালা" গল্পটি লেখকের কুসুমেষু গল্পগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়।

৯১. সুবোধ ঘোষ, "কথামালা", পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭৬

৯২. শিবশংকর পাল, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৪

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

সুবোধ ঘোষের ছোটগল্পে প্রেম-মনস্তত্ত্ব

আবহমান মানবজীবনের একটি অনিবার্য অনুষঙ্গ প্রেম। প্রাগৈতিহাসিক সময়-পরিসরে নর-নারীর প্রেম ছিল শরীরনির্ভর। সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রেম দৈহিক সীমা অতিক্রম করে মনোজাগতিক ভাবনাস্তরে উন্নীত হয়। অতঃপর আধুনিক জীবনপ্রবাহে সভ্যতা-সংস্কৃতি, সামাজিক আচার-আচরণ, শিক্ষা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে প্রেম হয়ে ওঠে পরিশীলিত এবং মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিষয়। জীবনের ক্লান্তি আর একঘেয়েমিকে সাময়িকভাবে দূরীভূত করার লক্ষ্যেই প্রেমের বর্ণাঢ্য আনন্দ বেদনার জগতে প্রবেশের বাসনা প্রতিটি মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। লেখক কল্পনার সৃষ্টিশীল মন নিয়ে একটি ছায়াময় সুন্দর জগৎকে নির্মাণ করতে চান। এই কথারই সমর্থনসূত্রে সমালোচক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন :

> রোম্যান্টিক গল্প পাঠকের কাছে চিরদিনই পরম আদরের সামগ্রী। সমাজ ও জীবন সমস্যার নানা জ্বালা-যন্ত্রণার দহনের মধ্যখানে তারা যেন পান্থপাদপ। রোম্যান্টিক মননের আলোয় প্রকৃতি এক অপ্রাকৃত সৌন্দর্যে মণ্ডিত হয়–কামনা প্রেমের জ্যোর্তিময় মুক্তি লাভ করে, দেহ পায় দেহাতীতের বর্ণালী, জীবনের মুহূর্তগুলি সুরভিতে মন্থর হয়ে ওঠে। চিত্তের স্বাভাবিক প্রবণতায় এধরনের গল্প দুটি-চারটি সবাই-ই লিখতে চেয়েছেন।[১]

মূলত সাহিত্যের সকল শাখায় প্রেম গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হয়ে থাকে। 'প্রেম যেহেতু ব্যক্তির সর্বাধিক মুক্ত সত্তার পরিসর'[২] তাই শিল্পী-সাহিত্যিকদের চেতনামূলে এর গভীরতা ও ব্যাপকতা অধিক। অমলেন্দু বসুর মতে :

> প্রেমের অভিব্যক্তি নেই এমন কোনো শিল্পরূপ নেই। প্রেমের অভিব্যক্তি নেই এমন কোনো সাহিত্য আছে বলে আমি জানি না। প্রেমোপলব্ধির বিস্ময়, হর্ষ, উন্মাদনা, ব্যাকুলতা, তার মিলন, বিরহ, তার সম্ভোগ, তার বিক্ষোভ, প্রেমিকের অভিমান, অভিসার, সঙ্কোচ, শঙ্কা, প্রেমের আরো কত না সূক্ষ্ম বৈচিত্র্য কোনো না কোনো সজ্জায় সর্বদেশের সাহিত্যেই প্রকাশিত হয়েছে। প্রেমের জাতিভেদ নেই, দেশভেদ নেই, প্রেম কালসীমিত নয়। প্রেমের আবরণ মানবিক। প্রবৃত্তির যে-অবিচ্ছেদ্য কারাগারে নির্মম বিধাতা বন্দী করেছেন মানুষকে, নিছক যৌনলিপ্সার সে-কারাগার থেকে সুকুমার আবেগ অনুভবের নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াসকেই বলি প্রেম নামক সভ্য চিত্তবৃত্তি।[৩]

আধুনিক জীবন যেহেতু সমস্যাজর্জর, সংকটপূর্ণ ও দ্বিধাদীর্ণ ; তাই এরূপ বাস্তবতায় রোম্যান্টিকতা ও প্রেমের গল্প মানুষের কল্পনার সুদূরতা এবং মাধুর্যের আস্বাদনে লেখক-পাঠক উভয়কেই সাময়িকভাবে

আনন্দ দান করে। লেখক-শিল্পী-সাহিত্যিক ভিন্ন হতে পারেন, প্রেমের পাত্র-পাত্রী পৃথক হতে পারে, তাদের আচার-আচরণ-অভিব্যক্তি-অভিরুচি স্ব স্ব দেশ-কাল-সমাজ-উত্থিত হতে পারে, কিন্তু প্রেমের মনস্তাত্ত্বিক সম্প্রকাশের ক্ষেত্রে তারা সমতুল। বিশ্বসাহিত্যের অনেক গল্পকারই প্রেমের গল্প লিখেছেন। প্রস্পের মেরিমের "নীলঘর" গল্পে দুটি তরুণ-তরুণীর কৌতুকমিশ্রিত রোম্যান্টিক কাহিনী, আলফঁস দোদের "প্রান্তরের বুকে ছোট ম্যাজিস্ট্রেট" (Le sous-Prefet Aux champs) বা "নক্ষত্রেরা" (Les Etoiles) গল্পে প্রকৃতি ও জীবনের অপূর্ব ছন্দে মিলন কিংবা আন্তন চেকভের "চুম্বন" (The Kiss), "বল্লভা" (The Darling) গল্পের ব্যঞ্জনা ও গভীরতায় প্রেম কাব্যরূপ হয়ে ওঠার দৃষ্টান্ত আমরা স্মরণ করতে পারি। বিশ্বসাহিত্যের ন্যায় বাংলা সাহিত্যেও প্রেমের এই কাব্যধর্মী মনস্তাত্ত্বিক দিক দুর্লক্ষ্য নয়। রবীন্দ্রনাথের "সমাপ্তি", "একরাত্রি", "মহামায়া", "ক্ষুধিত পাষাণ", "নিশীথে", "মণিহারা" প্রভৃতি গল্প রোম্যান্টিক কল্পনায় সর্বত্র কবিতা হয়ে উঠেছে। বস্তু থেকে সত্যতর মায়ার সৃষ্টি–এইসব গল্পের প্রধান ঐশ্বর্য। তবে এই গল্পগুলো 'একটু চড়া পর্দার রোম্যান্টিক গল্প হয়ে উঠেছে। অতিমাত্রার মানসিক স্পর্শাতুরতা আর পরিবেশ প্রভাবই এই গল্পগুলির মূলে সক্রিয় রয়েছে।'[৪] মূলত প্রেমের মধ্যে যে দূরাভিসার বা সুদূরতার কল্পনা আছে তা এসব গল্পে চিত্রিত। মানসধর্মে বিশুদ্ধ রোম্যান্টিক রবীন্দ্রনাথের এই আসাধারণ গুণের সফল অভিব্যক্তি শিল্পরূপ পায় "একরাত্রি"র মতো অসাধারণ কাব্যধর্মী গল্প কিংবা "সমাপ্তি"র মতো প্রেমের গল্প। রবীন্দ্র পরবর্তী কল্লোল যুগের গল্পলেখকদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন কবি। ফলে গল্পের মধ্যেও তাঁদের কবিমানস ও প্রেম চেতনাকে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। সমালোচক ভূদেব চৌধুরী কল্লোল গোষ্ঠীর লেখককুল সম্পর্কে উল্লেখ করেন :

> এঁদের শিল্প-চেতনার মূলে ছিল কোনো এক অজ্ঞাত বন্ধন থেকে অপরিচিত এক মুক্তিলাভের দুর্বার রোমান্টিক পিপাসা, যাকে তাঁরা 'প্রগতি' বা 'আধুনিকতা' নামে অভিহিত করেছিলেন।[৫]

এই রোম্যান্টিক পিপাসায় অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর প্রথম পর্বের গল্পে যে জীবনকে নির্মাণ করেন, তা তাঁর নিজেরই কথায় 'রোম্যান্টিসিজমের মোহ মাখানো'।[৬] একদিকে কল্পনার আকাশ বিলাস অন্যদিকে মর্ত্যের আকর্ষণ। কঠোর বাস্তবতার মধ্যেও প্রেমের মোহ এসে ধরা দিয়েছে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পে একজন কবিরও পরিচয় পাওয়া যায়। কাব্যধর্মী ভাষায় প্রেম-মনস্তাত্ত্বিক ছোটগল্প রচনায় তাঁর সাফল্য তুলনারহিত। এ প্রসঙ্গে শীতল চৌধুরী বলেন :

> প্রেম-মনস্তাত্ত্বিক গল্প রচনার ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তবে, প্রেমের গল্প আর অলৌকিক কল্পনা যেখানে মাখামাখি হয়েছে সেখানেই প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পূর্ণভাবে সার্থকতার পরিচয় রেখেছেন। এমনকি, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক যেখানে তাঁর গল্পের কেন্দ্রীয় অবলম্বন হয়ে উঠেছে সেখানেই তাঁর লেখক প্রতিভা যথার্থভাবে বিকশিত হয়েছে।[৭]

Dhaka University Institutional Repository

সমালোচকের এমন মন্তব্যসূত্রে প্রেমেন্দ্র মিত্রের "তেলেনাপোতা আবিষ্কার", "ময়ূরাক্ষী", "পটভূমিকা" প্রভৃতি গল্পের উল্লেখ করা যায় নিঃসন্দেহে ; যেগুলোতে লেখকের কল্পনাশক্তির আশ্চর্য প্রকাশ ঘটেছে। রোম্যান্টিক আবেগ ও বাস্তবতার সুদক্ষ মিশ্রণ ঘটেছে আলোচ্য গল্পসমূহে। রবীন্দ্র প্রেমের রসানুভবধর্মী ভাববোধি থেকে ভিন্ন এক বলয় গড়ে তুলেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর এ সকল গল্পে। এখানে প্রেম কেবল আনন্দ উপভোগের সামগ্রী মাত্র নয়, তা সত্তার বহুল বিপ্রলাপ ও অন্তর্যন্ত্রণার জটিল গ্রন্থিবন্ধনও বটে। তাই এসকল গল্পের পরিণামী অংশে প্রেমের মিলনাত্মক রূপ অঙ্কিত হয়নি। অন্যদিকে বুদ্ধদেব বসুর প্রেমভাবনামূলক গল্পগুলো বস্তুবিশ্বকে ঘিরে তাঁর মদির কল্পনা আশা ও স্বপ্নের মিনার নির্মাণ করেছে। বলা যায় বুদ্ধদেব বসু প্রেম ও মনস্তত্ত্বের নিপুণ বিশ্লেষক, সে কিশোর প্রেমই হোক কিংবা ড্রয়িংরুম কেন্দ্রিক শিক্ষা ও রুচির সম্মিলনেই হোক–সর্বত্রই তার পরিচয় মেলে। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় বলেন :

> গল্পলেখক বুদ্ধদেবের শক্তিমত্তার শ্রেষ্ঠ পরিচয়স্থল তাঁর প্রেমের গল্পগুলি। 'ভাসো, আমার ভেলা' সংকলন-ধৃত ষোলটি গল্প থেকে তার পরিচয় পাই। ভালোবাসা নামক এক মন-কেমন-করা অনুভূতির আলো কীভাবে আমাদের জীবনকে বদলে দেয়, কেমন করে আমাদের দিন রাত্রির মূল্য বাড়িয়ে দেয়, জীবনের দিগন্তকে প্রসারিত করে দেয়, তারই নিপুণ শিল্পরূপ এই সব গল্প। বিশুদ্ধ ভালোবাসার গল্প অধুনা দুর্লভ। তাই বারে বারেই আমাদের ফিরে যেতে হয় বুদ্ধদেব বসুর কাছে। তাঁর কাছেই আমরা পাই সত্তা-আলোড়নকারী ভালোবাসার গল্প।[৮]

প্রথম পর্বের গল্পে বুদ্ধদেব নর-নারীর প্রেম-মনস্তত্ত্বের আনন্দময় স্বীকৃতি দিলেও শেষ পর্বের গল্পে বিচ্ছেদ ও ব্যর্থতার চিত্রই অঙ্কন করেছেন। তবে প্রেম-মনস্তত্ত্বের হরেকরঙা ও আলোআঁধারির প্রকল্পনা বুদ্ধদেবের গল্পকে দিয়েছে এক বিরলস্বাতন্ত্র্য। কল্লোলের প্রতিনিধি না হয়েও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে প্রেম-মনস্তত্ত্বের নান্দনিক চিত্র পরিবেশিত হয়েছে। তাঁর প্রেমকেন্দ্রিক গল্পের প্রধান প্রেরণাশক্তি প্রকৃতিপ্রীতি। মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণে তাঁর প্রেম শরীরীবাসনা ও প্রাপ্তির উল্লাস থেকে সর্বাংশে মুক্ত। গল্পের নর-নারীর প্রেম-মনস্তাত্ত্বিক সম্প্রকাশে তিনি নিসর্গ-প্রকৃতির মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন। সেখানে বুদ্ধদেব বসুর মতো নর-নারীর দৈহিক প্রেম কিংবা প্রেমেন্দ্র মিত্রের মতো ত্রিকোণ, জটিল দাম্পত্য প্রেম-মনস্তত্ত্বের বিন্দুমাত্র স্পর্শ লাগেনি। বিভূতিভূষণের সমসাময়িক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম জীবনে বেশ কিছু প্রেম-মনস্তাত্ত্বিক ছোটগল্প রচনা করেছিলেন যেগুলো ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। সেখানে ফ্রয়েডীয় লিবিডো অপেক্ষা প্রেমের আদর্শ, মহতি রূপই গুরুত্ববহ হয়ে উঠেছে। "অতসী মামী", "নেকী", প্রভৃতি গল্পে নর-নারীর আদিম জৈব প্রবৃত্তির পরিবর্তে প্রেমের সুস্থ, মধুর, সরল রূপকে নির্দেশ করেছেন বস্তুনিষ্ঠ, যুক্তিবাদী, বিজ্ঞানমনস্ক গল্পকার মানিক। আসলে বাস্তববাদী শিল্পীর নিকট রোম্যান্টিকতা সর্বদা নিন্দনীয় নয়। কেননা এ কেবল বস্তু-বিমুখ

অসার কল্পনার জালবোনা নয়, শিল্পীর অন্তর্জগতের একধরনের শক্তিরও উৎস। স্রষ্টার স্বাধীন প্রেরণায় প্রেম সার্থক শিল্পকর্মেরও পরিচয় দেয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর *লেখকের কথা* গ্রন্থে সাহিত্য সমালোচনার প্রসঙ্গে বলেন :

> বস্তুবাদী লেখক অবশ্যই বাস্তবতার রিপোর্টার নন, তিনি শিল্পী–তিনিও কল্পনার রঙে-রসেই তাঁর কাহিনী রূপায়িত করবেন, কিন্তু মিথ্যার সঙ্গে তাঁর কল্পনার কারবার থাকবে না।[৯]

চল্লিশের অন্যতম প্রধান ছোটগাল্পিক সুবোধ ঘোষের গল্পে প্রেমের বহুবর্ণিল চিত্র উদ্ভাসিত হয়েছে। কেননা জীবনকে তিনি অচ্ছেদ্য বন্ধনে সংযুক্ত করেছেন প্রেমের সঙ্গে; জীবনচেতনা আর প্রেমচেতনা প্রায় সমার্থক হয়ে উঠেছে তাঁর গল্পসমূহে। প্রেমের আধারেই তিনি সন্ধান করেছেন জীবনকে; প্রেম-মনস্তত্ত্বের মাধ্যমেই পরিস্ফুটিত হয়েছে তাঁর গল্পের চরিত্রসমূহ। বস্তুত 'নরনারীর প্রেম-মনস্তত্ত্ব ও যৌনতাকে সুবোধ ঘোষ তাঁর কোনো গল্পে শিল্পরূপ দান করেছেন।'[১০] 'এই জাতীয় গল্পে যেমন নারী-পুরুষের বিকৃত মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি প্রেমকে অবলম্বন করে মিষ্টিমধুর লঘু রোমান্স ও উচ্চাদর্শের মহিমাও বর্ণিত হয়েছে।'[১১] আসলে নর-নারীর প্রেম-মনস্তত্ত্বের বহুমাত্রিক পরিচয় রয়েছে সুবোধ ঘোষের গল্পে, তবে যুদ্ধোত্তর সময়ের প্রভাবে আস্থা আর বিশ্বাসের পরিবর্তে সেখানে মুখ্য হয়ে উঠেছে অবিশ্বাস আর সংশয়, বেদনা আর বিচ্ছিন্নতার সুর। নর-নারীর বিশেষত নাগরিক মধ্যবিত্তের প্রেম-মনস্তত্ত্বের স্তরময় জটিলতা আর বহুভুজ টানাপড়েনের প্রান্তর থেকে গৃহীত হয়েছে তাঁর গল্পের মৌল শিল্প-উপাদান। মানুষের বহিরঙ্গের অনুপুঙ্খ বিবরণধর্মী বাস্তবতার পরিবর্তে অন্তর্জীবনের গভীরতর বাস্তবতার সন্ধানে তিনি ছিলেন সতত নিরীক্ষাপ্রবণ। বলা যায় আধুনিক মানুষের চিত্তলোকের অন্তঃস্থ প্রেম-মনস্তাত্ত্বিক অনুভূতি উন্মোচনে সুবোধ ঘোষ বাংলা ছোটগল্পে সংযোজন করেছেন একটি নতুন মাত্রা। বিশিষ্ট সমালোচক নবনীতা চক্রবর্তীর ভাষায় :

> বিভিন্ন বিষয় সুবোধ ঘোষের গল্পের আধার হলেও নর-নারীর প্রেমই তাঁকে সর্বাপেক্ষা অধিক আকর্ষণ করেছিল বলা যেতে পারে। তাঁর অধিকাংশ গল্পের বিষয় এই প্রেমনির্ভর। নর-নারীর প্রেম ও সে সম্পর্কের বিভিন্ন টানাপড়েনে গল্পের স্বাদ কখনও মধুর কখনও অম্লমধুর কখনও বা তিক্তও। প্রেম সম্পর্কের লেখক যেন কতকগুলি ছক তৈরী করে নিয়েছেন। মানুষের মনের সাময়িক আবেগ যে অনন্তের সন্ধান দিতে পারে না এ বিশ্বাস তাঁর গল্পগুলিতে কাজ করেছে।[১২]

নরনারীর প্রেম মনস্তত্ত্বের জগৎ অত্যন্ত জটিল এক আবর্তে ঘূর্ণমান। এ বৃত্তাবর্তে মানবমন অসহায় শিকার মাত্র। একে অস্বীকার করা, অতিক্রম করা এমনকি অনুধাবন করাও দুঃসাধ্য। মনোবিজ্ঞানী এরিক ফ্রম তাঁর সুবিখ্যাত *The Art of loving* গ্রন্থে নরনারীর স্বীয় ব্যক্তিত্বের সামগ্রিক বিকাশের জন্য সযত্নশীলিত সৃজনধর্মী প্রেমচেতনার কথা উচ্চারণ করেন। এই প্রেমের মূল লক্ষ্য মানবপ্রেম ; তাঁর মতে:

> Love is an activity, not a passive affect; it is 'standing in,' not a 'falling for.' In the most general way, the active character of love can be described by stating that love is primarily giving, not receiving. [১৩]

অনেকেই মনে করেন, নর-নারীর প্রেম জন্মগত। ক্ষুধা তৃষ্ণার মতো প্রেমও একটি জৈবিক গুণাবলি। তবে এ ধারণা সর্বৈব ভ্রান্ত। যে সব গুণের জন্য মানুষ পশুজগৎ থেকে স্বতন্ত্র সেগুলো তার সমাজলব্ধ, প্রবৃত্তিগত নয়। স্নেহ-প্রেম-প্রীতি এ সকল মানবীয় গুণ মানুষ সামাজিক জীবনপ্রতিবেশ থেকে গ্রহণ করে। এ বিষয়ে ক্রিস্টোফার কডওয়েল প্রেমের উৎপত্তিগত সামাজিক দিক আলোচনা করতে গিয়ে তাঁর *ইলিউলিশন অ্যান্ড রিয়েলিটি* গ্রন্থে বলেছেন :

> যৌনপ্রেম, বসন্তকাল, সূর্যাস্ত, নাইটিংগেল পাখির গান এবং সুপ্রাচীনকাল থেকে গোলাপের সজীবতা এই সবই সহস্র প্রজন্মের সঞ্চিত আবেগ ও অভিজ্ঞতার জটিল ইতিহাসের দ্বারা সমৃদ্ধ। এই প্রতিক্রিয়ার কোনটাই প্রবৃত্তিগত নয়, তাই কোনটাই ব্যক্তিগত নয়।[১৪]

বস্তুত সৃষ্টির প্রারম্ভিক পর্যায় থেকে পুরুষ নারীর প্রতি, নারী পুরুষের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে আসছে। মস্তিষ্কের উৎকর্ষ বৃদ্ধির সাথে এই আকর্ষণ কেবল শরীরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে নি ; সেটি পরিণত হয়েছে হৃদয়ঘটিত মনস্তাত্ত্বিক প্রকাশেও। সুবোধ ঘোষ তাঁর ছোটগল্পে প্রেম-মনস্তত্ত্বের যে শব্দরূপ নির্মাণ করেছেন তা আধুনিক নর-নারীর পারস্পরিক সম্পর্কসূত্রে গ্রথিত। আধুনিক মানুষের জীবনে প্রেম এসেছে বহুকৌণিকভাবে ; সুবোধ ঘোষ সেটাই চিত্রিত করেছেন তাঁর গল্পে। এ প্রসঙ্গে লেখকপুত্র উত্তম ঘোষের মন্তব্য স্মরণযোগ্য :

> লেখক জীবনের এই আয়ুষ্কালের সপ্তবর্ণের একটি বর্ণ-'প্রেম বৈচিত্র' তার জীবন ব্যাপ্তির শেষ রেশটুকু পর্যন্ত লিখে গেছেন। প্রথম গল্প 'অযান্ত্রিক' এ প্রেম মানুষের সাথে নয়-নিষ্প্রাণ যন্ত্রের সাথে, যে যন্ত্র মানুষের চেয়েও প্রাণবন্ত-ভাঙ্গা টেক্সি 'জগদ্দল'। দ্বিতীয় গল্প 'ফসিল' এতেও মানুষের প্রেম কাহিনী আসেনি। জীবনযাত্রা এবং অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে নিয়ত-রত মানুষের প্রেমানুভূতির জাগরণের সময় কই, সুযোগ কোথায় ? কিন্তু তারপরই সুবোধ ঘোষের রচনায় প্রেমরং ঝিলিক দিয়ে ওঠে, বর্ণচ্ছটায় বিস্তৃতি লাভ করে। এবং সেই প্রেমরথীর রথ চক্রযান যেন দ্রুত লয়ে ধেয়ে আসে, লাগামহীন আবেগ। কিন্তু লাগামহীন কথাটার হয়তো ভুল ব্যাখ্যা হতে পারে। কারণ সুবোধ ঘোষের গল্পে প্রেম বিচিত্রতার মধ্যে যেন 'লাগাম-টানা' লক্ষ করা যায়। আবার এই প্রেমের রং সাতের অনেক বেশি। প্রকৃতপক্ষে কত রকমের সেটা বিচার করা সুকঠিন।[১৫]

প্রেম মানুষকে সুন্দর, মহৎ ও সজীব করলেও এর মধ্যে বিদ্যমান হিংস্রতা, নিষ্ঠুরতা, ছলনা, ঈর্ষা তাকে জটিল করে তোলে। তবে এগুলো ছাড়িয়ে পরিণামে দেখা দেয় এক স্বর্গীয় আনন্দ যা সুবোধ

ঘোষের গল্পে লক্ষণীয়। কিন্তু এ আনন্দের স্বাদ সহজলভ্য নয়, এজন্য তাঁর গল্পের পাত্র-প্রাত্রীকে দিতে হয় অগ্নিপরীক্ষা। সমালোচকের ভাষায় :

> স্বীকার্য, ভালোবাসা আর দাম্পত্য প্রেমনিষ্ঠার সনাতনী আদর্শের আড়ালে কতো যে বিচিত্র চোরাগলি আছে, বাঁকের আড়ালে আছে আঁধার, কুটিলতা আর জটিলতা, তার বিচিত্র রূপ দেখিয়েছেন সুবোধ ঘোষ।[১৬]

উল্লেখ্য, সুবোধ ঘোষের প্রেম-মনস্তত্ত্বকেন্দ্রিক গল্পসমূহে নর-নারীর ঈর্ষা, বিদ্বেষ, দ্বন্দ্ব, অন্তর্যন্ত্রণার চিত্র যেমন অঙ্কিত, তেমনি প্রেমের মধুর উন্মেষ হৃদয় মাতানো সফল পরিণতির ইঙ্গিতও পরিবেশিত। 'মণিমুক্তার মতোই সাহিত্যের পাতায় অনেকটা স্থান জুড়ে আছে তাঁর বিচিত্র ও বিশিষ্ট প্রেমের গল্পগুলি'।[১৭]

"জতুগৃহ" (১৯৪৯) সুবোধ ঘোষের প্রেম-মনস্তত্ত্বনির্ভর প্রশংসিত একটি গল্প। আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হবার পর গল্পটি বিভিন্ন মহলে প্রশংসাধন্য হয়ে ওঠে। বিখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক মৃণাল সেন 'বিশ্বসাহিত্যে 'জতুগৃহ' গল্প একটি অনবদ্য শিল্পকর্ম'[১৮] বলে অভিহিত করেছেন। ফ্ল্যাশব্যাক পদ্ধতি প্রয়োগ করে সুবোধ ঘোষ এ গল্পে মানবহৃদয়ের গহনকোণের রহস্য উন্মোচন করেছেন। গল্পটির নামকরণেই প্রেমের মনস্তাত্ত্বিক স্বরূপ উদঘাটনের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আলোচ্য গল্পে বিবাহ বিচ্ছেদের আধুনিক জটিলতা যেমন চিত্রিত তেমনি বিচ্ছেদপরবর্তী প্রেম-মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম তন্তুজাল অসাধারণ হয়ে উঠেছে। গল্পের নায়ক শতদল, নায়িকা মাধুরী–এক বছরের পরিচয়ে আইনের আশ্রয় নিয়ে রেজিস্টিরি করে শুভ পরিণয়ে আবদ্ধ হয়ে সংসার করেছে দীর্ঘদিন। সাত বছর একত্রে বসবাস করার পর যখন দুজনে অনুধাবন করতে সমর্থ হয়েছে যে তাদের ভালোবাসার বন্ধন শিথিল হয়ে আসছে, তখন স্বেচ্ছায় তারা আইনের আশ্রয় নিয়ে সে দাম্পত্য সম্পর্কের ইতি টেনেছে। আধুনিক উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত, উচ্চবিত্ত সমাজের প্রতিনিধি শতদল ও মাধুরীর চরিত্রের মধ্যে বিদ্যমান সরলতা এবং স্বচ্ছতার কারণেই কোনোরূপ কপটতা কিংবা ছলনার আশ্রয় তারা নেয়নি। কেননা :

> দাম্পত্য জীবনের আদর্শ সম্পর্ক গড়ে ওঠার প্রাথমিক শর্তই হলো বন্ধুত্ব, বিশ্বাস, শ্রদ্ধা ও মতাদর্শগত মিল। যে দম্পতির জীবনে এইসব প্রাথমিক শর্তগুলো অনুপস্থিত সেখানে সম্পর্কের বোঝা টানা অর্থহীন, নীতিহীন এবং সুস্থ মানসিকতার পরিপন্থী।[১৯]

বিচ্ছিন্ন দাম্পত্যে শতদল ও মাধুরীর জীবন সেখানেই স্তিমিত হয়ে থাকেনি, বরং অতীতের স্মৃতিকে তুচ্ছ মনে করে, জীবনকে সুখী সমৃদ্ধ করে গড়ে তোলার অভিপ্রায়ে দুজনেই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। এ দাম্পত্য জীবনেও তারা সুখী। কিন্তু আকস্মিক ঘটনা ঘটে দীর্ঘ পাঁচ বছর দুজনের রাজপুর জংশনের ফার্স্টক্লাস ওয়েটিং রুমে মুখোমুখি দেখা হবার মাধ্যমে। কাকতালীয় দুজনের 'এই

আকস্মিক সাক্ষাৎ যেন একটা বিদ্রূপের ষড়যন্ত্র যেমন অবৈধ তেমনি দুঃসহ'[২০] হয়ে ওঠে। দীর্ঘদিন পর এই অনভিপ্রেত দর্শনে দুজনের মনস্তত্ত্বে পরস্পরের প্রতি আরো গভীর আকর্ষণ অনুভূত হয়েছে। দুজন দুজনের নৈকট্যে থাকার জন্য মন তাদের ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য নিম্নরূপ :

> এই নির্মোহ বাস্তব দৃষ্টিই আধুনিক গল্পের মৌল উপাদান। এখানে পূর্বকার বাংলা গল্পের সমস্ত রোমাণ্টিক প্রেম ব্যাকুলতা লজ্জিত, পরাভূত।[২১]

রাজপুর জংশনের ওয়েটিংরুম দুই অনাত্মীয় নর-নারীর মনের অজান্তে ধীরে ধীরে দম্পতির নিভৃত নীড়ের মতো আবেগময় হয়ে ওঠে, অনুধাবন করতে সক্ষম হলেও কেউ আর ঘটনাকে বাধা দিতে পারে না। শতদলের পাশের চেয়ারে আসন গ্রহণ করে মাধুরী, শতদল তার হাত স্পর্শ করে, তাতে মাধুরী স্বস্তিবোধ করে :

> প্রণয়কুঞ্জ নয়, বাসরকক্ষ নয়, দম্পতির গৃহনিভৃত নয়, রাজপুর জংশনের ওয়েটিং রুম। তবু শতদল আর মাধুরী, দুই ট্রেনযাত্রী বসে থাকে পাশাপাশি, যেন এইভাবে তারা চিরকালের সংসারে সহযাত্রী হয়ে আছে, কোনদিন বিচ্ছিন্ন হয়নি।[২২]

আবেগে আপ্লুত শতদল মাধুরীকে বলেছে, সে মাধুরীকে ভোলেনি, ভোলা যায় না। কেবল তাই নয়, মাধুরীর মনের অব্যক্ত কথাও সে অনুধাবন করতে সমর্থ হয়। কিন্তু বাস্তবতাকে তারা কেউই অস্বীকার করতে পারে না ; তাই সাময়িক প্রেম ও পূর্ব রঙিন স্মৃতি জেগে উঠলেও তা স্থায়িত্ব রূপ লাভ করেনি। কারণ পরমুহূর্তে মাধুরীর বর্তমান স্বামী অনাদি রায়ের আগমন ঘটে সেখানে। 'মাধুরী ও অনাদি রায়ের দাম্পত্য সম্পর্কের অনুরাগ জড়ানো অনুভবের পরিচয়টি ছোট ছোট কয়েকটি ঘটনার মধ্যে দিয়ে অল্পক্ষণের মধ্যেই ধরা পড়ে শতদলের কাছে।'[২৩] 'এক ভগ্নবাহু প্রতিদ্বন্দ্বীর মত সকল পরাভবের দীনতা নিয়ে অসহায়ভাবে তাকিয়ে থাকে শতদল। সহ্য করতে কষ্ট হয়।'[২৪] লেখক অত্যন্ত কৌশলে শতদলের বর্তমান মানসিক অবস্থা নির্দেশে চমৎকার এই উপমাবহুল বাক্য ব্যবহার করেছেন যা প্রেম-মনস্তত্ত্বের পরিচয়বাহী। রচনাকৌশলে গল্পটি উপভোগ্য নিঃসন্দেহে তবে প্রেম-মনস্তত্ত্বের যে চিত্র এতে আভাসিত তা সর্বপ্রকার জটিলতা থেকে মুক্ত।

"জতুগৃহ" গল্পের সম্পূর্ণ বিপরীত সমস্যা নিয়ে রচিত সুবোধ ঘোষের "অচিরন্তন" (১৯৫২) গল্পেও নর-নারীর প্রেম-মনস্তত্ত্বের চিত্র লক্ষণীয়। এ গল্পেও পরিবেশ রচনায় এসেছে রেলওয়ে স্টেশন, প্লাটফর্ম আর রেল অফিসারের বাংলো। শতদল আর মাধুরীর মতো এ গল্পেও এসেছে দুজন নর-নারী-সুলেখা সরকার আর বিজন বসু। তবে শতদল-মাধুরীর মতো এরা স্বামী-স্ত্রী নয়। সম্পূর্ণ

অপরিচিত দুই মানুষের ক্ষণিকের জন্য কাছে আসার এক অপূর্ব প্রেম মনস্তাত্ত্বিক চিত্র গল্পে সন্নিবেশিত হয়েছে। গল্পে সুলেখা সরকার স্বামী নির্মলেন্দুর কাছে যাবে বলে ট্রেনে উঠলেও বিটপুর স্টেশনে এসে সে ট্রেন থেমে গেছে। একইভাবে বিজন বসুও স্ত্রী অণিমার কাছে যাবে বলে একই ট্রেনের যাত্রী হয়েছে। কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে তারা পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়েছে কারণ আগস্ট আন্দোলনকারীরা 'করঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' শুরু করে দিয়েছে। এর ফলে তারা উপড়ে ফেলেছে রেললাইন। এমতাবস্থায় জানা যায় দুদিনের আগে রেললাইন মেরামত সম্ভব নয়। এদিকে সুলেখা এবং বিজন দুজনেই তাদের প্রেমাস্পদের জন্য ব্যাকুল ও উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠে। তাদের মানসিক বিপর্যস্ততার চিত্র এরূপ :

> কলকাতাতে একটা টেলিগ্রাম করা যাবে কি ? দু'চোখ ভরা আতঙ্ক নিয়ে দেখতে থাকে সুলেখা সরকার, টেলিগ্রাফ লাইনের খুটিগুলোকেও উপড়ে তুলে নিয়ে এদিক ওদিক ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে। তারের চিহ্নও নেই, আরও মনে পড়ে, সে-বেচারা শিয়ালদহ স্টেশনে এসে হতাশ হয়ে বাড়ি ফিরে যাবে আর দুশ্চিন্তায় পড়বে। একই উদ্বেগ আর একই প্রশ্নে ছটফট করে বিজন বসুর মন। চিঠি পেয়েছে অণিমা। রবিরা রাত্রি দশটার মধ্যে বিজনের বাড়ি পৌঁছে যাবার কথা। অণিমা বেচারী না খেয়ে অপেক্ষা করবে, তারপর রাগ করে খাবেই না, তারপর দুশ্চিন্তা শুরু করবে, আর সারা রাত জেগে ভোর করে দেবে।[২৫]

এরকম উৎকণ্ঠা আর দুশ্চিন্তায় যখন সুলেখা আর বিজন তাদের কাঙ্ক্ষিত প্রিয় মানুষের মানসিক অবস্থার কথা ভাবছে ঠিক তখন তাদের দুরবস্থার পরিমাণ গেছে বেড়ে। কোথায় যাবে, কোথায় রাত কাটাবে ভেবে দুটি নরনারী যখন অসহায় হয়ে পড়েছে তখন তাদের উদ্ধার করেছে বাঙালি স্টেশন মাস্টার। তবে স্টেশন মাস্টারের কথামতো স্বামী স্ত্রীর পরিচয়ে থাকতে পারলে স্থানীয় একবালপুরের বাংলোবাড়ি পাওয়া যাবে। গোয়েন্দা পুলিশের নানা ঝামেলা উপেক্ষা করে অবশেষে বাংলো পেয়ে যায় তারা। দুই ভিন্ন দাম্পত্যের একজোড়া নরনারী প্রায় স্বামী-স্ত্রীর ন্যায় বসবাস করতে থাকে সেখানে। কিন্তু পদে পদে তারা অস্বস্তিতে আর নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। অবিশ্বাস, লজ্জা, সংকোচ পরিহার করে দুটি ভিন্ন লিঙ্গের অসহায় মানুষ পরস্পরের প্রতি নির্ভরশীল ও সহানুভূতিপূর্ণ হয়ে ওঠে খানিকটা। সমাজতত্ত্ববিদ রবার্ট ব্যারন ও ডন বিরনের মতে :

> আমাদের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল সম্পর্ক তৈরি করা। সম্পর্কই মানুষকে নিঃসঙ্গতা থেকে মুক্তি দেয়। তাকে সমাজেরই একজন বলে মনে করতে শেখায়। তার জীবনকে পুত্র-পুষ্প-পল্লবে ভরিয়ে তোলে। সুখ ও সাফল্যের চাবিকাঠিগুলি হল অপরের সহযোগিতা, প্রেম, ভালোবাসা, স্নেহ, মমতা, শ্রদ্ধা।[২৬]

ক্ষণিকের পরিচয়ে তৈরি হওয়া এই সম্পর্ক হয়তো সমাজ সমর্থিত নয়, কিন্তু তারা দুজনেই অবস্থার শিকার। সমাজকে সাময়িক ভুলে গিয়ে তাই তারা দুজন দুজনের কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে। বিজনের আলোয়ান নেই বলে সুলেখা তার আলোয়ান তাকে দিয়ে শীত নিবারণ করেছে। কিন্তু ঠাণ্ডা

লেগে গেছে সুলেখার। দুটি অপরিচিত নরনারী এক ঘরে শীতার্ত রাত্রি যাপন করেছে। লেখক শব ব্যবচ্ছেদ করেছেন দুটি মনের যা অসাধারণ প্রেম-মনস্তত্ত্বের দিক নির্দেশক :

> কে জানে কত রাত হলো? ভোর হতে আর কতক্ষণ? মেঝের উপর টান হয়ে শুয়ে রয়েছেন ভদ্রলোক। মাঝে মাঝে মাঝে ঠাণ্ডা হাওয়ায় শিউরে কুঁকড়ে যাচ্ছে ভদ্রলোকের ঘুমন্ত শরীরটা।
>
> কী বিশ্রী অস্বস্তি ! সুলেখার ভিতর থেকে যেন সব নিশ্চিন্ত নিঃশ্বাসের বাতাস ঠেলে উপরে উঠতে চাইছে একটা বিপদ। থরথর করে কেঁপে ওঠে সুলেখার হাতটা। ঘুমিয়ে আছেন ভদ্রলোক। কিছুই বুঝতে পারবেন না। আলোয়ানটা তুলে নিয়ে ভদ্রলোকের গায়ে ঢাকা দিলে কেমন হয় ? আলোয়ানটা হাতে তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়ায় সুলেখা। কিন্তু এক পা এগিয়ে গিয়েই থমকে দাঁড়ায়। পরমুহূর্তে পিছিয়ে আসে। ছটফট করে ক্যাম্প খাটের উপর বসে সুলেখা। আলোয়ানটাকে তেমনি ব্যস্তভাবে খাটেরই এক দিকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। চুর করে লেস বোনে আর কাকের ডাক শোনবার জন্য কান পেতে বসে থাকে সুলেখা।[২৭]

অন্যদিকে বিজনের মানসিক অবস্থার চিত্র নিম্নরূপ:

> কাকের ডাক ডেকেছে অনেকক্ষণ। বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে বিজন। এবং এই ঘরের ভিতরই একটা ঘুমন্ত মূর্তির দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছে। ঘুমিয়ে পড়েছেন মহিলা, যিনি বলেছিলেন যে তার চোখে ঘুম সহজে আসে না। সহজে কি এসেছে ? ভয়ে লজ্জায় ও উদ্বেগে আধমরা হয়ে, আধপেটা খেয়ে আর লেস বুনে বুনে ক্লান্ত হয়েছে মানুষটা, তবেই না ঘুমে ঢুলে পড়েছে। ভাবতে লজ্জা পায় বিজন, ওই মহিলাকেই কাল রাতে কত না ভয় করতে হয়েছিল। লেসের বোনা বুকের উপর তুলে আর দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে বাঁধা বেডিং এ মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছেন মহিলা। কানের একটা দুল খুলে গিয়েছে। মনে হয় ঘুমের ঘোরে চাপাপড়া খোঁপাটাকে এলোমেলো করে দিয়েছেন মহিলা, নইলে একগাদা চুল মহিলার মুখের উপর এভাবে লুটিয়ে পড়বে কেন ?
>
> একটা অস্বস্তি। অস্বস্তিটা যেন অদ্ভুত একটা মায়ার জ্বালায় ছটফট করছে। মহিলার সুন্দর মুখটার উপর যেন কালো সাপের মতো একটা উপদ্রব কিলবিল করছে, ওই এলোমেলো হয়ে লুটিয়ে পড়া কতকগুলি চুলের গুচ্ছ। জানবে না, বুঝতেও পারবে না মানুষটা, ওর মুখের উপর থেকে ওই লুটিয়ে পড়া এলোমেলো উপদ্রবগুলিকে সরিয়ে দিলে কেমন হয় ?
>
> পা টিপে টিপে আস্তে আস্তে এগিয়ে আসে বিজন। ছিঃ, সেই মুহূর্তে নিজের হাতটার এই বেহায়া দুঃসাহসের লজ্জায় শিউরে উঠে সরে যায়। মনটা উত্তপ্ত হয়ে যেন ধিক্কার দিতে থাকে। ভুল করে আজ নিজেই নিজের বিপদ হয়ে উঠেছে বিজন। সেই মুহূর্তে দরজা খুলে ঘরের বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়ায়।[২৮]

তারপর রাতের অবসানের সাথে সাথে তাদের গন্তব্যে ফিরে যাবার সময় এসে উপস্থিত হয়। পুনরায় ট্রেন এলে একজন ওঠে মহিলা কামরায় অন্যজন অন্য কামরায়। বস্তুত 'জতুগৃহতে সুবোধ ঘোষ যে এক্সপেরিমেন্ট করেছিলেন ঠিক তার বিপরীত পরীক্ষা রয়েছে এ গল্পে।'[২৯] প্রথম গল্পে অর্থাৎ "জতুগৃহ" তে যেমন আগুন লাগেনি শেষ পর্যন্ত, এখানেও তেমনি 'সব বিপদ কেটে গিয়েছে। কোন

বিপদের সামান্য আঁচড়ও পড়েনি দুজনের জীবনে।'[৩০] স্বীকার্য, কোনো বিপদই তাদেরকে স্পর্শ করেনি ঠিকই, তবে সমস্ত অবিশ্বাস, সন্দেহ আর দ্বিধা-দ্বন্দ্বের কুয়াশা কেটে গিয়ে দুটি ভিন্ন বিবাহিত নরনারী এক স্নিগ্ধ প্রেম-মনস্তত্ত্বের আলোয় ঝলমল করে উঠেছে। তাদের ক্ষণিক প্রেমের মনস্তাত্ত্বিক রূপ গল্পের শেষে মাত্র দুটি সংলাপে সেতারের সুরের মতোই ঝংকৃত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে :

> বিজন বলে, "জানলা থেকে সরে বস, আর মাফলারটা ভালো করে গলায় জড়িয়ে নাও।"
> সুলেখা বলে, "হাতের ব্যথাটাকে তুচ্ছ করো না। বাড়িতে পৌঁছেই গরম জলের সেঁক দিয়ো ---।"[৩১]

সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুর আলোচ্য গল্পদুটোর প্রেম-মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে লেখক অসাধারণ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। সমালোচক যথার্থই বলেছেন :

> এই হলো লেখক সুবোধ ঘোষের আসল পরিচয় । মানবীয় মূল্যবোধের প্রেরণায় একটি গল্পে দাম্পত্যের তথা সমাজ-সংসারের স্থিতিশীলতা রক্ষা করলেন। দেখালেন দাম্পত্যের 'থিসিস।' একই প্রেরণায় পরের গল্পটিতে সমাজ সংসারের স্থবিরতা ভেঙে চুরমার করে দিলেন। প্রতিষ্ঠিত করলেন দাম্পত্যের 'অ্যান্টিথিসিস'। দুটি গল্পেই দাম্পত্যপ্রেমের 'থিসিস' 'অ্যান্টিথিসিসে'র দ্বন্দ্ব দেখিয়ে নিরসনের পথও বাৎলে দিলেন। এখানেই সুবোধ ঘোষ ঘোরতর রূপে আধুনিক সমাজসচেতন লেখক।[৩২]

প্রেমের সামাজিক দায়বদ্ধতা ও মনস্তত্ত্বের অপূর্ব সম্মিলন ঘটেছে *শুক্লাভিসার* (১৯৪৪) গল্পগ্রন্থের নামগল্পে। 'বিধবা-প্রেমের অনবদ্য স্বীকৃতিতে 'শুক্লাভিসার' (১৯৪৪) গল্পটি শ্রেষ্ঠ, তেমনই 'মনুষ্যত্ব, মহত্ত্ব ও মরালিটির গল্প'।[৩৩] মূলত 'পটভূমি ও ঘটনার ব্যাপ্তিকে লেখক প্লট ও ভাষার সংহতি ও সামঞ্জস্যে এগল্পে যেভাবে রূপায়িত করেছেন তাতে ছোটগল্পের অভিনবত্ব নিঃসন্দেহে অসামান্য মাত্রা পেয়েছে।'[৩৪] গল্পের আখ্যানভাগে কোথাও শিথিলতা নেই, লেখক ঘটনা ও চরিত্রের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ এবং পরিবর্তনকে ইঙ্গিত ও ব্যঞ্জনার সূক্ষ্ম প্রয়োগে প্রকাশ করেছেন। গল্পের প্রধান নারী চরিত্র এক বাংলাদেশী বিধবা নারী বরুত্রীর হৃদয়ের দ্বন্দ্ব জটিল মনস্তত্ত্বনির্ভর না হলেও লেখকের চরিত্র রূপায়ণের নৈপুণ্যকেই তুলে ধরে। জীবনের ব্যাপক পটভূমিতে এক গভীরতম সত্যকে আলোচ্য গল্পে উদঘাটন করেছেন সুবোধ ঘোষ। গান্ধীবাদী আদর্শে বিশ্বাসী মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ দেবল ত্রিপাঠী চাকরির সন্ধানে বোম্বাইতে আসা বাংলাদেশের অল্পবয়সী বিধবা বরুত্রীকে হরিজন স্কুলের শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করেছে। ত্রিপাঠীর প্রতি শ্রদ্ধায় ও সহমর্মিতায় বরুত্রীর নারীহৃদয় ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে উঠলেও ছদ্মবেশী প্রেমিক ঘোরতর বাঙালি পুষ্করকে সে মনেপ্রাণে ভালোবাসে। দেবল মেনে নিয়েছে এ সম্পর্ক। কেবল তাই নয়, সে চেয়েছে ওরা বিয়ে করুক। পুষ্কর মিলিটারী অফিসে চাকরি পেয়ে আলমোড়ার বাংলা বাড়িতে অবস্থান করেছে। তার আহ্বান সর্বগ্রাসী। আদর্শচ্যুত হয়ে বরুত্রী হরিজন স্কুলের চাকরি ছেড়ে সর্বগ্রাসী আহ্বায়কের কাছে যেতে চায়নি। আবার পুষ্করকে ফেরাতেও পারেনি সে। পুষ্করকে বোঝার মধ্যে যে ভীষণ ফাঁকি ছিল বরুত্রীর তার চরমমূল্য দিতে হয়েছে তাকে। কেননা দুর্বল বরুত্রীর

মনে পুষ্কর কেবল ভালোবাসা জাগিয়েছে তাই নয়, তার গর্ভে ভালোবাসার বীজও বপন করে দিয়েছে সে। যদিও বাস্তবতার মুখোমুখি হতেই পুষ্কর বরুত্রীর জীবন থেকে অন্তর্হিত হয়। অন্যদিকে 'পুষ্কর মিত্রও উঁচু থেকে নীচে নামার চেষ্টা করেছে। কিন্তু মধ্যবিত্ত চরিত্র অতিক্রম করতে পারে নি।'[৩৫] বরুত্রীর নারীহৃদয়ে পুষ্করের প্রতি তীব্র অভিমান অনুভূত হলে ত্রিপাঠী এগিয়ে আসে। ক্ষণিকের প্রেমকে মূল্য দিতে গিয়ে বরুত্রী ত্রিপাঠীর আদর্শ প্রেমকে যে বুঝতে পারেনি তার অনুশোচনায় সে কষ্ট পেয়েছে। মহাপুরুষ নয়, মানুষ হিসেবে ত্রিপাঠীর এক নতুন পরিচয় সে আবিষ্কার করতে সমর্থ হয়েছে। প্রকৃত প্রেম-মনস্তত্ত্বের এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত যেন সূচিত হয়েছে গল্পের শেষাংশে নিম্নোক্ত দুজনের কথোপকথনের মাধ্যমে :

> উতলা আকাঙ্ক্ষার দুটি পুরুষবাহু বরুত্রীকে চকিতে বুকের উপর টেনে নিয়ে সাপটে ধরলো। বরুত্রী যেন আনন্দে ফুঁপিয়ে উঠলো–এ কী করছো, দেবল ?
>
> ত্রিপাঠী–তোমাদের দুজনকে চুমো খাচ্ছি।
>
> হেঁয়ালির মত শোনালো। বরুত্রী জিজ্ঞেস করলো দুজনকে ? তার মানে? শীগগির বল দেবল, আমার ভয় করছে।
>
> ত্রিপাঠী–হ্যাঁ, দুজনকে, তোমাকে আর ---
>
> বরুত্রী–আর কাকে ?
>
> ত্রিপাঠী–আমার ছেলেকে ।[৩৬]

এখানে ত্রিপাঠীর একনিষ্ঠ প্রেম সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বধর্মী হয়ে আত্মপ্রকাশ লাভ করেছে। সমালোচকের মতে:

> পবিত্র প্রেম অতি উৎকৃষ্ট বস্তু। কিন্তু সে প্রেম যদি মানুষকে সমাজ ভুলাইয়া দেয়, তাহা অতিশয় অপকৃষ্ট হইয়া পড়ে। এই কথার অর্থ এই যে, প্রণয়ের পবিত্রতা বা অপবিত্রতা শুধু প্রণয়ী বা প্রণয়িনীর নিজের মনের পবিত্রতা বা অপবিত্রতা দ্বারা নিরূপিত হয় না। সমাজও তাহার একটি প্রধান নিরুপক।[৩৭]

মূলত বরুত্রী-ত্রিপাঠীর নিরুচ্চারিক, নৈঃশব্দিক প্রেম-মনস্তত্ত্ব গল্পকে কখনোই তত্ত্বকেন্দ্রিক করে তোলেনি বরং শেষ পর্যন্ত এই প্রেমের বিজয়গাথার শুভ পরিণতি ঘটেছে। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন :

> সুবোধ ঘোষের গল্পে প্রেম আসে নিঃশব্দ চরণপাতে, শিউলিফুলের মতো, জ্যোৎস্নার মতো, ভোরের মতো। বরুত্রীর প্রতি ত্রিপাঠীর ভালোবাসা সেভাবেই এসেছে।[৩৮]

প্রেমের বিচিত্র জটিল মনস্তাত্ত্বিক রূপায়ণ লক্ষণীয় "হঠাৎ গোধূলি" (১৯৫১) ও "স্বস্ত্যয়ন" (১৯৫৫) গল্পে। "হঠাৎ গোধুলি" গল্পে দাম্পত্যের আত্মপ্রসাদ মেটাতে প্রশান্ত তার স্ত্রী অলকাকে বন্ধু শঙ্করের নিকট মিথ্যা প্রেমের অভিনয় করতে প্ররোচিত করেছে। আর এই অভিনয়ের ছিদ্র পথেই এসে গেছে

সত্যিকারের আন্তরিকতার সুর। মানবমনের এই জটিল আবর্তই উদঘাটিত হয়েছে এ গল্পে। শঙ্করের কুৎসিত চেহারা এবং অসহায় দারিদ্র্য নিয়ে কটাক্ষ করতে গিয়ে অলকার অবচেতন মনের অতল থেকে উঠে এসেছে একটুখানি প্রেমের সুর যা হঠাৎ গোধূলির এক ঝলক আলোর মতোই। প্রশান্তর শিখিয়ে দেয়া থিয়েটারী ঢং এর পরিবর্তে অলকার আচরণ ও সংলাপ 'একটা রাত্রি-শেষের চাঁদ হয়ে যেন একটা জঙ্গলের মাথার উপর সান্ত্বনার জ্যোৎস্না'[৩৯] হয়ে ঝরে পড়েছে। এভাবেই সুবোধ ঘোষ প্রেম-মনস্তত্ত্বের চিত্র অঙ্কন করেছেন। সমালোচকের মতে :

> স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে নানা ধরনের বন্ধুত্ব গড়ে উঠতে পারে। অনেক সময় মতাদর্শগত মিল থেকে, উভয়ের প্রতি উভয়ের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস থেকে গড়ে উঠতে পারে মধুর বন্ধুত্বের সম্পর্ক–যেখানে দেহ-মিলন বন্ধুত্বকে আরও সমৃদ্ধতর, দৃঢ়বদ্ধ করতেই পারে। এ মিলন স্বত্বাধিকার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নয়, নারী ও পুরুষের পারস্পরিক শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও বন্ধুত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত।[৪০]

আলোচ্য গল্পে অলকার মনোলোকে শঙ্করের প্রতি যে প্রেমানুভব জাগ্রত হয়েছে তা সেই পারস্পরিক শ্রদ্ধা, বিশ্বাস আর বন্ধুত্বের নিরিখেই সম্ভবপর হয়ে উঠেছে। এভাবেই লেখক অলকার প্রেমের আত্মশ্লাঘার প্রায়শ্চিত্ত করিয়েছেন।

"হঠাৎ গোধূলি"র ন্যায় একটু ভিন্নরকম সমস্যার প্রায় একই সমাধান এসেছে "স্বস্ত্যয়ন" শীর্ষক গল্পে। 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকায় প্রকাশিত আলোচ্য গল্পের নায়িকা রেবার মামা সুখময় চৌধুরী সুন্দরী রেবার সঙ্গে বিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে রতন গাঙ্গুলীর কাছ থেকে বহু টাকা গ্রহণ করেছে। কপট, প্রতারক সুখময় এক অনুকূল পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে ধর্ষণের অভিযোগে রতন গাঙ্গুলীকে তুলে দিয়েছে পুলিশের হাতে। কেবল তাই নয়, রেবার নাম পরিবর্তন করে স্বস্তিকা নামে তার বিয়ে দিয়েছে পাঞ্জাব প্রবাসী ধনাঢ্য ব্যক্তি এন চক্রবর্তীর সঙ্গে। দাম্পত্যজীবনে সুখী এই দম্পতির জীবনে আকস্মিক আবির্ভাব ঘটে সেই রতন গাঙ্গুলীর। পরেশনাথ পাহাড়ে বেড়াতে এসে সেখানকার একটি বাংলো বাড়িতে রেবার সঙ্গে রতনের আচমকা দেখা হয়ে যায়। এদিকে এন, চক্রবর্তী গিয়েছেন বন্ধুর বিয়েতে, ফিরতে রাত হবে। বাংলো বাড়ির একটি ঘরে রেবা নামের স্বস্তিকা, পাশের ঘরে একদা তারই প্রণয়প্রার্থী। মিথ্যে অভিযোগে যার জীবনের একটি অধ্যায় বিনষ্ট হয়ে গেছে। ফলে সৃষ্টি হয়েছে উত্তেজনাময় এক নাটকীয় পরিবেশ। প্রতি মুহূর্তে রেবাকে বিদ্ধ করেছে আত্মগ্লানি, আত্মধিক্কার এবং এক দুঃসহ পরিণাম সহ্য করবার মানসিকতা। যে মিথ্যে ধর্ষণের অভিযোগে যাকে একদিন কারাবরণ করতে হয়েছিল তার জীবনে আজ এসেছে সত্যিকারের ধর্ষণের সুযোগ। পাশের ঘরে এক একটা শব্দ হয় আর রেবা নিজেকে প্রস্তুত করে। আত্মদানের জন্য উন্মুখ হয়ে রয়েছে সে। এই ভয়ঙ্কর মুহূর্তে রেবার মনের অবস্থা তারই চিন্তাস্রোত থেকে তুলে ধরা হলো :

> সারা পৃথিবীর মধ্যে এমন একটি নির্জনতা কি আর কোথাও আছে ? কোটি কোটি লোকচক্ষুর নাগাল থেকে ছিন্ন করা এমন একটি নিভৃত ? বুঝতে পেরেছে রেবা। শুধু রেবার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেই ত সুখী হবে না ওই অভিমানের মন। হতে পারে না। ওর চোখে যে বড় দুরন্ত একটি পিপাসা ছিল। এসেই যদি হাত ধরে ? যদি আদর করে আস্তে আস্তে বুকের কাছে টেনে নেয় ? যদি রেবার এই সাজানো দেহের উপর সব পিপাসা ঢেলে দেয় রতন ? ছটফট করে একটা হাত তুলে কপাল টিপে ধরে রেবা। রেবাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে সবচেয়ে বেশী সুখী হবার সবচেয়ে বেশী অধিকার যে ওরই ছিল। ------
> আসতে বড় দেরি করছে। আসে না কেন রতন ? রেবাকে আদর করবার আর ইচ্ছামত সুখী হবার এমন অবাধ সুযোগ আর কবে পাবে রতন ? রেবার বিহ্বল চোখের প্রতীক্ষার মধ্যে বেশ একটু অভিমানের ছায়াও ফুটে ওঠে।[৪১]

এরপর রেবা উন্মত্তের মতো পাশের ঘরে এসে দেখেছে রতন গাঙ্গুলী বাংলো ছেড়ে চলে গেছে। রেবার বর্তমান মানসিক চিত্র এঁকেছেন লেখক তারই সরল জবানবন্দীতে :

> কী ভয়ংকর মানুষ ! কী ভয়ানক প্রতিশোধ নিতে জানে লোকটা ! রেবার বুকের গভীর থেকে উথলে-পড়া উৎসের মতো এতবড় ইচ্ছাটাকে যেন থেঁতলে দিয়ে, আছাড় মেরে আর চূর্ণ করে পালিয়ে গেল লোকটা। আজ ওর কপালে বোতল ছুড়ে মারবার কেউ নেই। পুলিশ নেই, হাজত নেই, জেল নেই।[৪২]

অপরাধের পরিণাম পাশের ঘরে বসিয়ে রেখে অপরাধী মনের সমস্ত স্বীকারোক্তি একে একে রেবার কাছ থেকে আদায় করিয়ে নিয়েছেন লেখক। কেবল তাই নয়, ধীরে ধীরে রেবার পূর্ব প্রণয়ীর প্রতি জাগিয়েছেন প্রেম। ফলে রেবার মনের আমূল পরিবর্তন গল্পে যথাযথভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। তাই রেবার বানিয়ে তোলা ধর্ষিতা চেহারা দেখে এন. চক্রবর্তী যখন বলেছে 'মনে হচ্ছে যেন একটা বাঘে তোমাকে খেয়ে চলে গিয়েছে'[৪৩] তখন স্বস্তিকা নামের রেবা উত্তর দিয়েছে–'খেয়ে গেল আর কোথায় ? খেলে তো ভালই হত।'[৪৪] এই স্বীকারোক্তিই রেবার স্বস্ত্যয়ন। এই মনস্তাত্ত্বিক শাস্তিই রেবাকে পূর্ব প্রণয়ীর প্রতি প্রেমময়ী করে তুলেছে। প্রেম মনস্তত্ত্বের এমন ব্যতিক্রম দৃষ্টান্ত সুবোধ ঘোষের গল্পে প্রায় দুর্লভ বলা যায়।

সুবোধ ঘোষ নর-নারীর প্রেম-মনস্তত্ত্বের সার্থক চিত্র উন্মোচন করেছেন "থির বিজুরী" (১৯৪৬) ও "চোখ গেল" (১৯৫৪) শীর্ষক গল্পদ্বয়ে। দুটো গল্পই লেখকের *থির বিজুরী* (১৯৫৫) গল্পসংকলনে অন্তর্ভুক্ত। প্রথম গল্পটিতে দাম্পত্য প্রেম-মনস্তত্ত্বের চতুর্মাত্রিক সমস্যা চিত্রিত হলেও পরের গল্পটি ত্রিমুখী প্রেম-মনস্তত্ত্বের জটিলতাকে ঘিরে আবর্তিত। "থির বিজুরী" গল্পের অপূর্ব সুন্দরী এবং সুগায়িকা চিত্রা রায়ের স্বামী কয়লা খনির হেডক্লার্ক নিখিলের সঙ্গে তার দাম্পত্যজীবন সুখকর নয়। কারণ সে বড়সাহেব বিনায়ক সরকারের প্রণয়প্রার্থিনী। বিবাহিত বিনায়কও চিত্রাকে তার অন্তরের

পরম পূজনীয় প্রার্থী হিসেবে কামনা করে। কিন্তু স্ত্রী মৃদুলার ভয়ে চিত্রাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিতে সে ব্যর্থ হয় বারবার। দাম্পত্যজীবনের এই চতুর্মাত্রিক প্রেম-মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব সুবোধ ঘোষ অত্যন্ত সচেতনতার সঙ্গে গল্পে উপস্থাপন করেছেন। বিশেষত বিবাহোত্তর প্রেম এবং সে-প্রেমে যৌনতা তথা দেহচেতনার তীব্র আকাঙ্ক্ষার কারণে এ সকল চরিত্র নিপতিত হয়েছে জটিল জীবনাবর্তে। একদিকে সনাতন মূল্যবোধ, পারিবারিক স্নেহ-সান্নিধ্য ও ভারতীয় জীবনপ্রত্যয়; অন্যদিকে রোমান্টিক জীবনাবেগ, কাম প্রবণতা ও ইন্দ্রিয়বিলাস–এই দুই বিপ্রতীপের দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে চিত্রা রায়, নিখিল রায় ও বিনায়ক সরকার। গল্পে স্বামী নিখিল অপেক্ষা উচ্চবিত্ত বিনায়ক সরকারকে চিত্রা কামনা করেছে তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার প্রত্যয়ে। দাম্পত্যজীবনে এই প্রেম-মনস্তত্ত্বের রূপ কখনোই সফল পরিণতি নির্দেশ করে না। তবুও মানুষ এই জটিল মনস্তত্ত্বকে ধারণ করে জীবন পরিচালনায় অগ্রসর হয়। সমালোচক পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেছেন :

> প্রেমের প্রথম পর্ব পূর্বরাগ। পূর্বরাগ প্রেমের প্রথম লক্ষণ। প্রেমের কোনো বয়স নেই। বিবাহিত নরনারীও অন্য বিবাহিতের প্রেমে পড়েন এবং আগের বিবাহ বন্ধন ছেদ করে নতুন বিবাহ বন্ধনে বাধা পড়েন। আবার বিবাহিত জীবন যাপন করেও বহু নারী-পুরুষ গোপনে অন্য পুরুষ ও নারীর প্রতি প্রেমাসক্ত হয়। যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে। অনেক বিশিষ্ট ও প্রতিভাশালী ব্যক্তিও এইভাবে বিবাহ অতিরিক্ত সম্পর্ক তৈরি করেন। এই সম্পর্ক এত ব্যাপক যে একে Another woman syndrome বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে।[৪৫]

বিবাহিত বিধায়ক সরকারের পরস্ত্রীর প্রতি যে প্রেমানুভব গল্পে লেখক তুলে ধরেছেন তা 'Another woman syndrome' বলা যেতে পারে। অন্যদিকে স্ত্রীর এরূপ আচরণে মর্মাহত নিখিলের নির্লিপ্ততা চিত্রাকে তার স্বামীর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনে সহায়তা করেছে। আসলে 'নিখিল চরিত্রের অন্তর্নিহিত শক্তিই শেষপর্যন্ত চিত্রার ভুল ভেঙে তাকে স্বক্ষেত্রে ফিরিয়ে এনেছে'।[৪৬] প্রেম-মনস্তত্ত্বের এমন সার্থক রূপায়ণ গল্পটিকে অনবদ্য করে তুলেছে। মূলত 'সুবোধ ঘোষের গল্পে প্রেম এসে যাবতীয় অপ্রেম থেকে মুক্ত করেছে দাম্পত্যকে। কি অনিবার্য ছিল ভাঙন অথচ ভাঙল না। সেই তো প্রেমের আসল অমোঘ প্রয়োগ'।[৪৭] গল্পে চিত্রা ও বিনায়ক সরকারের প্রেম-মনস্তাত্ত্বিক অনুভূতি প্রকাশের শরীরীচেতনার উপস্থিতি ঘটলেও তা কখনোই স্থুল দেহসর্বস্বতায় বিপথগামী হয়নি।

প্রেমের পূর্বরাগ বলে যা কথিত তা আসলে নিছক কামনারই নামান্তর। মানুষের যৌনকামনার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কের যোগ আছে এবং এ পথে প্রেমের সঞ্চারও হয়। তবু যৌনতা অর্থই প্রেম নয়। প্রেমের জন্ম ভাবলোকে। সভ্য মানুষের জীবন ধারণের একটি অনন্য বোধ হলো প্রেম। মূলত 'পরস্পরকে যখন সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে আকর্ষণ করে তখনই সেটি প্রেম। শুধু দেহ নয়, শুধু মনও নয়, প্রেম পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাধন।'[৪৮] তাই প্রেম কোনো প্রবৃত্তি নয়, মননক্রিয়ারই একটি অঙ্গ।

মানবতাবাদীদের কাছে প্রেম একটি সুকুমার উপলব্ধি। প্রবৃত্তির কারাগার থেকে তাকে মুক্ত করতে হয়। এরকম একটি অনন্যসাধারণ প্রেম মনস্তাত্ত্বিক গল্প "চোখ গেল"। শারদীয় দেশ সংখ্যায় প্রকাশিত আলোচ্য গল্পে ত্রিমুখী প্রেম-মনস্তত্ত্বের জটিলতা উপস্থাপিত হয়েছে। গল্পের নায়িকা অপরাজিতা দুটি পুরুষকে ভালোবাসে। একজন কিংশুক অপরজন হিরন্ময়। কিংশুক বিবাহিত কিন্তু স্ত্রীর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। হিরন্ময় অবিবাহিত। কিন্তু তার চোখ দুটো পাথরের। আর কিংশুকের চোখদুটো খুবই সুন্দর। লেখকের কথায়, হিরন্ময়ের 'চোখের মধ্যে এক অন্ধকারের আঘাতের দাগ আর কিংশুকের মনের মধ্যে আর এক অন্ধকারের দাগ।'[৪৯] এই দুটি পুরুষের দুটি খুঁতকে অপরাজিতার মনে হয় হিংস্র দুটি খুঁত। দুজনেই প্রতিষ্ঠিত এবং অপরাজিতার পাণি প্রার্থী। অপরাজিতা একজনের কাছে 'অপরা' আর একজনের কাছে 'জিতা'। এই দুই পাণিপ্রার্থীর যে কোনো একজনকে নির্বাচন করতে অপরাজিতা যখন দোদুল্যমানতায় নিমজ্জিত তখন সে দুজনের কাছ থেকে তাদের প্রেম-মনস্তত্ত্ব অনুধাবন করতে উদ্যোগী হয়ে উঠেছে। বর্ণনাংশটি নিম্নরূপ :

> আপনি আমাকে কেন বিয়ে করতে চান কিংশুকবাবু ? উত্তর দেয় কিংশুক–তোমাকে ভালোবাসি, তাই।
> অপরাজিতা–ভালোবাসেন কেন ?
> কিংশুক–সুখী হবো বলে।
> অপরাজিতা–কেন সুখী হবেন ?
> কিংশুক–তুমি সুন্দর বলে।[৫০]

কিংশুকের কথায় অপরাজিতা খুশি হয় এবং সিদ্ধান্তই নিয়ে ফেলে কিংশুককে বিয়ে করার। অন্ধ হিরন্ময়কে যেন বিয়ে করার প্রশ্নই ওঠে না, তারপরও তাচ্ছিল্যের সুরে হিরন্ময়কে বলে :

> আমি আপনাকে কেন বিয়ে করবো ? কি লাভ হবে আমার ?
> –ঠিকই বলেছ অপরা, তোমার কোন লাভ হবে না, লাভ হবে আমার। কিন্তু ---!
> অপরাজিতা–কিন্তু কি ?
> হিরন্ময়–আমি তোমার ওই মুখ কোনদিন দেখতে পাব না, কিন্তু পৃথিবী তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখবে আর দেখা মাত্র বলবে যে, তুমি ---।
> অপরাজিতা–বলুন।
> হিরন্ময়–তুমি মহীয়সী।[৫১]

অবশেষে অপরাজিতা অন্ধ হিরন্ময়কে বিয়ে করলেও বিবাহ-পরবর্তীসময় সে বুঝতে পারে, এ বিয়ে একটি অন্ধলোকের দেখাশোনা করার নার্সের ছাড়পত্র, 'এক বিনে মাইনের চাকরানির জীবনের অঙ্গীকার ঘোষণা।'[৫২] আবেগের বশে অন্ধ হিরন্ময়কে বিয়ে করে সে যে চরম ভুল করেছে তা সে অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছে। হিরন্ময়ের নিরেট অন্ধতাকে অপমান করতে তাই সে কিংশুককে

ডেকে আনে এ বাড়িতে। যদিও পরবর্তীকালে তার মানসিক রূপান্তর ঘটে। ঘটনাবর্তের মধ্য দিয়ে অপরাজিতা এই সত্যে উপনীত হয় যে, চোখ দিয়ে দেখার চেয়ে মন দিয়ে, স্পর্শ দিয়ে, অনুভূতি দিয়ে দেখা আরো সত্য ও সুন্দর। চোখ দিয়ে বাইরের রূপ দেখা যায় ভিতরের রূপ নয়, প্রকৃত সত্য চোখ দিয়ে উপলব্ধি করা যায় না ; যা পারা যায় মন দিয়ে, অনুভূতি দিয়ে। তাই অপরাজিতা শেষ পর্যন্ত কিংশুকের চেয়ে হিরন্ময়কে সত্য বলে মনে করেছে। হিরন্ময়ের প্রতি তার তীব্র বিদ্বেষ পরিণত হয়েছে ব্যাকুল ভালোবাসায়। প্রেম-মনস্তত্ত্বের এমন সর্বাঙ্গীন সম্প্রকাশ সম্পর্কে সমালোচক যথার্থই বলেছেন :

> এই ভালোবাসায় একে অপরের ওপর নির্ভরশীলতাই প্রকাশিত হয়েছে–শুধুমাত্র প্রশংসা ও মনোরঞ্জনের ওপর ভিত্তি করে নয়। 'চোখ গেল' শব্দযুগ্মও এখানে বিশিষ্টভাবে ব্যবহৃত হয়েছে–অর্থাৎ দৃষ্টিনির্ভর ভালোবাসার শেষ হয়ে শুরু হলো অন্তরনির্ভর ভালোবাসার। রবীন্দ্রনাথের 'চোখের আলোয় দেখেছিলেম চোখের বাহিরে অন্তরে আজ দেখবো যখন আলোক নাহিরে' –গানটির দর্শন যেন এই গল্পে রূপ পেয়েছে।[৫৩]

সুবোধ ঘোষ নর-নারীর প্রেম-মনস্তত্ত্বকে নিবিড় অনুসন্ধানের মাধ্যমে গল্পে স্থান দিয়েছেন। তাঁর সেই নিবিড় অনুসন্ধানের সরেজমিন পর্যবেক্ষণের বহু কাহিনী ছড়িয়ে আছে ডায়েরির পাতায়। বস্তুতপক্ষে ব্যক্তিগতজীবনের অভিজ্ঞতায় যা তিনি প্রত্যক্ষ করেননি, তা তিনি লেখেননি। নিয়মের পথে চলতে চলতে কখন যে এক অনিয়ম এসে জীবনটাকে রাঙিয়ে দিয়ে যায়, আর সেই রঙিন মায়া তাকে কী এক অপ্রত্যাশিত কাজে প্রেরণা যুগিয়ে আবার চলেও যায়, সেই অনিয়মের বিস্ময় আর অনাকাঙ্ক্ষিত আবেগই সুবোধ ঘোষের প্রেম মনস্তাত্ত্বিক গল্পের মূল নিয়ামক শক্তি। বুদ্ধিবৃত্তি থেকেই যে প্রেমের জন্ম, আবেগ তার আধার মাত্র–এ কথা লেখক সর্বদা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন বলেই তাঁর এ পর্যায়ের গল্পসমূহে দয়া-মায়া-করুণা, রূপ-যৌবন, ধন-সম্পদ, বংশকৌলিন্য কিংবা তথাকথিত সামাজিক পদমর্যাদা নামে খ্যাত এইসব জঞ্জাল প্রেমকে মলিন করতে পারেনি। প্রেমের সর্বাপেক্ষা মূল ভিত্তি হলো মর্যাদাবোধ যা তাঁর কয়েকটি গল্পের চরিত্রের মনস্তত্ত্বের ভেতর ক্রিয়াশীল। এ ধারার সফল প্রেম মনস্তাত্ত্বিক গল্প "মনভ্রমরা"[৫৪] (১৯৫৩)। আলোচ্য গল্পে প্রেমের মহতী চেতনার মনস্তাত্ত্বিক প্রকাশ লক্ষণীয়। প্রেম যে কেবল যুক্তিহীন আবেগ তা নয়, বরং এর অর্থ হলো ভালো গুণাবলির প্রতি আকৃষ্ট হওয়া, পক্ষপাতিত্ব করা। তাই এ গল্পের কথক পরিণত জীবনের মুক্তবুদ্ধি দিয়ে বিশ্লেষণ করে বলেছেন :

> মনভ্রমরার অর্থ মনই বটে, তবে সে মন হলো চৈত্র মাসের ভ্রমরার মতো, ভালোবাসে গন্ধের ফুল, রঙের ফুল নয়। রঙ দেখে গুনগুনিয়ে গান হয়তো করে, কিন্তু গন্ধের কাছে ছুটে যাবার জন্য গুনগুনিয়ে কাঁদে।[৫৫]

এ গল্পের নায়িকা প্রাইমারি স্কুলের সুধাদি পাড়ার তরলমতি এচোঁড় পাকা সদ্য গোঁফ ওঠা ছেলেদের কাছে মনভ্রমরা নামে পরিচিত। সুধাদি যখন গান গায়, পাড়ার ছেলেরা বুঝতে পারে পলাশতলা থেকে শান্তিদার চিঠি পেয়েছে মনভ্রমরা। শান্তিদা যেমন দেখতে সুন্দর, তেমনি সুন্দর ছবি আঁকে তেমনই ভালো চিঠি লিখতে পারে, ভালো বেহালা বাজায়। আর ধনাঢ্যও বটে। শান্তি সুধার প্রেমের সম্পর্ক পাড়ার ছেলেদের আড্ডার রসদ। ঘটনাচক্রে সুধাদির জ্বরবিকারে যখন মফঃস্বল শহরের কোনো দোকানে ওষুধ পাওয়া যায়নি তখন হরিদা শহর থেকে তার জন্য ওষুধ নিয়ে এসেছে। বিনে পয়সায় দীন দুঃখীদের চিকিৎসা করেই যিনি অনির্বচনীয় আনন্দ লাভ করেন সেই হরিদাই অপ্রকাশ্যে সুধাদিকে ভালোবেসে ফেলেছেন। ভালোবাসার মানুষকে ভালোবেসে তা প্রকাশ করতে পারেননি হরিদা। তাই দূরে চলে গিয়েই তিনি তার প্রেমের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখতে চেয়েছেন। এ প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রাধারাণী দেবীকে উদ্দেশ্য করে লেখা একটি চিঠির কয়েক ছত্র উল্লেখ করা যেতে পারে :

> সংসারে এমন ভালোবাসাও আছে রাধু, যে, সমস্ত জীবন যাকে ভালোবেসেছে তার কাছ থেকে বহু যোজন দূরে বহু তফাতেই থাকতে চেয়েছে। তার ভালোবাসাই তাকে এই দূরে থাকার প্রবৃত্তি দিয়েছে। কাছাকাছি থাকা চোখে দেখার মতো এই আকাঙ্ক্ষা-ভালোবাসার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। সেই ব্যাকুল ও তীব্র প্রবৃত্তিকেও সংরক্ষণ করার শক্তি যোগায়-খাঁটি ভালোবাসাই। সত্যকার ভালোবাসা, তার পাত্র বা পাত্রীকে সুস্থ এবং সুখী দেখতে চায়, তাকে সার্থক এবং গ্লানিহীন দেখতে চায়। আত্মপরিতৃপ্তি তার ঐখানেই।[৫৬]

হরিদার এই নিরুত্তাপ, অস্ফুট প্রেম দূরে সরে গিয়েই খাঁটি হয়ে উঠেছে। ভালোবাসার পাত্রীকে গ্লানির পথে টেনে আনেননি। অন্যদিকে সুধাদিও হরিদার এই মহৎ প্রেমের দৃষ্টান্ত অনুধাবন করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে প্রেম কেবল প্রবৃত্তিগত প্রেরণাশক্তি নয়, তা চিরন্তনতারও উৎস। তাই গল্পের শেষাংশে যখন সুধাদির প্রণয়প্রার্থী শান্তিদার সঙ্গে তার কথোপকথন বিনিময় চলছে, তখন সুধাদির আচার-আচরণ ও অভিব্যক্তি লেখক অসাধারণ প্রেম-মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপন করেছেন। বর্ণনাংশটি এরূপ :

> শান্তিদা আশ্চর্য হয়ে বলেছিলেন–কি বললে, আমাকে তুমি চেননা ?
>
> সুধাদি–আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনার কতটুকু পরিচয়ই বা আমি জানি ? কিছুই জানি না।
>
> রঙিন খামের চিঠির মস্ত বড় একটা মালা সুধাদির ঘরের দেয়ালে তখনো ঝুলছিল। সেই দিকে আঙুল তুলে শান্তিদা বললেন–তবে ওগুলি কি ?
>
> সুধাদি–কতগুলি রঙিন চিঠি।
>
> শান্তিদা–কি আছে ঐ চিঠির মধ্যে, জান না ?
>
> সুধাদি–জানি, কি আছে।
>
> শান্তিদা–কি আছে ?
>
> সুধাদি–কবিতা, গান, রঙ, কথা, ছবি।

শান্তিদা বললেন–শুনে সুখী হলাম। তাহলে তোমার আর কিছু বলবার নেই !

সুধাধি–আছে।

শান্তিদা–কি ?

সুধাদি–ক্ষমা করবেন।

শান্তিদা কিছুক্ষণ কি ভাবলেন, তারপর বললেন–একটা কথা জিজ্ঞাসা করব ?

সুধাদি–বলুন।

শান্তিদা–বোধ হয় আমাকে অপমান করবার জন্যই ইচ্ছে করে এরকম বিধবার মতো সাজ করেছ ?

চোখ দুটো শক্ত করে উত্তর দিলেন সুধাদি–আজ্ঞে না।

শান্তিদা–তবে ?

সুধাদি–বিধবা হয়েছি।

শান্তিদা ভ্রূকুটি করেন–কবে ?

সুধাদি–আজ।

চুপ করে রইলেন সুধাদি। শান্তিদা বিশ্রী রকমের চোখের দৃষ্টি তুলে তাকালেন সুধাদির দিকে–কি ? একটা বাজে কথা বলে চুপ করে গেলে কেন ? উত্তর দাও।

চট করে উত্তর দিয়ে দিল ভুতো–আজ সকাল ন'টার সময়।

চমকে ওঠেন শান্তিদা–তার মানে ?

ভুতো বলে–আজ সকাল নটার গাড়িতে চলে গিয়েছেন হরিদা, আর ফিরে আসবেন না হরিদা।[৫৭]

মনের শুচিতাই যে প্রেমের সর্বাপেক্ষা বড় দিক তা আলোচ্য গল্পে লেখক হরিদার প্রেম-মনস্তত্ত্বের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন।

'মনস্তত্ত্বের সূত্রে প্রেম যেহেতু দুটো মানুষের সম্পৃক্তি'[৫৮]– সেই সম্পৃক্তিই যদি প্রেম-সম্পর্কের ক্ষেত্রে আস্থা হারায় তবে সে প্রেম সর্বাংশে ব্যর্থতায় পর্যবসিত। এরকম একটি বিষয়ই উপজীব্য হয়েছে কুসুমেষু (১৯৫৬) গল্পগ্রন্থের "কুসুমেষু" শীর্ষক নামগল্পে। আলোচ্য গল্পের প্রধান নারী চরিত্র হেমা অতি আদরের উচ্চবিত্ত পরিবারের সুরুচিসম্পন্ন এক নারী। যার শিক্ষা, কথাবার্তা, চাল-চলন, সাজ সজ্জা, রুচি এক বিশেষ ছকে বাঁধা। অপরদিকে গল্পের নায়ক নীহার মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধি যে চার বছর ধরে আরাধনা করে হেমাকে লাভ করেছে। হেমাও ভালোবেসেছে নীহারকে। কিন্তু অন্তর্মুখী স্বভাবের হেমার ব্যক্তিত্ব এমন যে, সে নিজেকে সহজে প্রকাশ করতে পারে না। এই প্রকাশটাকে সে মনে করে রুচিহীনতার কাজ। 'Love is expressed not only inwords but also indeeds'[৫৯] এই কথাটি তার মনোলোকে প্রভাব বিস্তার করে না। তাই নীহারের প্রতি প্রবল আকর্ষণ অনুভব করলেও কেবল প্রকাশহীনতার কারণে তাদের সম্পৃক্তি সংযোগ ঘটেনি। দুজনের অবস্থান পরস্পর হতে অনেক দূরে। বস্তুত হেমা নিজেকে আড়াল করে রেখেছে তার অন্তর্মুখী স্বভাব বৈশিষ্ট্যের কারণে। তাই

স্বেচ্ছায় প্রেম প্রকাশ করাতে তার অনাগ্রহ লক্ষ করা যায়। যদিও গল্পের শেষে তার মানসিক রূপান্তর ঘটেছে। আকস্মিক এক ঘটনায় নীহারের আহ্বানে সাড়া না দিয়ে সে পারেনি। পতন ঘটেছে তার ছন্দোবদ্ধ জীবনের। অনুভব করেছে প্রেমের পরম শান্তি :

> আর একবার চমকে উঠল হেমার উতলা মনের বিস্ময়। এ কি ? দুরন্ত আগ্রহের দুই বাহু আর উত্তাপে বিহ্বল একটা নিঃশ্বাসের টানে হঠাৎ বিব্রত হয়েও পরক্ষণেই বুঝতে পারে, আর বুঝতে পেরে ধন্য হয়ে যায় হেমার মন, সত্যিই তো, স্বামীর বুকেই বন্দী হয়ে গিয়েছে হেমা।[৬০]

সুবোধ ঘোষের গল্পে প্রেম বহুকৌণিক দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত। প্রেমের ক্ষেত্রে নারীরা যতটা ব্যক্তিত্বসচেতন ও আত্মসচেতন, পুরুষরা ঠিক ততটাই বিপরীত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়ে উঠেছে তাঁর গল্পে। সুচাকুরে পাত্রের প্রতি নারীহৃদয়ের মোহ প্রতিটি নারীর মনস্তাত্ত্বিক দিক হলেও অনেক ক্ষেত্রেই সুবোধ ঘোষের গল্পের নায়িকারা জীবনের সঙ্গী হিসেবে গ্রহণ করেছে এক মুখচোরা লাজুক, ভীরু আর সাধারণ মাপের মানুষকেই। এরই সফল উদাহরণ *চিত্তচকোর* (১৯৬০) গল্পগ্রন্থের নামগল্প। বস্তুত "চিত্তচকোর" গল্পে নর-নারীর নিঃশব্দ অথচ সবল প্রেমের পদচারণা লক্ষণীয়। আলোচ্য গল্পে মধুপুরের মীরা পিসিমার এক চিঠির পরামর্শ মতো সদ্য বদলি হয়ে আসা সৌরভ নামে জনৈক ইঞ্জিনিয়ার যুবককে ভালোবাসে অণিমা। প্রথম দর্শনেই ভালো লাগা থেকে শুরু হয় ভালোবাসা যা অণিমা সৌরভকে দেখেই অনুধাবন করেছে। লেখকের বর্ণনাংশ নিম্নরূপ :

> তখন বাড়ির বারান্দায় একটি চেয়ারের উপর বসে বই পড়ছিল সৌরভ সরকার। সত্যিই বড় চমৎকার চেহারা। পঁয়ত্রিশ বছর নয়, এ চেহারা ত্রিশের বেশি হতেই পারে না। সাদা জিনের ট্রাউজার আর সাদা টুইলের শার্ট গায়ে, আর সাদা চামড়ার শ্লিপার পায়ে দিয়ে চেয়ারের ওপর বসে আছে একটি চমৎকার পরিচ্ছন্ন আর স্নিগ্ধ চেহারা।[৬১]

প্রথম দর্শনেই এই সুন্দর চেহারা দেখে অণিমার হৃদয়ে যে প্রেম জাগ্রত হয়েছে তা সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বধর্মী। কেননা 'মেয়েরা রূপবান পুরুষ পছন্দ করে। পছন্দের ক্ষেত্রে প্রথম দর্শনের ধারণা বা First impression কে মনোবিদরা গুরুত্ব দিয়ে থাকেন'।[৬২] এই প্রথম দর্শনজাত প্রেমকে সর্বাংশে রঙিন করতে অণিমা সৌরভকে চায়ের নেমন্তন্ন করেছে, ফুলের তোড়া উপহার দিয়েছে, বালুচর শাড়ি পরিধান করে ঘুরতে বেড়িয়েছে। এগুলো সবই 'প্রেম-মনস্তত্ত্বের সাধারণ বৈশিষ্ট্য যা প্রত্যেক নর-নারী তাদের প্রেম বাসনার চরিতার্থতা পূরণে এক অনির্বচনীয় আনন্দ লাভ করে'।[৬৩] অণিমার এরূপ আচরণে মুগ্ধ সৌরভ ও তার প্রেমানুভবে সম্পৃক্ত হয়। কিন্তু হঠাৎ যখন অণিমা জানতে পারে যে, সৌরভ সরকার ভেবে যাকে সে ভালোবেসেছে সে আসলে সৌরভ সরকারের স্টেনো-টাইপিস্ট ক্লার্ক বিনয় দত্ত তখন প্রেমিকের আসল পরিচয় পেয়ে অণিমা সাময়িক হোচট খেলেও সিদ্ধান্ত নেয় সে

বিনয়কেই বিয়ে করবে। অণিমার এই প্রেম-ভাবনার সফল পরিণতি প্রসঙ্গে সমালোচক যথার্থই বলেছেন :

> একটি মিষ্টি প্রেমের গল্প হিসেবে রচিত এ গল্পটিতে খুব সহজেই পাঠককে গল্পের বিষয় ও পাত্র-পাত্রীদের সঙ্গে একাত্ম করিয়ে দেন গল্পকার। বিনয় দত্ত চরিত্রটি সংযত ও শোভন হওয়ায় গল্পশেষে পাঠক প্রত্যাশা পূরণের স্বাদ পায়। অণিমার সঙ্গে বিনয়ের প্রেম সৌরভের আগমনের ফলে একটু বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল সন্দেহ নেই–কিন্তু মোহের ফাঁদ কেটে নিছক ভালোবাসাকেই এখানে জয়ী করেছেন গল্পকার–দেখিয়েছেন পদমর্যাদা কাম্য হলেও প্রেমের চেয়ে তার স্থান উঁচুতে নয়। চকোর যেমন চাঁদকে আশ্রয় করেই বাঁচে–চাঁদকে ছাড়া যেমন তার পৃথক অস্তিত্ব নেই–বিনয়ের প্রতি প্রেমে অণিমার চিত্ত পুনঃস্থিত হওয়াতেই এই গল্পের নামকরণটিও সুপ্রযুক্ত হয়েছে।[৬৪]

চিত্তচকোর গল্পগ্রন্থের অপর একটি গল্প "সুনিশ্চিতা" যেখানে এই প্রেম-মনস্তত্ত্ব ভিন্নভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। এ গল্পের নায়ক বিমলেন্দু হীরাপুরের কয়লাখনির ইনস্পেকটিং অফিসার। এখানকার মুক্ত পরিবেশে সে তিনটি মেয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করে। এরা হলো ধীরা, অতসী আর সুমনা। যদিও এ তিন নারী মানবিক প্রেমের আদর্শে বিশ্বাসী নয়, অর্থ আর প্রতিপত্তির দিকেই এদের গতি ধাবমান। হীরাপুরে কিছুদিন কাজ করার পর যেদিন বিমলেন্দু কলকাতায় ফিরবে–সেদিন সে স্টেশনে আশা করেছে ধীরা, অতসী ও সুমনার উপস্থিতি–যারা প্রত্যেকেই নিজস্ব ভঙ্গিতে বিমলেন্দুর মন স্পর্শ করেছে। ঘটনাচক্রে সেদিনই ফিরছিলেন কয়লাখনির মালিক ডি. কে. রায়। বিমলেন্দু দেখতে পায়–তিনটি নারী ডি. কে. রায়ের হাতে ফুলের তোড়া নিয়ে এগিয়ে দেওয়ার জন্য এক অসুস্থ প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছে। আত্মজ্ঞান লাভ করে বিমলেন্দু–সে 'যে রকমের ভ্রমর, ওরাও সে রকমের ফুল। ভালোই হয়েছে। বিষে বিষক্ষয় হয়ে গেল।[৬৫] এই আত্মজ্ঞানই তার মনের সমস্ত অপরাধকে দূরীভূত করে দিয়েছে। তাই চিনতে পেরেছে দরিদ্র নিখিল সরকারের মেয়ে মীরার ভালোবাসা। ছোট ভাইয়ের হাত ধরে খাবারের একটা হাড়ি নিয়ে লজ্জাবনত যে মেয়েটি সেই মীরার চোখের দিকে তাকিয়ে হীরাপুরের হীরাকে চিনতে পেরেছে বিমলেন্দু। বিমলেন্দু অনুধাবন করতে সমর্থ হলো যে তার জন্য শেষ পর্যন্ত এগিয়ে এসেছে নিখিল সরকারের কন্যা মীরা–যে নিখিল সরকার মেয়ের পরীক্ষার ফি, কলেজের বেতন ইত্যাদি সূত্রে প্রায়ই তার কাছে টাকা ধার করেন। মীরার কৃতজ্ঞতায়, প্রেমের এমন স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি প্রকাশে বিমলেন্দুর মনের পরিবর্তন হয়–সে মীরাকেই জীবনসঙ্গী করার সিদ্ধান্ত নেয়। 'প্রসঙ্গত পাঠকও বুঝতে পারেন ঐ তিন যুবতীর প্রেমের সঙ্গে মীরার প্রেম ও সততার পার্থক্য–বোঝা যায় ঐ তিনজন নয়–মীরাই এই কাহিনীর সুনিশ্চিতা।'[৬৬] রূপসন্ধানী বিমলেন্দু এতদিনে প্রকৃত প্রেমের সন্ধান পেয়েছে :

> বিমলেন্দুর বুকের ভেতর যেন নিশ্চিত হয়ে একটা আকাশ হেসে উঠেছে, সে আকাশে একটা জয়পতাকা উড়ছে। হীরাপুরে এসে ভুল করেনি, অপমানিত হয়নি, বিদ্রূপ করেনি কোন অভিশাপ। ভাগ্যের শুধু চোখ দুটো কড়া আলোর দিকে তাকাতে গিয়ে বাঁধিয়ে গিয়েছিল।[৬৭]

জীবনবিমুখ ইয়োরোপীয় অবক্ষয়িত সংস্কৃতি চর্চার বিরুদ্ধে সুবোধ ঘোষের অবস্থান ছিল বড়ই নির্মম। দু'দুটি মহাসমর ঘটে যাওয়ার পর ইয়োরোপীয় সংস্কৃতির ঘূর্ণাবর্ত অবস্থা প্রত্যক্ষ করেছিলেন তিনি। দেখেছিলেন জীবন থেকে পালিয়ে গিয়ে মানবতার দুরবস্থা কীভাবে উত্তরোত্তর বাড়িয়ে তুলেছে ইয়োরোপীয় সমাজের নীতি নৈতিকতার শৈথিল্য। সমালোচক বলেন :

> আধুনিক পুঁজিবাদী বিশ্ব, মানুষকে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপ্রিয় ও বিদ্বেষপূর্ণ অবস্থানে নিয়ে গেছে এবং ভগ্ন বা রুগ্নপ্রেমের একটি ব্যক্তিগত ধারা রচনা করেছে। প্রেম এখন নিছক যৌনতৃপ্তিকারক অথচ নিঃসঙ্গতার আশ্রয় মাত্র। নিছক যৌনতা ও নিঃসঙ্গতার আশ্রয়রূপী প্রেমধারার বাইরে মানবপ্রেম–যা সখ্যে, প্রতিবেশিকতায়, নম্রতায়, সাহসে ও বিশ্বাসে-শৃঙ্খলায় পরিচর্যিত এবং যা একটি সংস্কৃতিতে রূপায়িত হয় তা আজকের সমাজে দুর্লভ।[৬৮]

এই মানবপ্রেম যা সর্বার্থে নর-নারীর সত্যিকার ভালোবাসাকে মহৎ করে তোলে, সেই প্রেম-মনস্তত্ত্বের অপূর্ব মেলবন্ধন ঘটেছে "জয়ন্তী"[৬৯] (১৯৬১) শীর্ষক গল্পে। গল্পটি রচনার পূর্বেই লেখক ইয়োরোপ ভ্রমণ করেছিলেন। এই ইয়োরোপের বিশেষত লন্ডন শহরের পটভূমিতেই গল্পটি রচিত। বস্তুত 'এই শহরের স্থান কালিক সকল বৈশিষ্ট্যই এ গল্পকে একটা আন্তর্জাতিকতায় মণ্ডিত করেছে।'[৭০] আলোচ্য গল্পে আমরা লক্ষ করি যন্ত্র সভ্যতার উন্নতির সাথে সাথে মানুষের জীবনযাত্রা ও মনস্তত্ত্বের পরিবর্তন ঘটেছে, সেই সাথে বদলে গেছে দৃষ্টিভঙ্গির, জীবনদর্শনের। যন্ত্রসভ্যতার উন্নতি মানুষের যন্ত্রণাকেও যে বাড়িয়ে দিয়েছে তা গল্পের নায়ক রাজীব ঘোষের মাধ্যমে লেখক উপস্থাপন করেছেন। গল্পের মূল এবং প্রধান চরিত্র রাজীব ঘোষের সঙ্গে বীরভূম জেলার চাল কলের দীনহীন কেরানিবাবুর কন্যা জয়ন্তীর বিয়ে হয়। রাজীবের সৌন্দর্যপিপাসু মন জয়ন্তীর মতো নিতান্ত সাধারণ চেহারার অশিক্ষিত গ্রাম্য মেয়েকে জীবনসঙ্গিনী হিসেবে মেনে নিতে পারে নি। সমালোচক প্রবীর ঘোষ বলেন :

> নারীরা যেমন সাধারণভাবে সমব্যক্তিত্বসম্পন্ন, সম পর্যায়ের অথবা উচ্চতর পর্যায়ের পুরুষকে দাম্পত্যজীবনে বন্ধু করে নিতে একেবারেই নারাজ, তেমনি পুরুষরাও তাঁর চেয়ে কম ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, গুণসম্পন্ন নারীকে জীবনসঙ্গী করতে একেবারেই গররাজি। এটি নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলের মনস্তত্ত্বের এক বিশেষ দিক।[৭১]

এরূপ অসমধর্মী দাম্পত্য রাজীবের কাছে অসহনীয় হয়ে উঠলে সে জয়ন্তীকে মুক্তি দিতে তৎপর হয়ে ওঠে। কেননা সে জানে তাকে দেওয়ার মতো জয়ন্তীর কিছুই নেই। তাই জয়ন্তীকে মুক্তি দিয়ে

কলকাতা থেকে লন্ডনে চলে যায় রাজীব এবং পাঁচ মাস পরে একটি চিঠিতে জানতে পারে জয়ন্তী মারা গেছে। জয়ন্তীর সাথে এই সম্পর্কটাকে রাজীব তার জীবনের একটি দুর্ভাগ্য মনে করেছিল। মনে করেছিল এটি তার জীবনের একটি ক্ষত 'সেই দুর্ভাগ্যের গায়ে একটা পশু-পশু গন্ধ ছিল।'[৭২] এরপর লন্ডনে এসে রাজীব খুঁজে পেয়েছে তার সমধর্মী জীবনসঙ্গী মুক্তি মিত্রকে। নাগপুরের ডাক্তার আলফ্রেড মিত্রের কন্যা মুক্তির শিক্ষা, রুচি, আভিজাত্য, জীবনাদর্শ এই লন্ডনের পরিবেশেই গড়ে উঠেছে। ভালোবেসে তারা শুভ পরিণয়ে আবদ্ধ হলেও বিয়ের পর রাজীব বুঝতে পেরেছে মুক্তির কৃত্রিম ভালোবাসার স্বরূপ। সন্তান প্রত্যাশী রাজীবের আকাঙ্ক্ষা যখন মুক্তি জৈবিক প্রক্রিয়ার পরিবর্তে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গ্রহণ করতে যুক্তি দিয়েছে তখন রাজীব এই কৃত্রিম সম্পর্কের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা খুঁজে পেয়েছে। মুক্তির যুক্তি, নরনারীর স্বাভাবিক যৌন মিলন বড় পাশবিক, বন্য, আদিম। তাতে শরীরের বাঁধুনি নষ্ট হয়ে যায়। মৃদু অনাগ্রহ সত্ত্বেও মুক্তির এরূপ ভিত্তিকে যুক্তিহীনভাবে মেনে নেয় রাজীব। ডাক্তার লুকাসের ক্লিনিকে গিয়ে মুক্তি নকল প্রাণবীজ সংগ্রহ করতে তৎপর হলে, ডাক্তার লুকাস মুক্তির প্রাণের বাসনাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন 'ইয়েস ম্যাডাম, মাত্র তিন ঘণ্টা আগের সংগ্রহ, ফ্রেশ অ্যান্ড ব্রাইট'।[৭৩] এভাবেই মুক্তির গর্ভে আসে রবিন লালু, তাদের সন্তান, কিন্তু রাজীবের ঔরসজাত নয়। ভাগ্যের নির্মম পরিহাসকে বরণ করে নিলেও রাজীবের জীবনের আকস্মিক রূপান্তর ঘটে যখন সে জানতে পারে স্ত্রী মুক্তি তার পূর্বপ্রেমিক মন্টিলেনির কাছে চলে গেছে রবিনকে নিয়ে। প্রেমের এমন জটিল মনস্তাত্ত্বিক রূপ চিত্রণে সুবোধ ঘোষ অসাধারণ শিল্পসফলতার স্বাক্ষর রেখেছেন। সমালোচকের মতে :

> প্রেম দায়িত্ব অধিকারবোধ এসব মূল্যবোধের চকিত উদ্ভাসন হয়েছে রাজীবের মধ্যে। জয়ন্তীর প্রতি সে যে অকর্তব্য করেছে আজ জীবনের ঘাত প্রতিঘাতে তাই সে উপলব্ধি করে। দাম্পত্য প্রেম মনস্তত্ত্বের শীতলতা ও কৃত্রিমতাই ব্যক্তির মূল্যবোধের সংকট সেদিকে জোর না দিয়ে রাজীবের সংকট মুক্তিতেই এ গল্পের পরিসমাপ্তি খুঁজেছেন লেখক।[৭৪]

"জয়ন্তীর" মতো সুবোধ ঘোষ "সুনিকেতা" (১৯৫২) গল্পেও জীবনবিমুখ বিকৃত প্রেম-মনস্তত্ত্বের অসাধারণ ছবি অঙ্কন করেছেন। কলকাতার শাহরিক প্রতিবেশে নির্মিত এ গল্পে রূপবান পরিমল আর রূপবতী বীথিকা নীলকমল ফ্ল্যাটের বাসিন্দা। স্বামী কর্মহীন হলেও চাকরিজীবী বীথিকা তাকে আদর্শ প্রেমের যোগ্য বলেই মেনে নিয়েছে। রূপের আর কামনার জীবনকে অনন্ত করে রাখার সাধনায় তারা মগ্ন। আধুনিক, উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত বীথিকা স্বামীর সকল চাওয়া পূরণ করলেও সন্তান ধারণে সে অনিচ্ছুক। স্বামীকে তাই সে বলে, 'তুমি কি চাও যে, আমি এই বয়সেই শরীরের রক্ত খুইয়ে কতগুলো হাড় আর কাঠ হয়ে যাই।'[৭৫] স্ত্রীর এমন কথায় ক্ষুণ্ন পরিমল। সে ভাবে স্বামী বেকার বলেই স্ত্রী এরূপ আচরণ করছে। আত্মসচেতন পরিমলের আত্মমর্যাদাবোধ জাগ্রত হয়। তাই মিথ্যা চাকরির

অভিনয় করে ভ্রূণ হত্যার দায় থেকে রক্ষা করে স্ত্রীকে। আর বীথিকা যখন সন্তানের কথা ভেবে এবং পরিমলের ওপর নির্ভরশীল হতে পারবে বলে চাকরি ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেয় তখন পরিমলের মিথ্যা চাকরির তথ্য জেনে সে কষ্ট পায়। তবে যখন বীথিকা অনুভব করে যে তার জন্যই স্বামী এরূপ মিথ্যার সুযোগ গ্রহণ করেছে তখন সে আত্মান্বেষণে নিজের ভুল শুধরে নেয়। এভাবে স্বামী-স্ত্রী দুজনের দেওয়া দুটি আঘাতে দুজনেই ক্রমিক উত্তরণে, শুদ্ধতার পথে, প্রেমের পথে উপনীত হয়। আসলে সুবোধ ঘোষ বিশ্বাস করেন, প্রেমের মঙ্গলদ্বীপ জ্বলে উঠলেই দাম্পত্যবিচ্ছিন্নতার অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে পারে নারী-পুরুষ। প্রেমই মানুষে-মানুষে সৃষ্টি করতে পারে পারস্পরিক মানবিক সম্পর্ক। আলোচ্য গল্পের অন্তিমে তাই এমন প্রেম-উন্মেষ অনুষঙ্গ আমরা লক্ষ করি যা অসাধারণ ও তাৎপর্যমণ্ডিত।

দাম্পত্য যেখানে অসুস্থ সুবোধ ঘোষ সেখানে অত্যন্ত কঠোর। সঠিক নৈতিক প্রেরণাজাত মূল্যবোধভিত্তিক প্রেমের মধ্য দিয়ে দাম্পত্য যেখানে প্রতিষ্ঠিত নয়, লেখক সেখানে নিস্পৃহ পরীক্ষকের মতোই ভেঙে দিয়েছেন সে দাম্পত্য। এরকম একটি মনস্তাত্ত্বিক গল্প "অমানিশা"[৭৬] (১৯৬২)। এ গল্পে নর-নারীর দৈহিক নির্ভরশীলতা নয় বরং হার্দ্যিক প্রেম-মনস্তত্ত্বের চিত্র উপস্থাপিত। এ গল্পের নায়িকা মোহিতবাবু এবং জয়াদেবীর কন্যা দেবিকা পঁচিশ বছরের শিক্ষিতা যুবতী। যুবতী হলেও দুর্জ্ঞেয় রহস্যময় এক রোগে আক্রান্ত হয়ে দিনের পর দিন সে এগিয়ে চলেছে মৃত্যুর দিকে। দেবিকার মা, বাবা এমনকি সে নিজেও জানে 'যে কোন মুহূর্তে একটি ভয়ানক ফুৎকার হেনে দীপ নিভিয়ে দেবে'[৭৭] তার। দেবিকার ডাক্তার বিভূতি কাকা জানিয়ে দিয়েছেন সেই অবধারিত করুণ দুঃসহ মুহূর্তটি ক্রমেই এগিয়ে আসছে। আর সবকিছু জেনেও সুমন্ত চৌধুরী ভালোবেসেই বিয়ে করেছেন দেবিকাকে। সকলের অনাগ্রহ সত্ত্বেও তাদের বিয়ে সম্পন্ন হয়। যদিও দাম্পত্যজীবনে তাদের শরীরী মিলন নিষিদ্ধ কারণ ডাক্তার বিভূতি মোহিতবাবুকে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন দেবিকার এই অবস্থায় শারীরিক মিলন হলে যেকদিন বাঁচানো যেতে পারে তাও আর সম্ভব হবে না কোনোভাবে। তাই সুমন্ত এলেই দেবিকার বাবা-মা সতর্ক হয়ে ওঠেন। যদিও দেবিকা স্বামীর সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্কে আবদ্ধ হতে চায় কিন্তু শারীরিক অক্ষমতার কথা ভেবে তা থেকে সে বিরত থাকে। দেবিকা ও সুমন্তের দাম্পত্যজীবনের অন্তঃপ্রদেশে এক প্রাগৈতিহাসিক ক্ষুধা সুপ্ত থাকে। তাকে নিবৃত্ত করতে না পারায় মনের অন্তঃপর্যায়ে এক অতৃপ্ত কামনা জেগে ওঠে এবং তার প্রকাশ জটিল আকার ধারণ করে। D. H. Lawrence বলেছেন :

> Life is only bearable when the mind and the body are in harmony ... and each has natural respect for each other. Obscenity only came in when mind despises and bears the body. [৭৮]

মন ও শরীরের প্রকৃত সমন্বয়ই জীবনকে সহজ ও সুন্দর করতে পারে। মন যখন দেহকে ঘৃণা করে বা ভয় করে তখনই কদর্যতার উদ্ভব হয়। গল্পে দেবিকার অসুস্থ, রুগ্ন শরীরকে ভয় করে সুমন্ত ; তাই তাদের শরীরী মিলন সাধিত হয়নি। পরবর্তীসময়ে এই অসুস্থ দেবিকা যখন ধীরে ধীরে সুস্থতার দিকে ধাবমান তখন সুমন্তের মানসিক রূপান্তর গল্পে নাটকীয় চমক এনে দিয়েছে। যে বাবা-মার নিষেধাজ্ঞার কারণে তাদের শারীরিক মিলন ঘটেনি সেই বাবা-মার কৌশলগত সুযোগকে গ্রহণ করেনি সুমন্ত। আসলে লেখক এখানে অত্যন্ত নিপুণ হাতে দাম্পত্যের পোস্টমর্টেম করে অসুস্থতা নির্ণয় করেছেন। প্রেম-মনস্তত্ত্বের এমন সার্থক চিত্ররূপ গল্পের সামগ্রিক পট-পরিবেশ নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

মানবীয় জীবনবোধ হিসেবে বিবেচিত প্রেম মানুষকে মানব করে তোলে, তাকে করে মোহনীয়। প্রেমের জয়গানে মুখর সুবোধ ঘোষ নর-নারীর প্রেম-মনস্তত্ত্বের বিবিধ প্রান্ত উন্মোচন করে দেখিয়েছেন এর স্বরূপ ও গুরুত্ব। প্রেমহীনতা থেকে কখন যে মানুষের জীবনে সূর্যোদয়ের মতো প্রেম আর্বিভূত হয় তা সে নিজেও জানে না। "দুঃসহধর্মিনী" (১৯৫১) গল্পে এমনই এক প্রেম-মনস্তত্ত্বের চিত্র এঁকেছেন লেখক। এ গল্পে লোভ এবং নীতিবোধ এ দুয়ের টানাপড়েনে নায়ক কমলেশের প্রেম-মনস্তত্ত্বের উদ্ভাসন ঘটেছে। গল্পে কমলেশ তার স্ত্রী ধীরাকে অর্থ উপার্জনের হীন কাজে লিপ্ত হতে বাধ্য করে তাকে জটিল এক জগতে এনে দাঁড় করিয়েছে। এই অবস্থা থেকেই একদিন এক ধনী ব্যক্তির লোভ আয়ত্তের বাইরে চলে যায় যখন ঐ ব্যক্তি তার স্ত্রী ধীরাকে কয়েকদিনের জন্য অন্য কোথাও সঙ্গে নিয়ে যেতে চায়। এতদিন যে ধীরাকে অর্থ উপার্জনের হীন পথে টেনে আনতে চাইলেও পারেনি কমলেশ, সেই ধীরাই যখন সেই অমর্যাদার পথের পথিক হয়েছে তখনই ধ্যানভঙ্গ হয়েছে কমলেশের। প্রবল ঈর্ষাবোধ থেকেই তার মধ্যে জেগে উঠেছে প্রেম। তাই তার স্ত্রী, তার সহজ দাম্পত্যজীবনের স্বপ্ন তার চোখে ভেসে ওঠে, প্রেম-মনস্তত্ত্ব হয়ে ওঠে আলোকময় ও রঙিন। যে জীবন সে পায়নি, যে জীবনের প্রতি তার কোনো তৃষ্ণা ছিল না, আজ তারই আকর্ষণে সে এক ভিন্ন মানুষ হয়ে উঠেছে।

প্রেমের শাশ্বত-সৌধ ও মূল্যবোধের চমৎকার প্রকাশ ঘটেছে "ব্রততী" ও "শ্মশানচাঁপা" গল্পদ্বয়ে। "ব্রততী" গল্পে মীরা সেনের মনস্তাত্ত্বিক অনুভূতি এবং "শ্মশানচাঁপা" গল্পে ঘাটবাবুর নিরুচ্চারিত প্রেমানুভূতি সুবোধ ঘোষ তুলে এনেছেন তাঁর শিল্পিত স্বভাবে। "ব্রততী" গল্পে যক্ষ্মাক্রান্ত মীরা সেন স্বামী সুধাকর সেনের প্রেমানুভূতি থেকে বঞ্চিত হয়ে হাসপাতালের একাকিত্বকে বরণ করে নিয়েছে। স্বামীর পুনরায় বিয়ে তাকে বিচলিত করেনি এতটুকু। এমন মানসিক সাহস যার সেই মীরার

মনোলোকে পুরুষ ওয়ার্ডের অপর যক্ষ্মাক্রান্ত এক রোগীর মহানুভবতা তাকে আকৃষ্ট করে। যক্ষ্মারোগী হলেও লোকটি চিত্রকর। তার ছবি আঁকা দেখে মীরার দিনগুলি কেটে যায় বেশ। একদিন চিত্রকর এই লোকটি মারা গেলে মীরার 'দুকপুকে বুকের একটা ব্যথিত নিঃশ্বাস যেন ডুকরে উঠেছে।'[৭৯] প্রেম-মনস্তত্ত্বের এমন শাশ্বত-সৌধ নির্মাণ করে সুবোধ ঘোষ প্রেমের প্রতি সুবিচার করেছেন এখানে। মীরা সেনকে ভালোবাসার জন্য, তাকে অনুধাবন করার জন্য চিত্রকর ব্যক্তিটিই উত্তম পুরুষ। তেমনি এই ভদ্রলোককে বোঝার জন্য মীরা সেনও যথার্থ যোগ্য। আজ তারা দুজন যেন এক হয়ে গেছে। তাই চিত্রকর ব্যক্তির মৃত্যুতে মীরার বুভুক্ষিত নারী হৃদয়ে উচ্চারিত হয়েছে করুণ প্রেমগাঁথা, 'সত্যি মনো, বড্ড একা-একা বোধ করছি। একটুও ভালো লাগছে না।'[৮০]

নর-নারীর প্রেম-মনস্তত্ত্ব বিচিত্র এবং বহুধা মাত্রায় প্রকাশিত। শ্রেণিদ্বন্দ্ব, রাজনৈতিক, সামাজিক, পারিবারিক সংকটেও নারী-পুরুষের প্রেম-মনস্তত্ত্ব সচল থাকে প্রাতিস্বিক বলয়ে। "শ্মশানচাঁপা" গল্পে মাধব গাঙ্গুলী পারিপার্শ্বিক সংকট আর জটিল আবর্তের শিকার হয়ে তার নব বিবাহিতা স্ত্রী সুমিতা গাঙ্গুলীকে হারিয়েছে। গল্পের শুরুতে দেখি এ মাধব গাঙ্গুলী শহরে এসে রাধা বাবুর কাপড়ের দোকানে চাকরি নিয়েছে। জাত-পাতের কারণে মাধব এ কাজ করতে না পারায় পরবর্তীকালে নাম পরিবর্তন করে ঘাটবাবু নাম নিয়ে শ্মশানে চাকরি নেয়। শ্মশানের আঙিনা দেখাশোনা আর নববিবাহিতা স্ত্রী সুমিতা গাঙ্গুলীর সঙ্গে তার দাম্পত্য বেশ আনন্দে অতিবাহিত হলেও এ আনন্দ সর্বাংশে ব্যর্থ হয়ে যায় কুমার সাহেবের ঘাট বাবুর স্ত্রীকে হরণ করার মধ্য দিয়ে। বাগান বাড়িতে আনন্দ ফূর্তি করার লক্ষ্যে কুমার সাহেব ঘাটবাবুর স্ত্রীকে নিয়ে গেলেও আর সে ফিরে আসেনি। ঘাটবাবু ব্যথিত, নিঃসঙ্গ হয়ে সিদ্ধান্ত নিল শ্মশানের চাকরি ছেড়ে দিবে। কিন্তু প্রেমের অমোঘ আকর্ষণ তাকে শ্মশান থেকে অন্তর্হিত করতে পারেনি। শ্মশানে অপেক্ষা করতে থাকে তার প্রণয়িনী সুমিতা গাঙ্গুলীর জন্য, কারণ এখানে একদিন সবাইকে আসতেই হবে। অবশেষে প্রণয়িনী তার এসেছে, কিন্তু জীবিত নয়–মৃত। ঘাটবাবুর অসাধারণ প্রেম-মনস্তত্ত্বের চিত্র গল্পকার তুলে ধরেছেন এভাবে :

> কি আশ্চর্য, শেডের কাছে একটা চাঁপাগাছও যে রয়েছে দেখছি। এখানে তা হলে চাঁপাও ফোটে ? কাঞ্চন কাকা বললেন–না হে না, গাছটা আছে মাত্র, ফুল ধরে না।[৮১]

প্রেমের মর্যাদাবোধ আরো দীপ্তিময় হয়ে উঠেছে "অর্কিড" (১৯৬২) গল্পে। মূলত নর-নারীর প্রেম-মনস্তত্ত্বের চিরন্তনতা স্বীকৃতি পেয়েছে আলোচ্য গল্পে। এ গল্পের নায়ক আত্মভোলা উদ্ভিদবিশারদ প্রণব বসু আবিষ্কারের নেশায় মগ্ন। কর্মহীন প্রণব বসুর সংসারে স্ত্রী করুণা যেন 'একটা নিরর্থক অস্তিত্ব'।[৮২] অর্কিডের আবিষ্কারক প্রণব বসু সারাদিন অর্কিডের নেশায় ডুবে থাকলেও স্ত্রীর প্রতি তার প্রেম সম্পূর্ণ অটুট থেকেছে। প্রণব তার আবিস্কৃত একটি অর্কিডের নাম রেখেছে স্ত্রীর নামে–

Dhaka University Institutional Repository

'কালান্থিস করুণাইনা'। স্বামীর এরূপ নিরুচ্চারিত প্রেম করুণা প্রথম দিকে অনুধাবন করতে না পারলেও গল্পের শেষে এই আবিস্কৃত 'কালান্থিস করুণাইনা'র সঙ্গে নিজের অভিন্নতা উপলব্ধি করেছে সে। তাই ধনাঢ্য কনট্রাক্টর গুণাকরের দাক্ষিণ্য ব্যর্থ করে দিতে নিজের মধ্যে গড়ে তুলেছে প্রতিরোধের প্রাচীর। স্বামীর দারিদ্র্য সহ্য করে সে উপলব্ধি করেছে অর্থ-সম্পদই মানুষকে প্রকৃত সুখী করতে পারে না বরং প্রেমই মানুষকে সুন্দর ও মহৎ করে গড়ে তোলে। করুণার এই মর্যাদাবোধের জাগরণই গল্পের মূল বিষয়বস্তু। এক চমৎকার মানবিক প্রেম-সম্পর্কের টানাপড়েন সৃষ্টি করে লেখক বুঝিয়ে দিলেন হাজার অভাববোধ আর দ্বিধা সত্ত্বেও জীবনকে ভালোবেসে বেঁচে থাকাতেই প্রকৃত প্রেমের সার্থকতা। সমালোচকের মতে :

> সুবোধ ঘোষ জানতেন এবং জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতায় বুঝেছিলেন মর্যাদাহীন প্রেম নিছক জৈবিক স্তরে নেমে আসে। সেখানেই মানুষের, মানবতার, সভ্যতার অপমান। একথা তিনি বড় বেশি মানতেন বলে তার বেশিরভাগ গল্পের নায়িকাদের ভূমিকা অত্যন্ত তেজস্বিনীর। আত্মমর্যাদা বোধ জাগিয়ে তিনি বৃহত্তর জীবনের যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠিয়ে দিয়েছেন তাদের। যেখানে তারা এক একজন সৈনিক। এখানেই তাঁর মানবিক দায়।[৮৩]

প্রেমের স্মৃতি নিয়ে বেঁচে থাকার গল্পও সুবোধ ঘোষ লিখেছেন। এ ধারার একটি সার্থক গল্প "ফল্গু ও ফাল্গুন"। আলোচ্য গল্পে দেখা যায় মৃত স্ত্রীর বাসররাতের স্মৃতি বহন করে জীবন অতিবাহিত করছে রেলের গার্ড জয়ন্ত। কদমপুরার বাংলো ধাঁচের সরকারি কোয়ার্টারে যখন অতুলবাবু থাকতেন, সেখানে তারই মেয়ে প্রভার সঙ্গে বিয়ে হয় জয়ন্তর। বর্তমানে অতুলবাবু বদলি হয়ে গেছেন সাসারামে। এই কোয়ার্টারে আছেন হেম সরকার। তিন বছর পূর্বে এই বাড়িতে প্রভার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল জয়ন্তর। মৃত স্ত্রীর স্মৃতি আজো অম্লান হয়ে আছে জয়ন্তর মনে। তার মনোলোকে মৃত স্ত্রীর প্রতি প্রেম তাকে বিন্দুমাত্র বিস্মৃত করেনি। তাই হেম সরকারের কোয়ার্টারে বেড়াতে আসা অতি আধুনিকা ও শিক্ষিতা রীতা যখন তাকে প্রেম নিবেদন করেছে, তখন তা প্রত্যাখ্যান করে ক্ষমা চেয়েছে জয়ন্ত। এখানে জয়ন্তর মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে লেখক অত্যন্ত সতর্ক থেকেছেন। যুক্তিবাদী জয়ন্ত প্রেমের চিরন্তন রূপকে নিছক কামনা বাসনার ভেতরে সীমাবদ্ধ করতে চায়নি। তাই মৃত স্ত্রীর প্রতি তার প্রেমানুভূতি তাকে এক উচ্চতর মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। আসলে প্রেম এমন এক অনুভূতি যাকে নিয়ে কোনো বিচার-বিশ্লেষণ, গবেষণা চলে না। চলে না যুক্তি-তর্ক–এ সম্পর্কে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য উক্তি নিম্নরূপ :

> স্ত্রী পুরুষের সম্পর্ক। এ সম্পর্ক চির রহস্যময়। প্রেম বা ভালোবাসা বুঝাইবার বা বুঝিবার জিনিস নয়, উপলব্ধির জিনিস। জ্ঞানের দ্বারা উহার অর্থ কোন দিনই কেহ আবিষ্কার করিতে পারিবে না। সে চেষ্টা কেহ করিয়াছে কিনা তাহাও সন্দেহের বিষয়, করিয়া থাকিলে উহা যে সফল হয় নাই তাহা সুনিশ্চিত। কবি, ঔপন্যাসিক এমনকি সমালোচকও এই রহস্যের মোহে মুগ্ধ হইয়া উহার চারিদিকে ঘুরিয়া স্তব করিয়া

বেড়াইতেছে ; কেউ বা ক্ষুধিত পাষাণের মেহের আলির মত চিৎকার করিয়াছে-তফাৎ যাও, তফাৎ যাও সব ঝুটা হ্যায়।[৮৪]

পরিশেষে বলা যায় প্রেমের গল্পে সুবোধ ঘোষের সাফল্য তর্কাতীত। লেখকের অন্তর্ভেদী তীক্ষ্ণদৃষ্টি গল্পে নর-নারীর প্রেম-মনস্তত্ত্বের অন্তর্গূঢ় জটিলতা আর অপার রহস্যময়তা উন্মোচন করেছে নিপুণ দক্ষতায়। নর-নারীর প্রেমে যে সূক্ষ্ম তন্তুজাল নিহিত তা সুবোধ ঘোষের প্রেম-মনস্তত্ত্বকেন্দ্রিক গল্পের চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে হয়ে উঠেছে সৃজনমুখর। 'বিষয় ভাবনা ও প্রকরণ চিন্তায়, কথকতার বয়নে, বিভিন্ন বর্গের মানুষের গ্রন্থিল অনুভূতির সংশ্লেষণে, প্রেম ও প্রেমহীনতার দোলাচল নির্ণয়ে তিনি ক্লান্তিহীন।'[৮৫] তাই নরনারীর প্রেম-মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতি আর জটিলতা তাঁর গল্পকে দিয়েছে এক বিরল স্বাতন্ত্র্য। এই বিরল স্বাতন্ত্র্যের গুণেই তার প্রেম-মনস্তত্ত্বনির্ভর গল্পসমূহ নান্দনিক শিল্প-সমগ্রতায় সার্থক হয়ে উঠেছে।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, *সাহিত্যে ছোটগল্প*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, প্রথম 'মিত্র ও ঘোষ' সংস্করণ, শ্রাবণ ১৪০৫, পৃ. ২১১

২. বেগম আকতার কামাল, "বাংলাদেশের কবিতায় প্রেম-মনস্তত্ত্ব" শীর্ষক প্রবন্ধ, *কবির চেতনা : চেতনার কথকতা*, ধ্রুবপদ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ২০১৩, পৃ. ২৭৬

৩. অমলেন্দু বসু, "বাঙলায় প্রেমের কাব্য" শীর্ষক প্রবন্ধ, *প্রবন্ধ সংগ্রহ*, প্রথম খণ্ড, বাণীশিল্প, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০০৮, পৃ. ২৯১

৪. মৃণালকান্তি মণ্ডল, *নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্প : বিষয় ও রূপের মূল্যায়ন*, সাহিত্যসঙ্গী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০০৬, পৃ. ৭৬

৫. ভূদেব চৌধুরী, *বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার*, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, চতুর্থ প্রকাশ, পুনর্মুদ্রণ, ১৯৯৯, পৃ. ৩০০

৬. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, *কল্লোল-যুগ*, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, সপ্তম প্রকাশ, আশ্বিন ১৩৯৫, পৃ. ৮

৭. শীতল চৌধুরী, *বাংলা ছোটগল্পের তিন নক্ষত্র বনফুল প্রেমেন্দ্র মিত্র নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়*, প্রজ্ঞা বিকাশ, কলিকাতা, ১৪১৫, পৃ. ৫৬

৮. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, *কালের পুত্তলিকা বাংলা ছোটগল্পের একশ'দশ বছর/১৮৯১-২০০০*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ ২০১০, পৃ. ২০৪

৯. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, *লেখকের কথা*, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ১৯৫৭, পৃ. ৫

১০. সুদীপকুমার চক্রবর্তী, *ছোটগল্পের সুবোধ ঘোষ*, প্রকাশ ভবন, কলিকাতা, প্রকাশকাল নেই, পৃ. ৬৪

১১. রথীন্দ্রনাথ রায়, *ছোটগল্পের কথা*, সুপ্রকাশ প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৫৯, পৃ. ১৪৫

১২. নবনীতা চক্রবর্তী, *বাংলা ছোটগল্পের গদ্যশৈলী সতীনাথ ভাদুড়ী-সুবোধ ঘোষ-কমলকুমার মজুমদার*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০২, পৃ. ৩২

১৩. Erich Fromm, *The Art of Loving*, Unwin paperbacks, London, 1985, p. 25

১৪. সমর ঘোষ, *প্রলেতারিয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি প্রসঙ্গে*, নবসাহিত্য প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৯৮৩, পৃ. ২০

১৫. উত্তম ঘোষ, "প্রয়োজন সেই দিকদর্শন" শীর্ষক প্রবন্ধ, (বারবধূ ও অন্যান্য গল্প, সুবোধ ঘোষ), দীপ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃ. ৩

১৬. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬৯

১৭. গোপালমণি দাস, *দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলা ছোটগল্পে সুবোধ ঘোষ*, পাত্র'জ পাবলিকেশন, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০০৭, পৃ. ৮৯

১৮. উত্তম ঘোষ, *সুবোধ ঘোষ : বড় বিস্ময় জাগে*, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ১৯৯৪, পৃ. ৮

১৯. প্রবীর ঘোষ, "প্রেম ও বিবাহ" শীর্ষক প্রবন্ধ, *সংস্কৃতি : সংঘর্ষ ও নির্মাণ*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৩, পৃ. ১৭৩

২০. সুবোধ ঘোষ, "জতুগৃহ", *গল্পসমগ্র-১*, আনন্দ প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, জানুয়ারি ১৯৯৪, পৃ. ১৫৪

২১. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, *সাহিত্য সন্ধান*, সাহিত্য বিহার, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, মার্চ ১৯৮৮, পৃ. ৪৪

২২. সুবোধ ঘোষ, "জতুগৃহ", পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৯

২৩. সুদীপকুমার চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৭

২৪. সুবোধ ঘোষ, "জতুগৃহ", পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬১

২৫. সুবোধ ঘোষ, "অচিরন্তন", *গল্পসমগ্র-১*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫৬

২৬. পার্থ চট্টোপাধ্যায়, "একা এবং অনেকে" শীর্ষক প্রবন্ধ, *বাঙালি জীবনে সম্পর্ক*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৮, পৃ. ১১

২৭. সুবোধ ঘোষ, "অচিরন্তন", পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫৬

২৮. পূর্বোক্ত

২৯. শিবশংকর পাল, *সুবোধ ঘোষের ছোটগল্পে মানবিক মূল্যবোধ*, সুবর্ণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ২৭১

৩০. সুবোধ ঘোষ, "অচিরন্তন", *গল্পসমগ্র*-১, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫৬

৩১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬৬

৩২. শিবশংকর পাল, পূর্বোক্ত, পৃ, ২৭১

৩৩. তপন মণ্ডল, *গল্পকার সুবোধ ঘোষ : জীবনদৃষ্টি ও নির্মাণ শিল্প*, জ্ঞান বিচিত্রা প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০০৭, পৃ. ১৫২

৩৪. সুদীপকুমার চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত, পৃ, ৫৯

৩৫. অলোক রায়, *কথাসাহিত্য জিজ্ঞাসা*, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ১৯৯২, পৃ. ৯৩

৩৬. সুবোধ ঘোষ, "শুক্লাভিসার", *গল্প সমগ্র*-২, আনন্দ প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, এপ্রিল ১৯৯৪, পৃ. ৬৭

৩৭. হরনাথ পাল, *রবীন্দ্রনাথ ও প্রাচীন সাহিত্য*, বামা পুস্তকালয়, কলিকাতা, ১৯৬৬, পৃ. ৫০

৩৮. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, *কালের পুত্তলিকা বাংলা ছোটগল্পের একশ'দশ বছর/১৮৯১-২০০০*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬৯

৩৯. সুবোধ ঘোষ, "হঠাৎ গোধূলি", *গল্প সমগ্র*-৩, আনন্দ প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, জুন ১৯৯৪, পৃ. ৩৬৭

৪০. প্রবীর ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৫

৪১. সুবোধ ঘোষ, "'স্বস্ত্যয়ন", *গল্প সমগ্র*-২, পূর্বোক্ত, পৃ.২৫৪

৪২. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৬

৪৩. পূর্বোক্ত

৪৪. পূর্বোক্ত

৪৫. পার্থ চট্টোপাধ্যায়, "সম্পর্ক : প্রেম" শীর্ষক প্রবন্ধ, *বাঙালি জীবনে সম্পর্ক*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৭-২১৮

৪৬. অরিন্দম গোস্বামী, *সুবোধ ঘোষ কথাসাহিত্য*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, আগস্ট ২০০১, পৃ. ৯৩

৪৭. শিবশংকর পাল, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৯

৪৮. পার্থ চট্টোপাধ্যায়, "সম্পর্ক : প্রেম" শীর্ষক প্রবন্ধ, *বাঙালি জীবনে সম্পর্ক*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯১

৪৯. সুবোধ ঘোষ, "চোখ গেল", *গল্প সমগ্র*-১, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২২

৫০. পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৩

৫১. পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৪

৫২. পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৬

৫৩. অরিন্দম গোস্বামী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৪

৫৪. "মনভ্রমরা", গল্পটি ১৯৫৩ সালে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র দোল সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

৫৫. সুবোধ ঘোষ, "মনভ্রমরা", *গল্প সমগ্র*-৩, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬১-১৬২

৫৬. গোপালচন্দ্র রায় (সম্পা), শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা, ১৯৫৪, পৃ. ২২০

৫৭. সুবোধ ঘোষ, "মনভ্রমরা", পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৬-১৭৭

৫৮. বেগম আকতার কামাল, পূর্বোক্ত, পৃ, ২৮৮

৫৯. Erich Fromm, Ibid, p. 29

৬০. সুবোধ ঘোষ, "কুসুমেষু", *গল্প সমগ্র*-১, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫৪

৬১. সুবোধ ঘোষ, "চিত্তচকোর", *গল্প সমগ্র*-১, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮১

৬২. পার্থ চট্টোপাধ্যায়, "সম্পর্ক : প্রেম" শীর্ষক প্রবন্ধ, *বাঙালি জীবনে সম্পর্ক*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬

৬৩. সমীরণ চট্টোপাধ্যায়, *মনস্তত্ত্বের গোড়ার কথা*, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলিকাতা, ১৩৫৮, পৃ. ৪৯

৬৪. অরিন্দম গোস্বামী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৯

৬৫. সুবোধ ঘোষ, "সুনিশ্চিতা", *গল্প সমগ্র*-১, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২

৬৬. অরিন্দম গোস্বামী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯০

৬৭. সুবোধ ঘোষ, "সুনিশ্চিতা", *গল্প সমগ্র*-১, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১

৬৮. বেগম আকতার কামাল, পূর্বোক্ত, পৃ, ২৮৬

৬৯. "জয়ন্তী" গল্পটি ১৯৬১ সালে 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পরবর্তীসময়ে *অর্কিড* গল্পগ্রন্থে গল্পটি অন্তর্ভুক্ত হয়।

৭০. শিবশংকর পাল, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৬

৭১. প্রবীর ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭০

৭২. সুবোধ ঘোষ, "জয়ন্তী", *গল্প সমগ্র*-১, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৭

৭৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৯

৭৪. সাবিত্রী নন্দ চক্রবর্তী, *আধুনিক বাংলা ছোটগল্প : মূল্যবোধের সংকট*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জুন ২০০৪, পৃ. ৮২

৭৫. সুবোধ ঘোষ, "সুনিকেতা", *গল্প সমগ্র*-৩, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৪

৭৬. "অমানিশা" গল্পটি ষাটের দশকে 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

৭৭. সুবোধ ঘোষ, "অমানিশা", *গল্প সমগ্র*-৩, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩৩

৭৮. সুধাংশু রঞ্জন ঘোষ, *বিদেশের নিষিদ্ধ উপন্যাস*, প্রকাশকের নিবেদন অংশ, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮০, পৃ. ১৭

৭৯. সুবোধ ঘোষ, "ব্রততী", *গল্প সমগ্র*-৩, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮১

৮০. পূর্বোক্ত

৮১. সুবোধ ঘোষ, "শ্মশানচাঁপা", *গল্প সমগ্র*-১, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪

৮২. সুবোধ ঘোষ, "অর্কিড", *গল্প সমগ্র*-১, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৮

৮৩. শিবশংকর পাল, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৪

৮৪. নীরদচন্দ্র চৌধুরী, *বাঙালী জীবনে রমণী*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৪০৮, পৃ. ২২

৮৫. উত্তম রায়, সুবোধ ঘোষের ছোটগল্পে কথনশৈলী, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০১০, পৃ. ৬৩

তৃতীয় অধ্যায়

সুবোধ ঘোষের ছোটগল্পে বিচিত্রমুখী মানব মনস্তত্ত্ব

মানবমনের গভীর তলদেশে প্রবেশ করা যে লেখকের মূল শিল্পধর্ম, সেই সুবোধ ঘোষের ছোটগল্পে বিচিত্রমুখী মানব মনস্তত্ত্বের সাক্ষাৎ মেলে। বলা যায় মনোগহনের তামসপথে বিচরণ করে সুবোধ ঘোষ তাঁর গল্পসমূহের চরিত্র নির্মাণ করেছেন। মানব মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তিনি কেবল ফ্রয়েডীয় জীবনদৃষ্টির আলোকে কিংবা নর-নারীর প্রেম-মনস্তত্ত্বের ভেতরে সীমাবদ্ধ থাকেননি; তাঁর সুতীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি বিচিত্র মানব মনস্তত্ত্ব চিত্রণেও উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছে। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের বিবিধ, বিচিত্র মনোজগতের প্রান্ত উন্মোচন করতে গিয়ে সুবোধ ঘোষ খণ্ডিত জীবন অনুধ্যানের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করেছেন অখণ্ড জীবনপ্রবাহে । বহিরাঙ্গিক ঘটনার পরিবর্তে মানবমনের অন্তঃস্তলের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াই তাঁর ছোটগল্পের অন্বিষ্ট। আবেগশাসিত মানবমনের বিবিধ প্রান্ত উন্মোচনের প্রয়াসে তাঁর ছোটগাল্পিক সত্তা ক্রমশ এক বিশালায়তন শিল্পপ্রবাহপুঞ্জে পরিণত হয়েছে। জীবনের সমগ্রতা সন্ধান করতে গিয়ে শিল্পযাত্রার সূচনালগ্ন থেকেই মানবমনের গহন প্রদেশে পরিভ্রমণ করেছে তাঁর শিল্পীচৈতন্য। ফলে মনস্তত্ত্বের বিভিন্ন দিক তাঁর শিল্পে-সাহিত্যে অনিবার্য ও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উপস্থাপিত হয়েছে। তাছাড়া:

> মানুষের বাহ্যিক আচরণের ভঙ্গিমার উপরে তাঁর এক সূক্ষ্ম নজর ছিল সতত। অনেক সময় এই সূক্ষ্ম দৃষ্টি এবং ফলত সেই বিচার বুদ্ধির প্রতিক্রিয়া হিসেবে তাঁর আচরণ সাধারণ দৃষ্টিতে বিলক্ষণ বিসদৃশ ঠেকত। আপাতদৃষ্টিতে অতি তুচ্ছ কোনও বিষয়ে তাঁর তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা যেত, সেটা অনেকের পক্ষেই বুঝে ওঠা সম্ভব হত না। কোনও কোনও সময় সমর্থনযোগ্য বলেও মনে হত না। কিন্তু তিনি সব সময়েই তিনি, তাঁর মানসিক পরিমণ্ডলের বাইরে তিনি নিজেও অনেক সময় বেরিয়ে আসতে সক্ষম হতেন না।[১]

বস্তুত 'মনোলোকের বিচিত্র চোরাগলি আর ক্লেদাক্ত রহস্যের উদঘাটনের সফল গল্পকার'[২] সুবোধ ঘোষ মানুষের অতলান্ত মনের রহস্যলোক উপস্থাপনে বরাবরই থেকেছেন সতর্ক। বাংলা ছোটগল্পে জটিল মনস্তাত্ত্বিক বিন্যাস এবং মননির্ভর প্রতীক ও ব্যঞ্জনার জন্যও তিনি স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন :

> সুবোধ ঘোষের প্রত্যেক গল্পের উপরই অসাধারণত্বের ছাপ লক্ষিত হয়–ভূগর্ভে প্রোথিত খনিজ সম্পদের ন্যায় তিনি মানবমনের অনেক গোপন, রহস্যাবৃত স্তর, জীবন সংঘটনের অনেক বিচিত্র, অভিনব রেখাচিত্র উদঘাটিত করিয়াছেন। জীবনের বিরল-পথিক সীমান্ত প্রদেশ হইতে তিনি কত না মৃদু সৌরভপূর্ণ বন্যফুল চয়ন করিয়াছেন।[৩]

মানুষের অন্তর্জীবনের চলচ্ছবি চিত্রণে সুবোধ ঘোষ সর্বদা আগ্রহী ছিলেন। 'ফ্রয়েডের বিশ্ববিশ্রুত আবিষ্কারের পরে অন্তর্জীবনের রহস্যদ্বার উদঘাটিত হয়েছে। একালের গল্পলেখকেরা মানুষের সেই নিগূঢ় মনের গহনে তাঁদের সন্ধানী আলো ফেলেছেন'।[৪] সুবোধ ঘোষ তাই গল্পে মনোবিশ্লেষণের ক্ষেত্রে চরিত্রের অন্তর্নিহিত হৃদয়াবেগকে যেমন গুরুত্ব দিয়েছেন, তেমনি নিখুঁতভাবে তুলে এনেছেন মনোবিকারের চিত্রও। পাশাপাশি বিচিত্রমুখী মানব মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে তাঁর অসাধারণ পারদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। 'মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় মনস্তত্ত্ব যেভাবে কাজ করে যায়, সুবোধ ঘোষের সব গল্পেই প্রায় সেভাবে মনের চোরাস্রোতে ধাবিত হয়েছে।'[৫]

সমাজের বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষ যাঁর রচনার মূল প্রেরণাশক্তি, সেই সুবোধ ঘোষের ছোটগল্পে নর-নারীর বৃত্তিগত মনস্তত্ত্ব এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। অর্থনীতিনির্ভর সমাজব্যবস্থায় মানুষের বৃত্তিগত পরিচয় তাকে একটি অবস্থানে এনে দাঁড় করায়। এই বৃত্তিগত পরিচয়সূত্রে তার মনস্তাত্ত্বিক আচার-আচরণ ও অভিব্যক্তি হয়ে ওঠে পৃথক ও স্বতন্ত্র। জীবনের মূল স্রোত থেকে যারা সরে যায় বা সরে যেতে বাধ্য হয়, তাদের জীবনের সমস্যাটি মূলত অর্থগত। এই বঞ্চিত শ্রেণির একটি হচ্ছে নিষিদ্ধ পল্লির পতিতাশ্রেণি। তাদের বৃত্তিগত মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে সুবোধ ঘোষ তাঁর কয়েকটি গল্পে অসাধারণ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। 'এই সব পতিতাদের হৃদয়ের কমনীয় মাধুর্য, যন্ত্রণা, চিরন্তন নারীত্ববোধ আর করুণ অসহায়তার কথা ব্যক্ত হয়েছে এই পর্যায়ের গল্পগুলিতে।'[৬] পতিতাজীবনের অজস্র অসঙ্গতিকে চিহ্নিত করে লেখক তাদের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার বিবিধ দিক গল্পে চিত্রিত করেছেন সাবলীলভাবে। এক্ষেত্রে সুবোধ ঘোষ বাস্তব জীবনাভিজ্ঞতার অনুসারী। কেননা :

> ব্যক্তিজীবনে বিচিত্র জীবিকা ও অভিজ্ঞতার মধ্যে তিনি হাজারিবাগ, সিংভুম ও রাঁচি অঞ্চলের ব্রাত্যজন ও শ্রমজীবী মানুষের নানা সমস্যা প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং মধ্যবিত্ত বাঙালিয়ানার রুচি ও মূল্যবোধের সঙ্গে ঐসব 'তুচ্ছ' মানুষদের একটি মানবিক বিরোধাভাসকে শৈল্পিক রূপ দেয়ার প্রচেষ্টা আছে। এই বিরোধাভাসকে অবশ্য বলশেভিক দৃষ্টিকোণের শ্রেণি সংগ্রামে কখনই তিনি দেখেননি কিংবা ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনের দৃষ্টিতে কোনো সাইকলজিক্যাল অনুসন্ধান তাঁর চূড়ান্ত উদ্দেশ্য ছিল না।[৭]

পতিতা নারীর বিচিত্রমুখী মনস্তত্ত্ব নিয়ে সুবোধ ঘোষ বেশ কয়েকটি গল্প রচনা করেছেন যেগুলোতে তাঁর সৃজনক্ষম প্রজ্ঞার পরিচয় পাওয়া যায়। *পরশুরামের কুঠার* (১৯৪২) গল্পগ্রন্থের শিরোনামাচিহ্নিত গল্প "পরশুরামের কুঠার"[৮] পতিতাদের নিয়ে লেখা সুবোধ ঘোষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প। এ গল্পের জনপ্রিয়তা প্রমাণ করে গল্পটির আখ্যানভাগের শ্রেষ্ঠত্ব। 'জনপ্রিয়তায় এ গল্পটি জনজীবনের কোন স্তরকে ছুঁয়ে গিয়েছিল আজকের দিনে ভাবতে অবাক লাগে'।[৯] লেখকপুত্র উত্তম ঘোষের স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায়, কোনো এক বাস চালক গল্পটি পড়ে আবেগে আত্মহারা হয়ে বলেছিল, 'পরশুরামের

কুঠার পইড়্যা আনন্দবাজারের বর্মণ স্ট্রীটের অফিসে ছুইট্যা গেসিলাম। পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করসি; কইসিল্যাম, স্যার এইরকম গল্প কি কইরা ল্যাখেন–?'[১০] আলোচ্য গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র কয়লাখনি অঞ্চলের ক্রমপসারিত একটি জনপদ নয়াবাদের একজন প্রান্তীয় অধিবাসিনী ধনিয়ার মনস্তাত্ত্বিক সংকট চিত্রণে সুবোধ ঘোষ দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন। গল্পে আত্মিয়পরিজনহীন ধনিয়ার দুটো রূপ, একদিকে সে সদ্য পরিচিত পুরুষকে দেহদান করে, অন্যদিকে সে দুগ্ধপোষ্য শিশুদের মাতৃস্তন্য পান করিয়ে সবল করে তোলে। 'সভ্যসমাজ তার প্রথম পরিচয়কে মন্যতা দিতে চাইলেও দ্বিতীয় পরিচয়টিই যে তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথাগ্রন্থনার সূত্রে ঝরে পরে এই নিষ্কর্ষ।'[১১] আত্মীয় পরিজনহীন এই ধনিয়া রাতের অন্ধকারে নিষিদ্ধ ভুবনে বহু পুরুষের সঙ্গ লাভ করলেও দিনের আলোয় সে ভদ্রপাড়ার অনেক বাড়ির দুধ-মা হিসেবে পরিচিত। ভদ্রপাড়ায় নারী-পুরুষেরা ধনিয়া সম্পর্কে নানা কথা বললেও তার অন্ধকারময় জীবনের বিচরণ অব্যাহত থাকে। গল্পের প্রথমাংশ এভাবে অতিবাহিত হলেও এর 'দ্বিতীয়াংশ আরও মারাত্মক ও মর্মান্তিক।'[১২] এক কুৎসিত জীবনবৃত্ত থেকে উঠে এসে বাড়ি বাড়ি ধাই এর কাজ নিয়ে জীবিকা নির্বাহ করত যে ধনিয়া, একদিন তার মসৃণ জীবনপথে প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে এল সাগরপাড়ের বিলিতি ফুড। বিলিতি ফুডের কাছে পরাজিত ধনিয়ার স্তন্যদুগ্ধের অপমান সে স্বাভাবিক বলেই ধরে নেয়। ভদ্রপাড়ার কর্তাব্যক্তিরাও তাকে আর গ্রহণ করতে সম্মত হয় না; উত্তেজিত হয়ে বলে, 'মাগী যে কখন কার সর্বনাশ করে বসে কে জানে।'[১৩] ভদ্রসমাজের জীবন-বৃত্তের অন্তঃসারশূন্যতার চিত্র ভাষার সূক্ষ্ম মোচড়ে এখানে প্রকাশ পেয়েছে। যে সমাজ তাকে প্রয়োজনে তাদের নৈকট্যের অধিবাসী করে তুলেছিল, সেই নিষ্ঠুর ভদ্রলোকি সমাজ-মানসিকতার কারণে তাকে পুনরায় ফিরে যেতে হয় পূর্বের অসামাজিক জীবন প্রতিবেশে, এক নিষিদ্ধ গণিকালয়ে। বস্তুত 'মানুষের অবনমন যে কতদূর যেতে পারে, এই গল্পে সুবোধ তাই দেখিয়েছেন।'[১৪] তাই গল্পের অন্তিমে আশি বছরের অথর্ব, প্রৌঢ়, জীবনের অর্ধেকের অধিক সময় যে অতিবাহিত করেছে কারাগারে সেই প্রসাদী ডোমের কাছে ধনিয়া দমবন্ধ অভিমানে কেঁদে সারা হয়েছে। ধনিয়ার মনস্তাত্ত্বিক সংকটের চিত্র লেখক অসাধারণ নাটকীয় রীতির মাধ্যমে গল্পে উপস্থাপন করেছেন এভাবে :

> ধনিয়া কাঁদছে। এ কান্নার বেদনা বিদ্যুতের ছোঁয়াচের মতো প্রসাদীকে যেন আঘাত করলো। ধড়ফড়িয়ে উঠলো শরীরটা।
>
> –একি ? তুই ধনিয়া ? হাঁ চাচা। আমার জাত নেই, আমি নাকি রাণ্ডী !
>
> ছি ছি, একি বলছিস !
>
> হাঁ চাচা, আমাকে নাম লেখাতে হয়েছে। কাল থেকে বাজারে থাকতে হবে।
>
> আরে না, তুই তো লছমী।
>
> না চাচা, আমার স্বামী নেই।
>
> কোন গাইয়ের স্বামী নেই, তারা কি লছমী নয় ?

> তা বললে চলে না, আমি তো গাই নই।
>
> --- সর্বাঙ্গ ছাপিয়ে এক বিদঘুটে আনন্দের জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠলো ধনিয়া। তবু প্রতীক্ষায় শান্ত হয়ে থাকে। সে আজ দাঁড়িয়ে থাকবে মাঝরাত্রি পর্যন্ত, শেষরাত্রি পর্যন্ত-যতক্ষণ না তার নতুন জীবনের প্রথম বাবু দোরে এসে কড়া নাড়বে, তার নতুন নাম ধরে ডাকবে।[১৫]

সংবেদনশীল গল্পকার সুবোধ ঘোষ গল্পের সমাপ্তিতে ধনিয়ার বৃত্তিগত মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা যেভাবে উন্মোচন করেছেন, তাতে 'গোপন কাঁটার মতো বিদ্ধ করে কেবলই।'[১৬] সমাজের প্রান্তিক এই নারীর বিচিত্র জটিল মনস্তাত্ত্বিক সংকট এবং আবেগ-উষ্ণতার প্রতিভাস অত্যন্ত তীব্রতায় গল্পে প্রতিফলিত হয়েছে। গল্পটিকে চলচ্চিত্রায়িত করেছিলেন যে নবেন্দু চট্টোপাধ্যায়, তিনি বলেছেন :

> 'পরশুরামের কুঠার' চল্লিশ-দশকের কতিপয় শ্রেষ্ঠগল্পের একটি। আমরা এক অবধারিত, অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ধাবিত হচ্ছি। মানুষ যখন আর নিজের মধ্যে স্থির থাকতে পারছেনা, যখন সে স্বধর্ম থেকে বিচ্যুত হচ্ছে, তখনই পরশুরামের কুঠার এর মতো কাহিনী নিয়ে সুবোধ ঘোষের অনিবার্য উপস্থিতির প্রয়োজন হচ্ছে। তিনি আমাদের অবলম্বন হচ্ছেন, দাঁড়াচ্ছেন আমাদের পাশে। সমাজের ভণ্ড অশুভশক্তির উপর কুঠারাঘাতের প্রয়োজন।[১৭]

বস্তুত এ গল্পে লেখক একদিকে যেমন মধ্যবিত্ত সমাজের নীতিবোধ ও মূল্যবোধের চরম অবক্ষয়ের কথা বলেছেন, তেমনি তুলে ধরেছেন ধনিয়া চরিত্রের পরিশুদ্ধ মানবিক দিকটি।

পতিতা নারীর ছদ্ম পরিচয়ে গৃহবধূতে উপনীত হবার ফলে তার যে মানসিক জটিলতা তৈরি হয় তাই নিয়ে সুবোধ ঘোষ রচনা করেছিলেন বিখ্যাত গল্প "বারবধূ"[১৮] (১৯৪৩)। বস্তুত এ গল্পে নারী-মনস্তত্ত্বের এক জটিল স্বরূপ উদঘাটিত। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র বারবিলাসিনী লতা। লেখক সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ থেকে লতার অন্তঃস্তলের গ্রন্থিগুলোকে সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করে তার মানসিক জটিলতার চিত্র অত্যন্ত সুকৌশলে চিহ্নিত করেছেন। প্রসাদ রায় নামক এক জমিদারের সঙ্গে লতার ছদ্ম দাম্পত্য জীবন-যাপনের কাহিনী এ-গল্পের বহিরাবরণ, আর অন্তর্লোকে স্পন্দমান তার যন্ত্রণা, বিক্ষোভ, অতৃপ্তি ও হাহাকারমথিত বেদনাময় চৈতন্যের করুণ উপস্থিতি। লতার জীবন-অভীপ্সা, আত্মজিজ্ঞাসা ও অস্তিত্ব-চেতনার স্বরূপসত্য এ গল্পে বিধৃত হয়েছে। গল্পে দেখা যায়, জমিদার প্রসাদ রায়ের রক্ষিতা তারকেশ্বরের পঞ্চীবিবি প্রতিবেশীর নিকট এক সন্ধ্যায় কপট বধূবৃত্তির অভিনয় করতে গিয়ে পরিচিত হয়ে যায় প্রসাদ রায়েরই স্ত্রী লতা হিসেবে। গণিকা হলেও প্রসাদের অনুরোধে সে প্রসাদের আত্মীয়-স্বজনের সামনে ঘরণীর পরিচয় দেয়। প্রসাদের সম্মান রক্ষার্থে সকলের সামনে লতা সহজ স্বাভাবিকভাবে কথাবার্তা বলে আলাপ পরিচয় করে। তবু এই অভিনয়গুলো বারবনিতা লতাকে ধীরে ধীরে যেন পরিবর্তিত করে দেয়। তাই সামাজিক আভিজাত্যের অন্তরালে মুখোশধারী প্রসাদ রায়ের

ভ্রমরবৃত্তিসুলভ ভীরুতাকে কটাক্ষ করতেও কুণ্ঠিত হয়নি লতা– 'ডুডু খাবে খোকা ? ভদ্দরলোকের বুক ভয়ে দূর দূর করে, বুকের পাটা নেই ; মেয়ে মানুষ রাখার শখ কেন ? শ্যাম রাখি কুল রাখি দুই-ই একসঙ্গে হয় না।'[১৯] বারবধূর পেশাদারিত্ব সে যথাযথভাবে পালন করলেও বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, লতা সেই প্রশস্ত 'বুকের পাটা'র প্রত্যাশী, যে কিনা পতিতা বলে নয় ; শ্রেয়সী নারী হিসেবে লতার ভালোবাসাকে সম্মান জানাবে। নীরদচন্দ্র চৌধুরী তাঁর *বাঙালী জীবনে রমণী* গ্রন্থে বলেছেন, 'বাঙালী তথা ভারতীয়দের প্রেমহীন যৌন জীবন তলপেটের চাহিদা পূরণ করলেও মনের ঘর থাকে সম্পূর্ণরূপে অপূর্ণ।'[২০] সেই অপূর্ণ মনের ঘরের মানমর্যাদার চাবি কখনো কখনো যে বারবধূদের হাতে চলে যায় তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত লতার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে গল্পে আবির্ভূত বিধবা নারী আভার আকস্মিক ও নাটকীয় আগমন। একদিকে সামাজিক কুল-ললনার প্রতি আকর্ষণ অন্যদিকে পতিতার প্রেমের হাত থেকে মুক্তির নিশ্চিত নির্ভয় আশ্রয় অন্বেষণে প্রসাদের মানসিক দ্বন্দ্ব গল্পটিকে জটিল মনস্তাত্ত্বিক জায়গায় এনে দাঁড় করিয়েছে এবং এভাবে লেখক তাঁর বক্তব্যকে বিশ্লেষণ করেছেন। শেষ পর্যন্ত প্রচুর টাকার বিনিময়ে লতাকে বিদায় নেবার প্রস্তাব দেয় প্রসাদ। বিদায় নেবার আগে প্রসাদের এই উঁচু দরের প্রেমের অহংকারের ওপর অমর্যাদার ঘৃণার থুথু ছিটিয়ে দিয়ে একটি প্রতিশোধ নেবার স্পৃহা জাগে লতার। আভার কাহিনী জানা থাকায় ক্ষুব্ধ লতা সরাসরি আভার সঙ্গে সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে চাইলেও দীর্ঘদিন প্রসাদের স্ত্রীর ভূমিকায় অভিনয় করে সে তার পূর্বের কলাবিদ্যা আর গ্রহণ করতে পারে না। তাই বিদায়মুহূর্তে প্রসাদ যখন এক তাড়া নোট তার হাতে দিয়ে বলে যে 'আমি তো তোমাকে কখনো ঠকাইনি, ক্ষতি করিনি'[২১] তখন এর উত্তরে লতা এক অধিকারবঞ্চিত রমণীর মতো অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে জানায়–'না, তুমি ক্ষতি করনি ; আভা ঠাকুরঝি আমার এই সর্বনাশটা করে ছাড়লো।'[২২] বস্তুত 'বারবধূর জীবনে গৃহবধূর অভিনয় কি করে সত্যিকারের জীবনাকাঙ্ক্ষায় পরিণত হয়ে বেশ্যা পঞ্চীবিবির অন্তরে লতা বৌদির জন্ম হয় তারই মনস্তাত্ত্বিক উদঘাটনে গল্পটি অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের হয়ে উঠেছে।'[২৩] সমালোচক যথার্থই বলেছেন :

> অর্থনীতি নিয়ন্ত্রিত সমাজব্যবস্থায় মানুষের নৈতিক অবক্ষয়, কৃত্রিম মর্যাদাবোধের মুখোশে ঢাকা মধ্যবিত্ত বাঙালির সুবিধাবাদী চরিত্র, ব্যতিক্রমী মানবমনের অতলান্তিক ক্লেদাক্ত মনস্তত্ত্বের সুনিপুণ বর্ণনায় সুবোধ ঘোষের 'বারবধূ' একমুখীন লক্ষ্যে ব্যঞ্জনা প্রধান ছোটগল্প।[২৪]

আসলে সমাজভিত্তি এবং হৃদয়ের অন্তর্গূঢ় যন্ত্রণা-আর্তি-প্রত্যাশা–এই দ্বিবিধ স্রোতের দ্বন্দ্ব- বৈপরীত্য লতার মধ্যে অপরিমেয় শূন্যতা ও হাহাকার সঞ্চার করেছে। ফলে গল্পের সমাপ্তি অংশে লতার নিরবলম্ব অস্তিত্ব উন্মোচনের অনুষঙ্গে লেখক পরিবেশ ও পরিস্থিতিতাড়িত নারীজীবনের অন্তঃসারশূন্য জৈবনিক ও মানসিক অবস্থাকে বিন্যস্ত করেছেন।

"বারবধূ"র সম্পূর্ণ বিপরীত শ্রেণির গল্প "পঙ্কতিলক" (১৯৫৫)-এও লেখক নারীর বিচিত্রমুখী মনস্তাত্ত্বিক সংকটের চিত্র তুলে ধরেছেন, তবে এখানে কোনো গণিকার মানসিক জটিলতা উঠে আসেনি বরং গণিকালয়ে বসবাসের পূর্ববর্তী এক ভদ্রগৃহস্থ পরিবারের অনূঢ়া ত্রিশ উত্তীর্ণ মানসীর মনোগহনের নিখুঁত বাস্তব আলেখ্য পরিবেশিত হয়েছে। আলোচ্য গল্পে দেখা যায়, রমেশ নামক এক সুদর্শন যুবক রুমালে উগ্রসুগন্ধী, আয়রন করা ফিটফাট পাঞ্জাবি গায়ে আর হাতে এক তোড়া রজনীগন্ধা নিয়ে গণিকালয়ে প্রবেশ করতে গিয়ে ভুল করে মানসীর গৃহে আশ্রয় নিয়েছে। মানসীর ভাই ভানুমিত্রের অনুপস্থিতিতে রমেশের আকস্মিক আগমনকে মানসী অসম্মতি জানালেও তাকে এই পঙ্কিল জীবনপথ থেকে বিরত থাকতে অনুরোধ করে। এই অনুরোধটুকুর মধ্যে আছে একধরনের বিশ্বাস; এই বিশ্বাসটুকুর মর্যাদা রাখতে চায় রমেশও। এরপর মানসী রমেশের আচরণ ও ব্যবহারে এক আকর্ষণ অনুভব করে। কেবল তাই নয়, তার কাছ থেকে আসে বিয়ের প্রস্তাব। বিয়ের প্রস্তাব পেয়ে মানসীর মনে দ্বন্দ্বের সূচনা হয়। মানসিক দ্বন্দ্বে ক্ষত বিক্ষত মানসী নিজের কাছেই প্রশ্ন করে যে কি পার্থক্য প্রথম ও দ্বিতীয় মানুষের মধ্যে। প্রথম যে একদিন পথ ভুল করে তাদের বাড়ি এসেছিল এবং দ্বিতীয় যে তাকে বিপুল অর্থের বিনিময়ে প্রায় ক্রয় করে নিয়ে যেতে চায়। বিচিত্রমুখী মানসীর এরূপ মানসিক জটিলতার সাবলীল উপস্থাপনায় সুবোধ ঘোষ তাঁর প্রাতিস্বিক প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছেন। মূলত 'মানসীর অন্তর্দ্বন্দ্ব ও মূল্যবোধের সংকট এ গল্পের মূলকথা'[২৫] হলেও 'গল্পটিতে একই সঙ্গে লেখক ক্ষয়িষ্ণু সামন্তসংস্কৃতি ও বুর্জোয়া নীতিবোধের ওপর শৈল্পিক ঘৃণা ছুঁড়ে দিয়েছেন।'[২৬] "বারবধূ" গল্পে লতার যে উত্তরণ লক্ষ করা যায়, এই গল্পে পঙ্কময় জীবনের অন্ধিসন্ধিতে আলো ফেলে লেখক রমেশের সেই জাতীয় উত্তরণ দেখিয়েছেন। প্রেম, সহানুভূতি, ঈর্ষা, বাৎসল্য প্রভৃতি মৌলিক মানবিক বৃত্তিগুলো যে ঘটনা ও পরিস্থিতি-নিয়ন্ত্রিত, এই সংশ্লেষ নির্মাণই লেখকের অন্বিষ্ট।

সমাজের দৃষ্টিতে অপাঙক্তেয় নিষিদ্ধ পল্লিবাসী এক নারীর মনস্তাত্ত্বিক সংকট আর জটিল টানাপড়েনের দৃষ্টান্ত "স্নানযাত্রা"[২৭] (১৯৫৯) গল্প। এ গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র বটেশ্বরপুরের মেলাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা একটি পতিতাপল্লির দেহপসারিণী সোনালীকে ঘিরে এর আখ্যানভাগ নির্মিত হয়েছে। গল্পের নায়ক সেবাব্রত পূতচরিত্র ইন্দুনাথ এ নিষিদ্ধ পল্লিকে উচ্ছেদ করতে গিয়ে নিজেই মুগ্ধ হয়ে যায় বারাঙ্গনা সোনালীর রূপে। নানা প্রতিরোধ দূরে ঠেলে ইন্দুনাথ এ পল্লির ভিটেমাটি পর্যন্ত বন্ধক রেখে তার কর্তব্য পালন করতে থাকে। এমনকি এক মাস ব্যবসা বন্ধ রাখার জন্য পতিতাদের কাছে গিয়ে সে রিলিফ পর্যন্ত দেয়। ইন্দুনাথের এমন মহৎ কাজে অনুপ্রাণিত হয়ে সোনালী তার সমস্ত বিলাস ছেড়ে রিলিফের খাবার খায় ও সরল জীবনযাপন করে। মেলা সমাপনের পূর্বদিন সমস্ত কর্তব্য সম্পাদন করে ইন্দুনাথ যখন তার গন্তব্যে যেতে উদ্যত হয় তখন সোনালীও তার সঙ্গে যেতে প্রস্তুত

হয়। কিন্তু ইন্দুনাথ তার মনের প্রকৃত ইচ্ছের কথা বুঝতে পারে না। ফলে ব্যর্থ সোনালী ফিরে যায় তার পূর্ব পেশায়। এখানে ইন্দুনাথের আদর্শের অসম্পূর্ণতাকে যেমন এক সামান্য পতিতা চোখে আঙুল দিয়ে প্রকৃত সত্যকে উন্মোচন করেছে তেমনি প্রকাশ করে দিয়েছে এক শিক্ষিত সেবাব্রতীর আত্মপ্রতারণা ও চরিত্রগর্বের অন্তঃসারশূন্য অভিমানকে। একজন পতিতার হৃদয় যন্ত্রণা, নীড় বাঁধার স্বপ্ন, পঙ্ক জীবন থেকে মুক্তির ব্যাকুলতা আর অসহায়তার বেদনাবিদ্ধ চিত্র অঙ্কিত হয়েছে "স্নানযাত্রা" গল্পে। এ গল্পে বিধৃত চরিত্রের বিচিত্রমুখী মনস্তত্ত্ব প্রসঙ্গে সমালোচক তাই যথার্থই বলেছেন :

> প্রসঙ্গত ইন্দুনাথ ও পূর্ণিমার (সোনালী) চরিত্রের সমস্ত পরিবর্তনগুলিকে লেখক দেখিয়েছেন মনস্তত্ত্বসম্মতভাবেই। ইন্দুনাথের সিদ্ধান্ত নেবার অক্ষমতা আর মধ্যবিত্তসুলভ মানসিকতা এবং পূর্ণিমার নিজস্ব বৃত্তিত্যাগের আকুলতা ও পরে মোহভঙ্গ ও ইন্দুনাথের প্রতি শাণিত বিদ্রূপ-সমস্তই শক্তিমান লেখকের চরিত্র মনোগহনে অবগাহনের প্রচণ্ড ক্ষমতারই পরিচায়ক।[২৮]

আসলে পতিতাদের নিয়ে রচিত এসকল গল্পে সুবোধ ঘোষ তাদের বৃত্তিগত যন্ত্রণার বাস্তব চিত্র যেমন উন্মোচন করেছেন, তেমনি বিশ্লেষণ করেছেন নারীর পদস্খলন। তাই 'নারীর মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে দরদ-আবেগ কোথাও অস্ফুট থাকে নি।'[২৯]

বৃত্তিগত মনস্তত্ত্বের পাশাপাশি মানুষের শ্রেণি-মনস্তত্ত্বও সুবোধ ঘোষের গল্পে বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে মধ্যবিত্তশ্রেণির মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব, জটিলতা, ভণ্ডামি, বিকৃতি আর অসঙ্গতির অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণে সমৃদ্ধ সুবোধ ঘোষের বেশ কিছু গল্প। শিক্ষিত অথচ ছিন্নমূল মধ্যবিত্তের বহুমাত্রিক অন্তর্দ্বন্দ্ব আর মানসিক টানাপড়েনে ক্ষত-বিক্ষত নর-নারীর সামাজিক অভিমুখ ও বিচিত্রমুখী মনস্তত্ত্ব নির্মাণে তিনি ছিলেন ক্লান্তিহীন এক সাহিত্যিক। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট সমালোচক শিবশংকর পাল বলেন :

> প্রথম থেকেই তিনি মধ্যবিত্ত মন-মানসিকতার চরম সমালোচক মাত্র নন, চিকিৎসকও। প্রয়োজন মতো লাঠ্যৌষধ প্রয়োগ করতেও কসুর করেন নি। কোন কোন গল্পে তিনি মধ্যবিত্ত শ্রেণীটিকে নিয়ে গেছেন লাশকাটা ঘরে। চিরে চিরে দেখিয়েছেন রক্তের অসুখ কোনখানে, কীভাবে এবং কেন। তাঁর এই শল্যচিকিৎসকের ভূমিকা যতখানি নির্মম ততখানিই নিরাময়প্রবণ।[৩০]

সুবোধ ঘোষ মধ্যবিত্ত শ্রেণির মনস্তত্ত্ব অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। দেখেছিলেন, আর্থিক বিবেচনায় এ শ্রেণি 'আনস্টেবল' বলেই চিন্তাগত দিক থেকে এরা দোদুল্যমান। ভড়ং সর্বস্বতা, মর্যাদাবোধের অভাব, পরশ্রীকাতরতা, প্রগতিশীলতার ছদ্মবেশ ধারণ, ঠুনকো সৌন্দর্যবোধে আস্থা এসবই তার মনস্তত্ত্বগত উপাদান। মধ্যবিত্তজীবনের এসকল মনস্তাত্ত্বিক অসঙ্গতি, বিকার, নির্বেদ, অন্তঃসারশূন্যতা ও অনন্বয় বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনায় উন্মোচিত হয়েছে সুবোধ ঘোষের গল্পে। এ প্রসঙ্গে তাঁর '"গোত্রান্তর", "নির্বন্ধ", "তিন অধ্যায়", "অনধিকার প্রবেশ" প্রভৃতি গল্পের কথা স্মরণ করা

যায়। "গোত্রান্তর" (১৯৪০) গল্পে মধ্যবিত্তবর্গের মনস্তাত্ত্বিক বিচ্যুতি ও স্বার্থপরতা অত্যন্ত সূচিতীক্ষ্ণ শ্লেষে উদ্ভাসিত হয়েছে। গল্পের শুরুতেই নিজস্ব ভাষায় সুবোধ ঘোষ সঞ্চারিত করে দিয়েছেন এই বার্তা, স্নেহ-প্রেম সবই সংসারে পণ্যমাত্র। মধ্যবিত্তশ্রেণি বাস করে এক স্বতঃআরোপিত মুখোশের আড়ালে, প্রাণপনে বাঁচিয়ে রাখতে চায় ছোঁয়া-বাঁচানো দূরত্ব। অথচ এই অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখাই যখন দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে এ শ্রেণির, তখন তার মনস্তত্ত্বে দেখা দেয় বিবিধ জটিলতা আর টানাপড়েন। মধ্যবিত্তের মনস্তাত্ত্বিক অভিব্যক্তিকে সামনে রেখে গল্পকার এই বিশেষ শ্রেণির বিচ্যুতি ও স্ববিরোধিতাকে তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষকের মতো বিশ্লেষণ করেছেন সঞ্জয়ের দ্বন্দ্বক্ষত চরিত্র ও অবয়বের মধ্য দিয়ে। আলোচ্য গল্পে সঞ্জয় স্বার্থান্ধ মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতীক। গল্পে সে-ই একমাত্র জীবন্ত চরিত্র যাকে কেন্দ্র করে এর কাহিনী আবর্তিত হয়েছে। গল্পের প্রথমাংশে সঞ্জয়ের ভগ্ন পারিবারিক অবস্থা, তার ছাত্রজীবন, দুঃসহ ও কঠোর দারিদ্র্য, পারিবারিক স্নেহ-মমতা, বাৎসল্য ও আনুগত্য ইত্যাদি মানবিক হৃদয়বন্ধনের নিগূঢ় রহস্য সম্পর্কে তার উপলব্ধি, প্রেম ও প্রণয় সম্পর্কে তার নিজস্ব অনুভূতি প্রভৃতির বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ রয়েছে। এ গল্পে সে তার উচ্চাশা পূরণে ও ভাগ্যান্বেষণে মধ্যবিত্তসুলভ মানসিকতায় অগ্রসর হয়েছে। এম. এ. পাশ করে সে একটি সমমর্যাদার চাকুরি চেয়েছে, সীমাবদ্ধতার ঘেরাটোপে নিশ্চিন্ত জীবন যাপন করতে চেয়েছে। এমনকি প্রেমিকা সুমিত্রাকে নিয়ে ভবিষ্যৎ গার্হস্থ্যজীবন যাপনের স্বপ্নও দেখেছে। কিন্তু বেকারত্বের নির্মম কশাঘাতে তার জীবনে যে নৈরাশ্যের শুরু, তা মধ্যবিত্ত সমাজজীবনেরই অভিশাপ। সঞ্জয় এই নৈরাশ্যপ্রবাহে ভাসমান এক খণ্ড তৃণ। তাই বেকার জীবনের দুঃসহ গ্লানি তার মানসিকতায় যে পরিবর্তন এনেছে তা সুস্থ ও স্বাভাবিক নয়। পিতা-মাতার বাৎসল্য ভাই-বোনের স্নেহ, প্রেমিক-প্রেমিকার প্রেমস্নিগ্ধতায় অবিশ্বাস মানুষকে শূন্যতার অতল গর্ভে নিমজ্জিত করে, সেখান থেকে আর ফিরে আসার পথ থাকে না। গল্পে সঞ্জয়ের জীবনযাপনেও তাই আপাত বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। তাই সে পথভ্রষ্ট, দিকভ্রান্ত হয়ে নিজেকে, নিজের মধ্যবিত্ত সত্তাকে এমনকি তার শিক্ষা-দীক্ষাকে নিঃশেষে বিলীন করে দেওয়ার জন্য এক আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। ত্রিশ টাকা বেতনের ক্যাশ মুন্সির চাকরি নিয়ে সে চলে এসেছে রতনলাল সুগারমিলে। বাড়ির সকলের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করে একাকী জীবন শুরু করলেও মধ্যবিত্তসুলভ মানসিকতা সে ত্যাগ করতে পারেনি। তাই স্বীয় অবস্থান পরিত্যাগ করে রায়বাহাদুরের আশ্বাসে উদ্দীপিত হয়ে সে উচ্চ স্তরে উন্নীত হতে চেয়েছে। সুযোগসন্ধানী ভোগ-বাসনাকে পরিতৃপ্ত করার জন্য সে রুক্মিণীর দেহ ভোগ করেছে, কিন্তু অনাগত সন্তানকে স্বীকৃতি দিতে চায়নি। আবার গল্পের শেষাংশে বাচনিক উদ্ভাসনে ব্যঞ্জিত হয়েছে তার মধ্যবিত্তের দ্বন্দ্ব ও বিশ্বাসঘাতকতার স্বরূপ যেখানে রায়বাহাদুরের কাছে বিপ্লবের কর্মসূচি প্রকাশ করে বকশিশ ও ভালো বেতনের চাকরির আশ্বাস নিয়ে পালাতে গিয়ে ঘোড়া থামিয়ে এক স্রোতের ধারে বসে জল পান করার মাধ্যমে। সেখানে সঞ্জয় দেখে 'গেরস্থের মুর্গি চুরি করে একটা শেয়াল ভেজা বালির ওপর বসে গোঁপের রক্ত চাটছিল।

সেও জল খাবার জন্য স্রোতে মুখ নামালো'।[৩১] এখানে 'শেয়ালের সঙ্গে সঞ্জয়ের গোত্রবদ্ধতা অন্তর্বয়নের গ্রন্থনাকে পোক্ত ও বৈচিত্র্যময় করে তুলেছে'।[৩২] বস্তুত সঞ্জয় আর শেয়াল এখানে সমধর্মী, তাই মধ্যবিত্তের মনস্তাত্ত্বিক বিচ্যুতি আর অসঙ্গতিকে লেখক শেয়ালের সঙ্গে তুলনা করে এ শ্রেণির বিচিত্রমুখী মনস্তত্ত্বের পরিচয় গল্পে তুলে এনেছেন।

মধ্যবিত্ত মনস্তত্ত্বের স্বরূপ উন্মোচনকারী লেখক সুবোধ ঘোষ আত্মপ্রতারক মধ্যবিত্তের ভীরুতা এবং তাদের মানসিকতার রূপদানে সিদ্ধহস্ত। অন্যায়ের সাথে আপস বা সুবিধাবাদী অবস্থানে নিজেকে ধরে রাখার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা এ শ্রেণির মনস্তত্ত্বে সতত ক্রিয়াশীল। এরূপ বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে রচিত হয়েছে "নির্বন্ধ"[৩৩] শীর্ষক গল্পটি। এ গল্পের পটভূমি চিত্রপুর থানাকে ঘিরে আবর্তিত। এ থানার দারোগা বিভূতির মনস্তাত্ত্বিক সংকট গল্পে অসাধারণ ভঙ্গিতে উপস্থাপিত হয়েছে। কর্তব্যনিষ্ঠায় আর সততায় যে দারোগা বিভূতিকে গল্পের প্রথমাংশে উন্মোচন করেছেন লেখক, সেই বিভূতির আকস্মিক মানসিক পরিবর্তন গল্পের শেষে বিরাট নাটকীয়তা এনে দিয়েছে। মুখ্যত 'হৃদয়ের মানবিক কোরকপুঞ্জ এক আকস্মিক প্রলোভনের বিষবাষ্পে কীভাবে বিশুষ্ক আর বিধ্বস্ত হয়ে এক দ্বিতীয় বিকৃত সত্তা নিয়ে নবজন্ম লাভ করে তার উদাহরণ বিভূতি।'[৩৪] অরণ্যরাজ্য চিত্রপুর এলাকার অত্যাচারী জমিদার-ব্যবসায়ী টিকাইত ধনঞ্জয় গোঁসাইকে তার স্ত্রীর খুনের অপরাধে গ্রেফতার করে বিভূতি। একজন দায়িত্বশীল কর্তাব্যক্তি হিসেবে বিভূতি তার কর্তব্যকর্ম পালন করলেও এই সততার ভেতরেই প্রবেশ করে গোঁসাই প্রদত্ত ঘুষ গ্রহণে অসৎ মনোবৃত্তি আর তারই পরিপ্রেক্ষিতে তার সত্যনিষ্ঠায় ঘটে ছন্দপতন। তাই নব্বই টাকার বিভূতি দারোগা প্রকৃতই হেরে যায় চিত্রপুরের টিকাইত ধনঞ্জয় গোঁসাইয়ের প্রস্তাব আর ধমকের কাছে। লেখক সে চিত্র অঙ্কন করেছেন এভাবে :

> গোঁসাই বলে, শোন বিভূতিবাবু, সোজা কথা, সোজা রাস্তা। নগদ নগদ দিয়ে দিচ্ছি, দু'হাত ভরে দিচ্ছি। রাজি হওতো বল, নইলে কেরানীবাবু চললো সদরে। বিভূতি একবার উঠে দাঁড়ালো। চোখ দুটো বাষ্পায়িত আকাশের মত ম্লান। বিভূতির মনে হলো, কড়ে খাঁ এইবার সত্যিই পেনসন নেবে। ও শরীরে আর শক্তি সামর্থ্যের কোনো নিশানা নেই।[৩৫]

এভাবে সুবোধ ঘোষ আত্মপ্রতারক মধ্যবিত্তের মনের ব্যবচ্ছেদ করেছেন।

মধ্যবিত্তের পলায়নপরতা আর আত্মকেন্দ্রিকতার অসাধারণ মনস্তাত্ত্বিক বিন্যাস ঘটেছে "অনধিকার প্রবেশ"[৩৬] গল্পে। বস্তুত 'আগাগোড়া বর্ণনাত্মক এই গল্পটিতে শুধু মধ্যবিত্ত সমাজ নয়, মধ্যবিত্ত মানসিকতার লেখকদেরও ছদ্মবেশ খুলে দিয়েছেন'[৩৭] সুবোধ ঘোষ। আলোচ্য গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র প্রিয়তোষ শ্রমিক শ্রেণির প্রত্যক্ষ জীবন-বাস্তবতার অভিজ্ঞতা নিয়ে গল্প লিখবে বলে শ্রমিক বস্তিতে

আড়াই হাজার টাকার ভাড়া-ঘরে বাস করে। বাস্তববাদী লেখক প্রিয়তোষ গোত্রমোহ কাটিয়ে উঠবার জন্য বস্তির লোকের সঙ্গে তাড়ি পর্যন্ত খায়, এমনকি আনুষঙ্গিক দোষও সে অর্জন করে। ঘটনাচক্রে বস্তিরই এক শ্রমিক গৌরবাবুর যুবতী কন্যা তাকে ভালোবাসে। প্রিয়তোষের মনস্তত্ত্বে আকস্মিক ছন্দ পতন ঘটে তখনই যখন বস্তির তথাকথিত অশিক্ষিত লোকেরা প্রিয়তোষ-বেলার সম্পর্ক নিয়ে অসামাজিকতার প্রশ্ন তোলে। বিচলিত, বিভ্রান্ত প্রিয়তোষ উপায়ান্তর না দেখে সান্ধ্যকালীন অন্ধকারে একরকম গা-ঢাকা দিয়ে পালিয়ে যায়। "গোত্রান্তর" গল্পের সঞ্জয়ের ন্যায় প্রিয়তোষও সুযোগ বুঝে পালিয়ে গিয়ে তার হীন মানসিকতার যথার্থ প্রকাশ ঘটিয়েছে।

"গুহামানব"[৩৮] (১৯৬৪) গল্পে মধ্যবিত্তের মানস বিশ্লেষণ আরো তীক্ষ্ণ, শাণিত ও বেদনার্ত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। 'আদ্যন্ত রহস্যে ভরপুর এই গল্পে সুবোধ ঘোষ প্রেমের চলিষ্ণু রূপকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন একটি সাধারণ স্তরের মানুষের মধ্যে।'[৩৯] এই মানুষটি দমদমের রায়বাগানের মেটাল কারখানার দেড়শ টাকার সেকেন্ড ক্লার্ক কালীপদ দত্ত। অন্তর্মুখী আর রহস্যময় জীবন যাপনে অভ্যস্ত এ মানুষটির বাড়িটিকে গুহামানবের বাড়ি আখ্যা দিয়েছে পাড়ার ভদ্রলোকেরা। কারণ, এই মাঝবয়সী লোকটি স্ত্রী মারা গেলেই একটি করে বিয়ে করে। নীহারকণা, শান্তিলতা, পারুলবালা একে একে মারা গেছে, আর কালী দত্ত তাদের মৃত্যুর ছ' সাত মাস বাদে আবার বিয়ে করেছে। চতুর্থ স্ত্রী গীতা মারা গেলে কালীদত্ত সে পাড়ারই কোনো এক আত্মীয়ের মেয়ে তমালীকে বিয়ে করলে কারখানার মালিকের কন্যা প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্না কলেজের অধ্যাপক, কুমারী ব্রতের নেত্রী তরুলতা সামন্ত এর কারণ অনুসন্ধানে এগিয়ে আসেন। কিন্তু কালীপদের বাড়িতে গিয়ে নারী স্বাধীনতার যে মধুর চিত্র দেখলেন তরুলতা, তাতে কালীদত্তকে আদৌ দোষ দেওয়া যায় না। তমালীকে ঘর থেকে বের করে আনার যে নিষ্ঠুর সংকল্প নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি, শেষে তাকে ঘরে থাকতেই পরামর্শ দিয়ে নিজে পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে কর্মস্থলে চলে যান। মধ্যবিত্তের মিথ্যা সহমর্মিতা, নির্মম অনুদারতা, সংকীর্ণ মানসিকতা আর কদর্য হৃদয়ের অসাধারণ মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে গল্পটি অন্যবদ্য হয়ে উঠেছে। মূলত গল্পে 'নিভৃতবাসী কালীদত্তের নিস্তরঙ্গ নিরুত্তাপ ও অন্তর্মুখী জীবনযাত্রাকে কেন্দ্র করে রায়বাগানের বাসিন্দাদের মনের ব্যবচ্ছেদ করেছেন গল্পকার।'[৪০]

শ্রেণিবিভক্ত সমাজে পেশা মানুষের মনস্তাত্ত্বিক সংকটকে কিভাবে জটিল করে তোলে তার এক নিপুণ চিত্র অঙ্কিত হয়েছে "তিন অধ্যায়" গল্পে। লেখকের *শ্রেষ্ঠ গল্প* (১৯৪৯) সঙ্কলনের অন্তর্ভুক্ত এ গল্পে 'মধ্যবিত্তের জটিল মানসিকতা পরতে পরতে আলোকিত এবং গল্পের নামকরণ অনুসারেই অধ্যায়গুলি বিন্যস্ত।'[৪১] ছোটখাটো এক মফস্বল শহরকে ঘিরে আবর্তিত এ গল্পের ঘটনাবৃত্তের সময়সীমা বছর

তিনেকের কাছাকাছি। কাহিনীটি প্রথম পুরুষের জবানীতে বিধৃত হলেও কথক এখানে নিছকই পর্যবেক্ষক মাত্র। গল্পের প্রথম অধ্যায়ে উল্লেখ রয়েছে বামুনের ছেলে ফোর্থক্লাসের ছাত্র অহিভূষণের কথা–বন্ধুমহল কর্তৃক অসহায়তার অকূল পাথারে নিক্ষিপ্ত হবার কথা; দ্বিতীয় অধ্যায়ে খানিকটা কার্যকারণহীনভাবেই দেখতে হয়েছে পুলিনবাবু ও বন্দনার একই পরিণতি। তৃতীয় অধ্যায়ে অহি আর বন্দনার বিবাহ বন্ধনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে লেখক চরিত্রদুটোর মনস্তাত্ত্বিক সংকট চিত্রিত করেছেন। আলোচ্য গল্পে যাদের সহপাঠী হিসেবে অহিভূষণ একই স্কুলে পড়ত, পরিণত বয়সে তাদেরই একত্রিত আড্ডায় অহির একমাত্র পরিচয়– সে মিউনিসিপ্যালিটির সর্দার 'স্ক্যাভেঞ্জার' মাত্র। মধ্যবিত্তের অসার জাতিদম্ভের শিকার অহির মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার শুরু সেখান থেকেই। তাই সে চায় তার পদের পরিবর্তন। এরই সূত্রে গল্পে দেখা যায় তার পদের নাম পরিবর্তন করার নিরন্তর প্রচেষ্টা। যদিও সে প্রচেষ্টা তার সফল হয় না ; তবে মানসিক জটিলতায় অহি বন্ধুদের আড্ডার সংস্রব ত্যাগ করে। একইভাবে দ্বিতীয় অধ্যায়ে পুলিন বাড়ুজ্যেকে কেবল জুতার ব্যবসা করার জন্য 'পুলিন-চামারে' পরিণত করে সমাজগর্বিত মধ্যবিত্ত। কেবল তাই নয়, পুলিনবাবুর কন্যা বন্দনার সঙ্গে পাটনার এক অধ্যাপকের বিয়ের সম্বন্ধও তারা ভেঙে দেয়। কেননা বন্দনা হাসপাতালের সেবিকাদের সহকারিনী, গল্পকারের ভাষায় 'জমাদারনী'। কটুক্তি করতেও তাদের সংকোচ হয় না– 'এই ধরনের হাব-ভাব যে-সব মেয়েদের দেখা যায়, যারা ইচ্ছে করেও হাসতে পারে না, চোখ তুলে তাকাতে পারে না, তাদের মতিগতি একটু অ্যানালিসিস করলেই বুঝতে পারবে যে, তারা শুধু চায়।'[৪২] মধ্যবিত্তের হীন মানসিকতা যে কত ভয়াবহ তা গল্পকার এখানে নিখুঁতভাবে উল্লেখ করেছেন। তৃতীয় অধ্যায়ে অহি আর বন্দনার বিয়ের আয়োজন নস্যাৎ করতে মধ্যবিত্ত শ্রেণির একটি অংশ তৎপর হয়ে ওঠে। এখানেও এ শ্রেণির সুযোগ সন্ধানী মানসিকতার চিত্র লেখক পরতে পরতে বিশ্লেষণ করেছেন। যদিও শেষ পর্যন্ত অহি-বন্দনার অটল সিদ্ধান্তের কাছে এ শ্রেণির দুরভিসন্ধিমূলক মনোভাব পরাভূত হয়েছে।

মধ্যবিত্তের মনোবিশ্লেষণের এক অক্লান্ত শিল্পী সুবোধ ঘোষ এ শ্রেণির মনোলোকের অন্তর্গূঢ় জটিলতা, স্ববিরোধিতা, হীনন্মন্যতা, বিকারগ্রস্ততা আর দ্বিধাদীর্ণতার চিত্র উপস্থাপনে শিল্পসাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। এ শ্রেণির ঈর্ষাকাতর আর অসার আত্মম্ভরী মানসিকতার পরিচয় রয়েছে লেখকের "স্বমহিমচ্ছায়া" ও "ঐতিহাসিক বস্তুবাদ" গল্পদ্বয়ে। প্রথম গল্পে মধ্যবিত্তের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা তথা হৃদয়জ কদর্যতার নিখুঁত আলেখ্য পরিবেশিত হয়েছে। গল্পের শুরুতে কাকার সুপারিশে সাধারণ বিদ্যার অধিকারী হয়েও কলকাতার এক বিলাতী সদাগরী অফিসে ছোট সাহেব হয়ে যায় নিখিল মিত্র। দেশী মানুষ হয়ে বিলেতী অফিসের ছোটসাহেব নিখিল পৃথিবীটাকে নিজের ক্রীতদাস ভাবত। কোনো অধস্তন তার মহিমাকে ছাপিয়ে যাবে এটি সহ্য করা নিখিলের পক্ষে অসম্ভব। তাই অফিসের সবাই

যখন তার প্রশংসায় উচ্চকিত, মুগ্ধ ; তখন সি-গ্রেডের টাইপিস্ট হরেন নিয়োগীই ব্যতিক্রম হয়ে গল্পে আবির্ভূত হয়। নিয়োগীর বই পড়া, প্রবন্ধ লেখা, বন্যা ত্রাণকর্মে সহায়তা ও অংশগ্রহণ এবং পাঠাগার কমিটির প্রেসিডেন্ট পদলাভ–ঈর্ষাকাতর নিখিলকে অস্থির করে তোলে। তার ঈর্ষাকাতর মনোভঙ্গি ব্যক্ত হয়েছে নিম্নোক্ত সংলাপে :

> একটা সংবাদ এনে নিখিল মিত্রের মনে আবার একটা কাঁটার খোঁচা বিঁধিয়ে দিয়ে গেলেন নিতাইবাবু। হরেন নিয়োগীর একটা লেখা বের হয়েছে এক পত্রিকায়। ইংরেজী কবিতা সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ। চমকে উঠলেন এবং একটু পরেই সি-গ্রেডের মানুষ সেই হরেন নিয়োগীর টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ালেন নিখিল মিত্র। তারপর কাশলেন এবং একটু হাসলেন। পায়চারি করলেন কিছুক্ষণ, তারপর ঘরসুদ্ধ মানুষকেই যেন প্রশ্ন করলেন-আপনাদের কারও মনের মধ্যে কি কোন বাতিক আছে, কোন বাজে বাতিক ? আই মীন, এইসব কবিতা-টবিতা
> সাহিত্য-টাহিত্য।[৪৩]

এখানে হরেন নিয়োগীর মতো সামান্য টাইপিস্টের বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় মধ্যবিত্ত নিখিল মিত্রের মনোলোকে হিংসা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করেছে। মানব-মনস্তত্ত্বের এক চিরাচরিত বৈশিষ্ট্য হিংসা প্রবৃত্তি যা তার মনোলোকে সংঘটিত হয়ে তাকে কুটিল করে তোলে। নিজ অস্তিত্ব অটুট রাখতে মানুষ অন্যের ক্রিয়াকলাপ কিংবা আচরণ-অভিব্যক্তিকে যখন সহ্য করতে পারে না, তখনই এ প্রবৃত্তির উদ্ভব ঘটে। এ প্রবৃত্তিগত আচরণের শিকার হয়ে মানুষ অবাধ প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণও হয়। আলোচ্য গল্পে মধ্যবিত্ত শ্রেণির যথার্থ প্রতিনিধি নিখিল মিত্র ঈর্ষান্বিত হয়ে নিয়োগীর মতো সামান্য টাইপিস্টের আচরণে আত্মরক্ষার তাগিদেই বাধ্য হয়ে তাকে মানসিকভাবে হেয় করেছে। বলা যায় মধ্যবিত্তের উচ্চাকাঙ্ক্ষী, আত্মম্ভরী হীন মানসিকতা গল্পে এক স্বতন্ত্র মাত্রা এনে দিয়েছে নিঃসন্দেহে।

পূর্বোক্ত গল্পের ন্যায় "ঐতিহাসিক বস্তুবাদ"[৪৪] (১৯৫৫) গল্পেও মধ্যবিত্তের জটিল মানসিকতার চিত্র বর্ণিত হয়েছে; তবে এখানে এক বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্তের সুবিধাবাদী মনোভঙ্গি আর তার হীন স্বার্থপরতা গুরুত্ববহ হয়ে উঠেছে। এ গল্পে ইতিহাসের অধ্যাপক বিমল বসুর ছদ্ম গাম্ভীর্যকে লেখক মনস্তত্ত্বসম্মত দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপন করেছেন। ইতিহাসের সেরা ব্যক্তিত্ব সম্রাট অশোকের ভাবশিষ্য বিমল বসুর অধ্যাপনা, সাজপোশাক আর পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ যে ছাত্রছাত্রী, তাদের কাছে তিনি শোনান, 'আমি ইতিহাসের প্রফেসর নই, আমিই ইতিহাস। ইতিহাস আমার স্বপ্নে, ইতিহাস আমার রক্তে ও স্নায়ুতে'।[৪৫] অশোকের বিমল বসুর প্রতি নিষ্ঠা ও তাঁর বিভিন্ন বাণীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশের মাধ্যমে লেখক গল্পের কাহিনীকে প্রথম থেকেই চিত্তাকর্ষক করে তুলেছেন। অশোকের ভক্ত হিসেবে পরিচয় দিয়ে, ছাত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে এবং শেষ পর্যন্ত তাকে প্রত্যাখ্যান করে এই চরিত্রটির মাধ্যমে

মধ্যবিত্তের সুবিধাবাদী বৈশিষ্ট্যের দিকটিকে তুলে ধরতে চেয়েছেন লেখক। সমালোচক উত্তম রায় তাই বলেছেন :

> পালি ভাষায় বিমল বসুর দেওয়া বিভিন্ন উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যায়–এই শ্রেণি পড়াশোনা করে অনেকটা। কিন্তু জীবনের সেই পাঠ তাদের প্রায়ই ব্যবহৃত হয় অন্যকে ঠকাতে বা নিজের অপরাধকে নানা ফাঁকা আদর্শের বুলি দিয়ে আড়াল করতে। সুবোধ ঘোষের পূর্বলিখিত গল্পের আদর্শের সঙ্গে এই গল্পের তেমন কোনো বিরোধ নেই। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত জীবনে বিশ্বাসের আদর্শে যেহেতু তিনি তার পূর্বাবস্থা থেকে সরে এসেছিলেন, তাই এই মধ্যবিত্ত বিচ্যুতিকে এখানে 'ঐতিহাসিক বস্তুবাদ বা Historical Materialism নামে ব্যঙ্গার্থে অভিহিত করার প্রয়াস লক্ষ করা যায় তাঁর মধ্যে।[৪৬]

তাই অশোকের ন্যায় তিনিও ছাত্রী অনার্য ভীল নারী পালামৌ নিবাসী স্টেলা হেমব্রামকে বিয়ে করবেন বলে মনস্থির করেন। কিন্তু এক আকস্মিক সংবাদে বিমূঢ় হয়ে যায় ছাত্র-ছাত্রীরা ; কারণ অধ্যাপক বসু সকলকে ফাঁকি দিয়ে চিরতরে চলে যান কলকাতায়, সম্পত্তির লোভে এক বিত্তবানের মেয়েকে বিয়ে করতে। গল্পে 'এক বিদ্যাভিমানী অধ্যাপকের হীন স্বার্থপরতা, নীচতা, অর্থলোভ আর সুবিধাবাদী মানসিকতার মুখোশটুকু খুলে দিয়েছেন সুবোধ ঘোষ'[৪৭] ; ফলে গল্পটি মনস্তত্ত্বের সার্বিক বিবেচনায় যথাযথ হয়ে উঠেছে।

মধ্যবিত্তের হৃদয় দৌর্বল্যের বিচিত্র ভাঙাগড়া, তুচ্ছতা, সংকীর্ণ স্বার্থপরতা আর অনুদারতার মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ "আত্মজা" আর "বর্ণচোরা" গল্পদুটি। গোদাবরীর এক শাখাস্রোতের ধারে কুড়িয়ে পাওয়া একটি অন্ত্যজ পরিবারের শিশুকে নিয়ে এক দম্পতির মানসিক টানাপড়েন আর দ্বন্দ্ব সংঘাতের চিত্র "আত্মজা"[৪৮]। উল্লেখ্য, সুবোধ ঘোষের এই গল্পটিকে নিয়ে চলচ্চিত্র করার উদ্যোগে নিয়েছিল তৎকালীন ন্যাশনাল থিয়েটার। শ্রীযুক্ত বিমল রায় একটি চিঠিতে লেখকের নিকট জানতে চেয়েছেন- 'আপনার আত্মজা গল্পটা কি N. T কিনে নিয়েছিল ? ওরা বোধ হয় এখন বার করবে না ; যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাকে জবাব দেবেন। আপনার চিঠি পেলে আমি অন্য বন্দোবস্ত করবো'।[৪৯] গল্পকার কোনো জবাব দিয়েছিলেন কি না জানা না গেলেও এ গল্পে মধ্যবিত্ত উপেনবাবু-চারুবালা দম্পতির হৃদয়ের দ্বন্দ্ব সংঘাত আর মানসিক বিপর্যয়ের জটিলতা তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণে উদঘাটিত হয়েছে। আলোচ্য গল্পে উপেনবাবুর নিজের মেয়ে রমা আর কুড়িয়ে পাওয়া মেয়ে অম্বির প্রতি অপত্যস্নেহের ব্যবধান যেমন চিত্রিত, তেমনি এ স্নেহের অন্তরালে যে তুচ্ছ, সংকীর্ণ মনোভঙ্গি বিদ্যমান তাও উন্মোচিত। অজ্ঞাত পরিচয়হীন একটি মেয়েকে নিজের সন্তানের মতো বড় করে তুললেও মানুষের কাছে পরিচয় দেওয়া হয় এই বলে যে- 'রমা হলো আমার মেয়ে, আর অম্বিকে আমার মেয়ের মতোই মনে করতে পারেন'।[৫০] সর্বদা রমা আর অম্বির মধ্যে এক সতর্ক ব্যবধান রক্ষার চেষ্টা থাকলেও,

উপেনবাবু ও তার স্ত্রী চারুবালার প্রত্যেকটি পরিকল্পনা ব্যর্থ করেই বড় হয়ে উঠেছে অম্বি, হয়ে উঠেছে তাদের নিজের মেয়ের মতোই। ঘটনাচক্রে রমাকে দেখতে এসে পাত্র অধীরের পছন্দ হয়ে যায় অম্বিকে। কিন্তু দুরন্ত অভিমানে অম্বি উপেনবাবুর গায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে জানায় :

> আমার বিয়ে দিও না আপ্পি।
>
> উপেনবাবু–সে কি কথা !
>
> অম্বি বলে–আমাকে পরের বাড়ি পাঠিও না। আমি চিরকাল এখানেই থাকব। যতদিন তোমরা বেঁচে থাকবে ততদিন আমিও বেঁচে থাকব।
>
> চারুবালা বলেন–আবোল-তাবোল কথা বন্ধ করে শান্ত হয়ে বস অম্বি।
>
> অশান্ত, দুরন্ত আর অবুঝ মেয়ের মতো চিৎকার করে বলতে থাকে অম্বি–আমার বিয়ে হবে, রমারও বিয়ে হবে, তারপর তোমাদের দেখবার জন্য থাকবে কে ? আমি বিয়ে করব না আম্মি।[৫১]

অম্বির এই হৃদয়মথিত সংলাপে চারুবালা-উপেনবাবুর তুচ্ছ, সংকীর্ণ মানসিকতা মুহূর্তের মধ্যেই অন্তর্হিত হয়ে যায়। 'তথাকথিত শিক্ষা-সংস্কারের আস্তরণ ভেদ করে দেখা দেয় মননসমৃদ্ধ, নীতি-নৈতিকতায় পূর্ণ দুটি মানুষ'।[৫২] লেখকের অসাধারণ ভাষা প্রয়োগে সেই পরবর্তিত মানুষ দুটির মনের ছবি অঙ্কিত হয়েছে এভাবে :

> একি বলে অম্বি, পূর্ব গোদাবরীর একটা পাতার ঘরের ভিতর থেকে কুড়িয়ে আনা আর শেয়ালের মুখ থেকে ছিনিয়ে আনা অতি অন্ত্যজ একটা পরের মেয়ের প্রাণ? এসব কথা কি একটা মেয়ের মতো মেয়ের প্রাণের উদ্বেগ ? না, মেয়ের-চেয়ে-বড় একটা সত্তার ব্যাকুলতা ? [৫৩]

আসলে অম্বির মানসিক অভিব্যক্তির প্রচণ্ডতার ফলে গল্পে উপেনবাবু দম্পতির মনোজগতের রূপান্তর ঘটেছে।

"বর্ণচোরা"[৫৪] গল্পেও সুবোধ ঘোষের বিচিত্রমুখী মানব-মনস্তত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। এ গল্পে একই সঙ্গে মধ্যবিত্তশ্রেণির মনস্তাত্ত্বিক অন্তর্জটিলতার স্বরূপ যেমন উপস্থাপিত, তেমনি এক শিশু চরিত্রের মনস্তত্ত্বের নানা দিক চিহ্নিত করে লেখক অতি সূক্ষ্মভাবে তা বিশ্লেষণে আগ্রহী ও তৎপর। বস্তুত আলোচ্য গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র 'গোকুকে সুবোধ সাহিত্যে একমাত্র শিশুচরিত্র হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে'।[৫৫] মধ্যবিত্ত শ্রেণির একটি পরিবারে হঠাৎ আশ্রয়প্রাপ্ত ছয় বছরের কিশোর গোকুর মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে সুবোধ ঘোষ তাঁর অসাধারণ সচেতন প্রজ্ঞার পরিচয় রেখেছেন। রবীন্দ্রনাথের 'অতিথি' গল্পের তারাপদ চরিত্রের সঙ্গে তুলনীয় এ চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক অভিব্যক্তি ও আচার-আচরণ বিশ্লেষণে সুবোধ ঘোষ শিশু-মনস্তত্ত্বের যথার্থ রূপকার হিসেবে বিবেচিত হতে পারেন। গল্পে চিত্রিত জগৎবাবুর বাড়িতে হঠাৎ আশ্রয় নেওয়া গোকুর দুরন্তপনা, বায়না আর নানান আবদার ক্রমাগত তার

শিশু-মনস্তত্ত্বের সহজাত বৈশিষ্ট্যকেই মূর্ত করে তোলে। এ প্রসঙ্গে মলয় মণ্ডল তাঁর "শিশু-মনস্তত্ত্ব ও রবীন্দ্রনাথের শিশু সাহিত্য তার প্রকাশ" শীর্ষক প্রবন্ধে বলেন :

> ৬-১১ বছর বয়সের শিশুরা মানসিক ক্রিয়ার সক্ষম হয়। কিন্তু সব কিছুকে সে বিমূর্ত ও কল্পনার দৃষ্টিতে দেখে। এই বয়সে তার মধ্যে fantasy-র জন্ম হয়। সে কল্পনা করতে শেখে। বায়না ধরতে সে প্রচণ্ড পুলক বোধ করে। এই ধারণা থেকে তার বিশেষজ্ঞান তৈরি হয়-যা খুশি চাই, তাই তো পাব।[৫৬]

শিশু-মনস্তত্ত্বের এ সকল বৈশিষ্ট্য গোকু চরিত্রে বেশ উজ্জ্বলরূপে প্রতিফলিত। গল্পে উল্লেখ আছে এর অনুপুঙ্খ বর্ণনা :

> বাড়ির আবহাওয়া গোকুর উপদ্রবে অশান্ত হয়ে উঠেছে। হাঁপানী রুগীর মত দম টেনে টেনে চেঁচিয়ে কথা বলে গোকু। যত সব গেঁয়ো বুলি। দাবী, বায়না, আবদার ক্রমে ক্রমে চড়েই উঠছে। বকুনি দিলে বা দু'এক ঘা চড়-চাপড় দিলে তো রক্ষা নেই, কদর্য কান্না আর চিৎকারে বাড়িশুদ্ধ লোককে অতিষ্ঠ করে তোলে। এবার আবদার ধরেছে–বই চাই। রাখু মিনু বোঁচা বই পড়ে, আমারও চাই। --- একে একে সব আদায় করেছে গোকু, ভিন্ন বিছানা পায়, গরম সোয়েটার পায়। সংগ্রামে আজ পর্যন্ত গোকুর পরাজয়লাভ ঘটেনি এবং জয়ের তালিকা ক্রমশ ভরে উঠেছে। একখানা বর্ণপরিচয় ও একখানা ধারাপাত পেয়েছে, চীনেমাটির সিংহ পেয়েছে এক জোড়া।[৫৭]

গোকুর এই মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়ায় অতিষ্ঠ হয়ে এ মধ্যবিত্ত পরিবার বিশেষ করে জগৎবাবুর স্ত্রী নন্দা সিদ্ধান্ত নেয় তাকে অনাথ আশ্রমে পাঠিয়ে দেওয়ার। সরল ও কৌতূহলী গোকু এ সিদ্ধান্তের কথা অবগত হলে অদ্ভুত শান্ত হয়ে যায়। তার ব্যক্তিত্বে আসে চরম আঘাত ; তাই আশাহত, বিধ্বস্ত, বিক্ষত হৃদয় নিয়ে হারাণ মাস্টারের সঙ্গে সে এ বাড়ি থেকে স্বেচ্ছায় বিদায় নেয়। তার এ আকস্মিক স্বেচ্ছা নির্বাসনে নন্দার অন্তরাত্মা যেন লুণ্ঠিত, বিধ্বস্ত আর ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় পড়ে থাকে ঘরের ভেতর। 'একটা দূরসম্পর্কিত অনাথ শিশুর আশ্রয়, দুরন্তপনা, আর বিদায়কে কেন্দ্র করে এক দম্পতির পারস্পরিক আত্মিক বিপর্যয়ের চিত্র রাগ-বিরাগ, প্রতিক্রিয়া, সংশয়, দুর্বলতা, ভীরুতা আর আত্মিক বিপর্যয়ের চিত্র 'বর্ণচোরা'[৫৮] গল্পে সুবোধ ঘোষ যেভাবে তুলে এনেছেন তা বিচিত্রমুখী মানব-মনস্তত্ত্বের শিল্পিত স্বাক্ষর বলা যায়।

বিচিত্রমুখী মানব-মনস্তত্ত্বের সফল রূপকার সুবোধ ঘোষের কয়েকটি গল্পে বৃদ্ধ-বৃদ্ধার মনস্তত্ত্বের বিভিন্ন প্রান্ত বিশ্লেষিত হয়েছে। এধারার গল্পসমূহ যথাক্রমে "ন তস্থৌ", "কৌন্তেয়", "দেবতারে প্রিয় করি"। এসব গল্পে বৃদ্ধ-বৃদ্ধার মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ রয়েছে। বার্ধক্যে উপনীত হয়ে এসকল চরিত্র তাদের মনস্তাত্ত্বিক অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছে। জীবনের প্রান্তিক পর্যায়ে এসে বৃদ্ধ-বৃদ্ধার মনস্তত্ত্বে যে অদ্ভুত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় তার বাস্তবোচিত চিত্র আলোচ্য গল্পগুলোতে সন্নিবেশিত।

বৃদ্ধ বয়সের মনস্তাত্ত্বিক একটি বৈশিষ্ট্য হলো পুরনোকে আঁকড়ে ধরে রাখার প্রবণতা। এই মনস্তাত্ত্বিক প্রবণতার সার্থক রূপায়ণ লক্ষণীয় "ন তস্থৌ" [৫৯] শীর্ষক গল্প। এ গল্পের আখ্যানভাগ গড়ে উঠেছে কল্যাণঘাটের সপ্তাবরণ বিষ্ণুমন্দিরের প্রথম যাজকের বংশধর বুড়ো উপাধ্যায়কে কেন্দ্র করে। উপাধ্যায় কল্যাণঘাটের আপাত শ্রীহীন বর্তমান ও আশাহীন ভবিষ্যতের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা যেন বিগতগৌরব অতীতের প্রেতচ্ছায়া। প্রায় ভগ্নস্তূপে পরিণত বারোশত বছরের প্রাচীন বিষ্ণুমন্দির কিংবা সেই মন্দিরের বিগলিত-পিঠচ্যুত শিলাময় দেববিগ্রহগুলোকে উপাধ্যায় পরম প্রযত্নে রক্ষা করে চলেছেন। প্রাচীন বিষ্ণুমন্দিরের সেবক হিসেবে তাঁর গৌরব ও অহংকারের শেষ নেই। পুরনো এই মন্দিরকে পরম মমতায় আঁকড়ে ধরে রেখেছেন যে উপাধ্যায়, তাঁর এরূপ মনোভঙ্গির পেছনে রয়েছে বৃদ্ধ বয়সের মনস্তাত্ত্বিক ভাবনা। অথচ বৃদ্ধের এই আচরণকে কলকাতাবাসী পুত্র সোমনাথ 'উপদ্রব' বলে মনে করেছে এবং 'বুড়ো হাতির নষ্টামি' ভেবে সহ্য করেছে। একদিকে বৃদ্ধপিতার বিচিত্রমুখী মনস্তাত্ত্বিক আচরণ অপরদিকে শিক্ষিত, আধুনিক,তরুণ সোমনাথের যুক্তিসঙ্গত মনোদর্শন গল্পটিকে অনবদ্য করে তুলেছে। আসলে 'দুই যুগের দুই প্রজন্মের রুচি ও মানসিকতার দ্বন্দ্বে'[৬০] আবর্তিত গল্পটিতে বৃদ্ধ উপাধ্যায়ের মনস্তাত্ত্বিক অন্তর্যন্ত্রণার চিত্রই মুখ্য হয়ে উঠেছে।

"কৌন্তেয়"[৬১] গল্পে বৃদ্ধা এক নারীর বিচিত্রমুখী মনস্তত্ত্ব উপস্থাপিত হয়েছে। আলোচ্য গল্পের আখ্যানভাগ নির্মিত হয়েছে মধ্য কলকাতার পটভূমিকে কেন্দ্র করে। সুহাসিনী পল এ গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র। ষাট বছর বয়সী এই বৃদ্ধা অদ্ভুত মনস্তত্ত্বের অধিকারিণী হয়ে গল্পে আবির্ভূত হয়েছে। ভিক্ষাবৃত্তি করে জীবিকা নির্বাহ করলেও অন্যান্য ভিক্ষুকের থেকে স্বতন্ত্র সুহাসিনী। তার বেশভূষা এবং ভিক্ষা চাওয়ার পদ্ধতিটিও অভিনব :

> পথ চলতে গিয়ে মিস সুহাসিনী পলের জীর্ণ-শীর্ণ ছোট্ট চেহারাটা ঠুক ঠুক করে কাঁপে। শীত গ্রীষ্ম বা বর্ষা, গায়ের উপর সব সময় ঐ লম্বা গরমকোট। গরমকোটের সারা গায়ের এখানে-ওখানে পশম ঝরে গিয়েছে, ঘিয়ে ভাজা কুকুরের ছালের মতো দেখতে। পুরুষমানুষের পায়ের একজোড়া জুতো, তাও ছেঁড়া আর রং চটা, সুহাসিনী পলের দু'পায়ে যেন আলগা হয়ে লেগে রয়েছে। মাথার সব চুলই সাদা। -- ফ্যাকাসে একটা ছাতা আছে, আর আছে ময়লা একটা ঝোলা ; এই দুটি বস্তুই মিস সুহাসিনী পলের দুই হাতের দুটি প্রয়োজনের শোভা। কিন্তু ঐ ময়লা ঝোলার ভিতরে আর একটি বস্তু আছে, সে বস্তুটি জীর্ণ-শীর্ণ নয় এবং ছেঁড়া ময়লাও নয়। বেশ সাদা আর বেশ চকচকে কতগুলি ছোট ছোট কার্ড, কার্ডের উপর কালো হরফে ছাপা নাম–মিস সুহাসিনী পল।[৬২]

এই ময়লা ঝোলার ভিতর থেকে ভিজিটিং কার্ড বের করে সে ভিক্ষাবৃত্তি করে 'চ্যারিটি' চায়। একদিন তালতলা অঞ্চলের একটি বড়বাড়িতে ভিক্ষা চাইতে গিয়ে যুবক মাধব দত্তের কাছ থেকে আট আনা পেয়ে খুশি হয় সুহাসিনী। যুবকটির কোমল হৃদয়ের সুযোগ নিতে কিছুদিন পর সে আবার ঐ বাড়িতে

যায়। কিন্তু মাধবের দেখা না পাওয়ায় তার মা কর্তৃক অপমানিত হয়ে ফিরে যায় সুহাসিনী। ক্ষুব্ধ সুহাসিনী মনে মনে প্রতিশোধের পরিকল্পনা করতে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় সুহাসিনী মাধবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিজেকে তার মা বলে দাবি করে। তার কথায় বিশ্বাস না করলেও ক্ষণিকের জন্য মাধব দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। সুহাসিনী তাকে জানায় মাধব তার কুমারী বয়সের সন্তান। তাই সে তাকে কাছে রাখতে পারেনি। আজ তার অতৃপ্ত মাতৃত্বই তাকে মাধবের কাছে টেনে এনেছে। দ্বিধাগ্রস্ত মাধব তাকে দশ টাকা দিয়ে বিদায় করতে চাইলেও সুহাসিনী তাকে বিভ্রান্তিতে ফেলে টাকা না নিয়েই চলে যায়। এরপর হঠাৎ একদিন এন্টালি বাজারে সুহাসিনীকে দেখতে পেয়ে মাধব তার কুশল জানতে চায়। সুহাসিনী ছদ্ম মমতা নিয়ে তার সঙ্গে কথা বলতে থাকে এবং তাকে নিজের ঘরে নিয়ে আপ্যায়ন করে। বিদায়মুহূর্তে সুহাসিনী কোনো টাকা পয়সা চাইছে না দেখে মাধব অবাক হয় এবং তার সংশয় আরো বেড়ে যায়। শেষে মাধব নিজে থেকেই পঁচিশ টাকা দিতে চাইলে সুহাসিনী তা ছিনিয়ে নেয় এবং হাসতে হাসতে দ্রুত পালিয়ে যায়। 'মনস্তত্ত্বের নিপুণ গ্রন্থনায় টানটান এই গল্পে সুহাসিনী পল চরিত্রটি এক আশ্চর্য সৃষ্টি।'[৬৩] অভাবের তাড়নায় বৃদ্ধা এ নারীর মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা গল্পে অসাধারণ ভঙ্গিমায় পরিবেশিত হয়েছে। তার অপূর্ব কূটকৌশল আর প্রতিশোধ নেবার আকাঙ্ক্ষা বিস্ময়কর। সামান্য অভিনয়েই সে মাধব দত্ত ও তার মায়ের সত্যের ওপর গড়ে ওঠা এতদিনকার বিশ্বাসে ভাঙন ধরাতে গিয়েও শেষ পর্যন্ত সফল হয়নি। তবে তার মূল লক্ষ্য যে টাকা পয়সা আদায় করা, তা সার্বিকভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। মানবমনের এই বিচিত্রমুখীন বৈশিষ্ট্য গল্পটিকে সার্থক করে তুলেছে নিঃসন্দেহে। একদিকে উদার মানবিক গুণাবলিসম্পন্ন মাধব অন্যদিকে কুৎসিত, নীতিভ্রষ্টা বৃদ্ধা সুহাসিনী–এদের দুই বিপরীত মনস্তত্ত্বের নিপুণ বিশ্লেষণ গল্পটিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। সমালোচক যথার্থই বলেছেন :

> মানবমন বিশ্লেষণে অগ্রসর হয়ে সুবোধ ঘোষ আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের মতোই দেখিয়েছেন এর একদিকে রয়েছে উদার মানবিক গুণাবলি, মায়া-মমতা-আবেগ-অনুরাগ, তেমনি অন্যদিকে রয়েছে পাশব প্রবৃত্তির কুৎসিত নৃশংস ক্রূর বৈশিষ্ট্য সকল। প্রথমটি তাই মাধবের মনস্তত্ত্বে ক্রিয়াশীল এবং শেষেরটি বৃদ্ধা সুহাসিনীর মধ্য দিয়ে প্রকাশিত।[৬৪]

বৃদ্ধ-মনস্তত্ত্বের এক তাৎপর্যপূর্ণ অভিব্যক্তি প্রকাশিত হয়েছে *ভোরের মালতী* গল্পগ্রন্থের "দেবতারে প্রিয় করি" গল্পে। নামকরণে রাবীন্দ্রিক পঙক্তি উদ্ধৃত করে গল্পে লেখক বৃদ্ধ সনাতনবাবুর বিচিত্রমুখী মনস্তত্ত্বের চিত্র অঙ্কন করেছেন। 'দেবতার প্রতি ভক্তি এবং মানুষের প্রতি ভালোবাসার দ্বন্দ্ব এবং পরিণামে মানব-প্রেমের কাছে দৈবীভক্তির পরাজয় নিয়ে রচিত'[৬৫] এ গল্পের নায়ক প্রৌঢ় সনাতনবাবু দীর্ঘ সংসার-উপভোগ করে ধর্মকর্মে মন দিয়েছেন। পুত্র হরেন এবং পুত্রবধূ কমলার সংসারে ধ্যান,

জপ, তপ আর দেবতার চিন্তা নিয়েই তিনি সময় অতিবাহিত করেন, অন্যদিকে কোনোভাবেই আর মন দেন না। বাড়ির অন্যরাও সাংসারিক কোনো কাজে তাঁকে বিরক্ত করে না। নাতি জন্মগ্রহণ করলে সনাতনবাবু তার নাম রাখেন নারায়ণ–প্রিয় দেবতার নামে। একদিন ধুলাখেলার বয়সেই মারা গেল সনাতনবাবুর নাতিটি। সাময়িকভাবে সামান্য চঞ্চলতা ব্যতীত অন্য কোনো গভীর বেদনা বা শোক সনাতনবাবুর মনে আপাতদৃষ্টিতে লক্ষ করা যায় নি। তবে নাতির মৃত্যু পরবর্তী অভিঘাত বৃদ্ধ সনাতনবাবুর মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে, যা নিতান্ত স্বাভাবিক ও মনস্তত্ত্বসম্মত। আসলে জীবিতাবস্থায় এই শিশু তার মনে প্রত্যক্ষভাবে সামান্য প্রভাব ফেললেও মারা যাবার পর সে চিরস্থায়ী আসন রেখে গেছে। এই সূত্রে বলা যায়, তার বাইরের খোলস সংসারবিমুখতা আসলে অন্তর্গতভাবে সংসারে গভীরভাবে প্রবিষ্ট। প্রৌঢ় সনাতনবাবুর এরূপ বিচিত্রমুখী মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে সমালোচক অরিন্দম গোস্বামী বলেন :

> দেবতার মুখ স্মরণ করার জন্যে নাতির নাম রাখলেও গভীরভাবে মনস্তাত্ত্বিক তাৎপর্যপূর্ণ এই গল্পে সংসারবিবাগী সনাতনবাবু এক ছোট্ট শিশুর মায়াকে শেষপর্যন্ত কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। সংসারে থেকেও সংসারবিবিক্ত হওয়ায় এক কৃত্রিম প্রচেষ্টা তিনি চালিয়েছেন বটে, নাতির মৃত্যুতেও তেমন ভেঙে পড়েন নি-কিন্তু মনের অভ্যন্তরে এর যে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব পড়েছিল, পরবর্তীকালে তাই তাঁর ধর্মসাধনার পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছে। মনস্তাত্ত্বিকতা ও সাংকেতিকতার ধন্ধে এই গল্পে ব্যক্তিমনস্তত্ত্ব সম্পর্কে গল্পকারের নিখুঁত অনুধাবন ক্ষমতা আমাদের যুগপৎ বিস্মিত ও বিমুগ্ধ করে।[৬৬]

বৃদ্ধ বৃদ্ধার মনস্তাত্ত্বিক চিত্র উদঘাটনের পাশাপাশি বিধবা ও বিপত্নীক নারী পুরুষের মনোলোকের জটিল সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ সুবোধ ঘোষের গল্পে অসাধারণ হয়ে উঠেছে। *সায়ন্তনী* (১৯৬৯) গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত "পারমিতা" (১৯৫৯, আনন্দবাজার পত্রিকা) গল্পে বিধবা পারমিতার মনস্তাত্ত্বিক অন্তর্যন্ত্রণার এক নিখুঁত চিত্র এঁকেছেন গল্পকার। আলোচ্য গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র পারমিতার ওপর ভর করে আছে এর মনস্তাত্ত্বিক পরিকাঠামো। এই বিধবা নারী জীবনবিমুখ নয়। তার মধ্যে রয়েছে কামনা-বাসনা, প্রতিহিংসা ও বিরুদ্ধাচারণের সাহস। গল্পে বর্ণিত সুন্দরী এই বিধবা নারী আশ্রয় পেয়েছে শিল্পপতি বিপত্নীক মনোময়ের বাড়িতে, তার একমাত্র মেয়ে মন্টুর নাচের শিক্ষয়িত্রী হিসেবে। এরই ধারাবাহিকতায় কখন যে সে মন্টুর নাচের শিক্ষিকা থেকে এ বাড়ির সর্বময় কর্ত্রীতে পরিণত হয়েছে সে নিজেও জানে না। তার অবচেতনে বিপত্নীক পুরুষটির প্রতি একটি গোপন আশা কেবলই পল্লবিত হয়। মনোময়ের প্রতি তার দুর্বলতা তাই সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বধর্মী। কিন্তু বিধবা নারী পারমিতা বিপত্নীক এই শিল্পপতির মনোজগতের স্বরূপ প্রথমে অনুধাবন করতে না পারলেও হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করতে সমর্থ হয় যে সে বিকৃত রুচিসম্পন্ন। গল্পে শিল্পপতির তিন বন্ধুর সামনে পারমিতাকে নাচতে বলার মধ্য দিয়ে লেখক তার বিকৃত মনস্তত্ত্বের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। বর্ণনাংশটি নিম্নরূপ :

মনোময় ডাকে–পারমিতা ! পারমিতা বিড়বিড় করে কথা বলে–বলুন। মনোময়–তুমি তো ভাল নাচ জান শুনেছি। পারমিতা–কি বললেন ?

মনোময়–আস্তে, ওভাবে বলো না। আমাকে প্রশ্ন করবার কোন দরকার নেই। কথা হচ্ছে, আমার এই গেস্ট, এই তিন বন্ধুকে তোমার নাচ দেখিয়ে খুশি করে দাও।

–কি অদ্ভুত কথা বলছেন আপনি ? আমাকে এসব কথা বলা কি ---।

–আস্তে ! কথা বলতে হলে আস্তে বল। মনোময়ও গম্ভীর স্বরে ও আস্তে আস্তে কাটা-কাটা ভঙ্গীতে মুখের ভাষাটাকে যেন শক্ত চাবুকের মত আছড়ে দিয়ে কথা বলে।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে পারমিতা। স্বপ্নের খেলাঘর একটা প্রচণ্ড হিংস্রতার গর্জনে আর লাথির আঘাতে চুরমার হয়ে যাচ্ছে, যেন তারই শব্দ শুনছে পারমিতা।[৬৭]

মোহের বশে যে পারমিতা তার প্রার্থিত ব্যক্তির সাহচর্য কামনা করেছে, সেই মনোময়ের বিকৃত, নগ্ন আচরণ তার মনোলোকে সৃষ্টি করেছে গভীর ক্ষত ও বেদনা। 'চরিত্রের অন্তর্জীবনের পাপড়ি উন্মোচন দুরূহ হলেও'[৬৮] সচেতন গল্পকার সুবোধ ঘোষ মানবমনের অন্তস্তলের অন্তর্গত অতলস্পর্শ রহস্য উদঘাটনে ক্লান্তিহীন এক শিল্পী। বস্তুত মনস্তাত্ত্বিক ছোটগল্পের জন্য যা কিছু চিত্তবৈকল্য, চরিত্রের মন ও অবমনের খণ্ড খণ্ড বা জটিল টানাপড়েন "পারমিতা'"য় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

সুবোধ ঘোষ বিধবা নারীর মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করেছেন আধুনিক ও যুক্তিসঙ্গত উপস্থাপনের মাধ্যমে। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ কিংবা শরৎচন্দ্রের কথাসাহিত্যে বিধবা বিবাহের সমস্যা যেভাবে চিত্রিত হয়েছে, সুবোধ ঘোষের গল্পে সেভাবে উপস্থাপিত হয়নি। বিধবা বিবাহের সামাজিক সমস্যার পরিবর্তে তাঁর গল্পে এসেছে বিধবার মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা। এ ধারার একটি গল্প "পিছু ডাকে"। ক্ষুদ্র কলেবরের এ গল্পের নায়িকা বিধবা শুভার পুনরায় বিয়ের আয়োজনে সকলে ব্যস্ত ও তৎপর হয়ে উঠলেও শুভার ভেতরে কোনো তাগিদ নেই। তার জেঠিমা, মেজমামী আর হেনাবৌদি নববধূর বাক্স নতুন করে সাজাতে গিয়ে দেখল যে এটি খুব ভারী হয়ে গেছে। আসলে তারা যে শুভার প্রাক্তন মৃত স্বামী নবেন্দুর ছবি খুঁজছে তা বুদ্ধিমতী শুভার দৃষ্টি এড়ায়নি। এক্ষেত্রে তাদের মনস্তাত্ত্বিক অভিব্যক্তিও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে গল্পে। তাদের এরূপ বিচিত্র মনস্তত্ত্বের পেছেনে রয়েছে গভীর এক উদ্বেগ। নতুন দাম্পত্যজীবনে শুভার যাতে কোনো জটিলতার সম্মুখীন হতে না হয় তার জন্যই তাদের এ বিচিত্রমুখী অদ্ভুত মনস্তাত্ত্বিক আচরণ। যদিও শুভা পূর্বস্বামীর স্মৃতি ও ভালোবাসা হৃদয়ে ধারণ করেই নতুন নীড় রচনা করতে চায়। তাই নবেন্দুর ছবি জেঠিমা যখন সরিয়ে নিয়েছে তখন শুভা হেসে হেসেই শ্লেষাত্মক জবাব দিয়েছে :

> বাক্সটা এইবার বোধহয় খুব হালকা হয়ে গিয়েছে, জেঠিমা ? জেঠিমা–অ্যাঁ ? কি বললি ? শুভা আবার হাসে, আর হাসতে গিয়ে, দুই চোখ জলে ভরে যায়। –ঠিকই সত্যি, বাক্সটা এইবার খুব হালকা হয়ে গেল।[৬৯]

বিধবার এই আধুনিক মনস্তত্ত্বের পরিচয়দানে সুবোধ ঘোষ তাঁর স্বকীয় প্রতিভার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

বিচিত্রমুখী মানব-মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম রহস্যময় কিছু প্রান্ত উন্মোচিত হয়েছে "মৃগনয়না"[৭০] গল্পে। আলোচ্য গল্পের নায়ক হিরণের অক্ষমতাজনিত মনের অসন্তোষ চারপাশের মানুষ আর বহিঃপ্রকৃতির ওপর আঘাত হেনে পরিতৃপ্তি খোঁজে। কিন্তু পরিতুষ্টির পরিবর্তে তার মানসিক যন্ত্রণা আরও বৃদ্ধি পায়। প্রচণ্ড নৈরাশ্যমগ্নতা এমনভাবে তাকে আঁকড়ে ধরে যে, তার মনে হয়: 'পৃথিবীর কোন ভাল জিনিসকে ভাল বলতে গেলে হিরণের বুকটাই ফেটে যায়। বোধহয় ওর নিঃশ্বাসেই একটা নিদারুণ সতর্কতা আছে, যেন ভুলেও ভালকে ভাল বলে না ফেলতে হয়।'[৭১] এরূপ নৈরাশ্যবাদী মানুষের নেতিবাদী বিকারগ্রস্ততা গল্পে উঠে এলেও পরিণামে এক প্রচণ্ড মানসিক আঘাতে তার সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তন গল্পটিকে অনবদ্য করে তুলেছে। 'গল্পকার এক একটি ঘটনার প্রচণ্ড আঘাতের মধ্য দিয়ে গল্পের আপাদমস্তক জুড়ে চালিয়েছেন এক মানসিক চিকিৎসা'[৭২] যা মনস্তত্ত্বের যথার্থ স্বাক্ষরবাহী।

মনোজটিলতার রহস্যরূপ চিত্রণে 'মা হিংসীঃ' (১৯৪৫) গল্প স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত। এক ফাঁসির আসামীর বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করতে না পেরে প্রচণ্ড মানসিক যন্ত্রণায় বিদ্ধ হওয়ার করুণ চিত্র এ গল্পে অঙ্কিত হলেও এতে মানবমনের অপরাধপ্রবণ দিকটিই গুরুত্ববহ হয়ে উঠেছে। গল্পের প্রথম বাক্য থেকেই এক 'জঘন্য খুনের' আসামী গিরধারী গোপের বিরুদ্ধে ধেয়ে আসে দায়রা জজের অভিযোগ। জজের আদালতে অজস্র প্রমাণ–এ একথা স্বীকৃত যে পত্নী নির্যাতক অপমানব শ্রেণির অন্যতম হলো আসামী গিরধারী গোপ। দায়রা জজের বক্তব্য অনুযায়ী গিরধারী আকৃষ্ট হয়েছিল প্রতিবেশী সহদেব গোপের স্ত্রী শনিচরীর প্রতি এবং এ কারণেই সে তার 'পথের কাঁটা' স্ত্রী রাধিয়াকে নির্মম অত্যাচার করেছে এবং শেষ পর্যন্ত শনিচরীর কাছ থেকেও প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় প্রতিহিংসার বশে শনিচরীকে হেসো দিয়ে হত্যা করে। আর এই অপরাধের কারণেই আসামীর প্রতি সুবিচার করার লক্ষ্যে দায়রা জজ গিরধারীকে চরম দণ্ড প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। গল্পে গিরধারীর অপরাধপ্রবণ মানসিকতার রূপ চিত্রণে সুবোধ ঘোষের সচেতন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। সমালোচকের মতে :

> অপরাধপ্রবণতা মানুষের স্বাভাবিক আচরণ নয় এবং কখনও কখনও তা মনোরোগের অন্তর্ভুক্ত। মনোবিজ্ঞানের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, নানা কারণে মানবমন অপরাধপ্রবণ হয়ে ওঠে। এসবের মধ্যে রয়েছে বংশধারাগত, পরিবেশগত, আর্থ-সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়, ব্যক্তিগত ও জাতিগত কিংবা মনোবিজ্ঞানমূলক কারণ। --- সমাজজীবনে ভাসমান ও নোঙরহীন এসব ব্যক্তি নিজজীবনকে মনে করে অতিশয় মূল্যহীন।

> পরিণতিতে এদের মনে জন্ম নেয় হিংসা, দ্বেষ, লোভ, স্বার্থপরতা ও প্রতিহিংসাপরায়ণতা এবং ক্রমশ তারা হয়ে ওঠে অপরাধী বা দুস্কৃতকারী।[৭৩]

আলোচ্য গল্পে গিরধারী নিজের সুখ-সুবিধা কিংবা ব্যক্তিগত চরিতার্থতা পূরণের লক্ষ্যে সমাজবিগর্হিত এসব অপরাধ সংঘটিত করলেও তার মনের অন্তর্জগতে কোনো প্রকার ভয়, শঙ্কা, উৎকণ্ঠা যেমন নেই, তেমনি নেই অপরাধবোধ। তবে বিচারে অপরাধ প্রমাণিত হওয়ায় প্রাণদণ্ডের বিধান দেয়া হলে তার মনোজগতে ঘটে আকস্মিক এক পরিবর্তন। গলায় দড়ি দিয়ে মৃত্যুবরণে প্রবল অনীহা গিরধারী বিকল্প ইচ্ছার কথা প্রকাশ করে স্ত্রী রাধিয়ার কাছে। বিচারের সময় পত্নী রাধিয়াকে আভাসে ইঙ্গিতে সে জানিয়েছে বিষ খেয়ে আত্মহত্যার ইচ্ছার কথা। ফাঁসির বিকল্প আত্মহত্যা তার মনোলোকে রেখেছে সর্বাধিক আস্থা। তাই ফাঁসির মৃত্যুর অসম্মান ও বেদনা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য মৃত্যুদণ্ডপূর্ব সময়ে সে রাধিয়ার অপেক্ষায় অস্থিরচিত্ত হয়ে উঠেছে। অস্থিরচিত্ত এক ফাঁসির আসামীর মনোজটিলতার রূপ লেখক গল্পে তুলে এনেছেন এভাবে :

> এক-এক সময় ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিঝুম হয়ে থাকে গিরধারী, তার অন্তর্লোকের পথে যেন কারও পায়ের শব্দ শুনছে। সে আসলে, সে এতক্ষণে নিশ্চয়ই রওনা হয়ে গিয়েছে। আর কি দেরি করতে পারে সে ? নিঠাপুকুর থেকে লাল কাঁকড়ের সড়ক ধরে হেঁটে হেঁটে শান্তিময় মৃত্যুর উপঢৌকন নিয়ে রাধিয়া আসবেই। তার ইশারা বুঝতে কি ভুল করবে রাধিয়া ?[৭৪]

দীর্ঘ প্রতীক্ষার চরম মুহূর্তে যখন গিরধারী শুনতে পায় যে শেষ সাক্ষাৎকালে রাধিয়ার হাতের বিষমিশ্রিত গুড়ের হালুয়া আর পেঁড়া নামক মরণজয়ী উপঢৌকন সান্ত্রীর কাছে রেখে আসতে হয়েছে, তখন মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ও ক্ষতবিক্ষত হয়ে পড়ে সে। তখনকার মানসিক বিপর্যয়ের চিত্রও লেখক তুলে এনেছেন নির্মম, নিরাসক্ত ভঙ্গিতে। বর্ণনাংশটি নিম্নরূপ :

> গিরধারী তাকিয়ে থাকে অদ্ভুতভাবে। একটা মৃত মানুষের চোখের কোটর দুটো যেন হাঁ করে রয়েছে। সে দৃষ্টিতে কোন অর্থ নেই, ভাষা নেই, আবেগ নেই, জ্যোতি নেই। আজ এতদিনে সত্যিকারের ফাঁসির হুকুম শুনতে পেয়েছে গিরধারী। রাধিয়ার নিজের হাতের তৈরী মধুর মৃত্যুর উপহার হাতের নাগালে পৌঁছল না। গিরধারীর মেরুদণ্ডটা কাঁপছে, বেঁকে যাচ্ছে, কট্‌কট্ করে বাজছে, যেন জীবনকাঠি ভাঙছে।[৭৫]

গল্পে অপরাধী গিরধারীর মানসিক উপলব্ধি আর অন্তর্যন্ত্রণার অভিব্যক্তি যেভাবে ব্যক্ত হয়েছে, তা যথার্থই সচেতন লেখকের শিল্পসামর্থ্যের পরিচায়ক।

সুবোধ ঘোষের মনস্তত্ত্বচেতনার ভিন্নতর অভিব্যক্তি ঘটেছে "অলীক" (১৯৫১), "ঠগিনী" (১৯৫৩), "ঠগের ঘর" (১৯৫৪) গল্পে। এসব গল্পে বিচ্ছিন্ন মানুষের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার চিত্র যেমন আছে, তেমনি এদের বিচিত্রমুখী মনস্তত্ত্ব গল্পের আখ্যানভাগকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। ব্যক্তিমনের নানামুখী সংকট এসব গল্পের মূল উপাদান; তাই মনস্তত্ত্বের দিক থেকে গল্পগুলো বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। "অলীক"[৭৬] গল্পে এক বিচিত্র মানুষের মনস্তাত্ত্বিক অভিব্যক্তি প্রকাশিত হয়েছে। আলোচ্য গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র নামহীন অলীক ; যার কাছে দিনের বেলাটাই রাতের মতো, আর রাত দিনের মতো। ছন্নছাড়া, সন্তানহীন এই প্রৌঢ় ব্যক্তিটি কখনও চুরি, ছোটখাটো ছিনতাই এবং চোরাকারবারী জিনিসের বিক্রি করে কমিশন নিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে। তার জীবনদর্শন হলো যাত্রাদলের অভিমন্যুর মতো যে আসরের সব লোককে কাঁদিয়ে আড়ালে হাসতে চায়। সমাজের পঙ্কিলতায় জন্ম নেওয়া এই মানুষটির বিচিত্রমুখী মনস্তাত্ত্বিক আচরণ গল্পের সামগ্রিক পট-পরিবেশকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। বিশেষ করে বিভিন্ন অচেনা বিয়ে বাড়িতে অবাঞ্ছিত ভোজ আর অভিজাতদের ভিড়ে মিশে সে সকলের মধ্যে আপ্যায়িত হবার চেষ্টা করত। তার এই বিচিত্রমুখী মনস্তাত্ত্বিক আচরণ গল্পের শেষাংশে আকস্মিক এক ঘটনায় পরিবর্তিত হয়েছে। একদিন একটি অতি সাধারণ বিয়ে বাড়িতে বিপন্ন কনের বাবার দুঃখ তাকে স্পর্শ করে। কৌশলের দ্বারা সে মেয়েটির বিয়ের জন্য প্রয়োজনীয় যৌতুক নিজেই দিতে পারে পাত্রপক্ষকে এই বলে বিয়েতে রাজি করায়। মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে সে মেয়েটির বিয়ে দেয়, ক্রমশ সে জড়িয়ে পড়ে এই পরিবারটির সঙ্গে। অপরাধী হয়েও তার মনোলোকের এই অদ্ভুত পরিবর্তন গল্পটিকে অনবদ্য করে তুলেছে নিঃসন্দেহে। যে মানুষের মধ্যে কোনো সুস্থ জীবনবোধ ছিল না, মানুষকে ঠকানোই যার উদ্দেশ্য ছিল, একটি অমানবিক ঘটনার অভিঘাতে হঠাৎ তারও পরিবর্তন ঘটে ; সকলের অগোচরে তার মধ্যে এক পিতৃত্ববোধ জেগে ওঠে। তার মনস্তত্ত্বে ভিন্নতর এক উপলব্ধি জাগ্রত হয়, সম্পূর্ণ নতুন ব্যক্তি চেতনা বিকশিত হয় তার মধ্যে। একটি মেয়ের করুণ চোখের আর্তিতে তার 'ঠাণ্ডা ও সাদা হৎপিণ্ডটা যেন একটা উত্তাপের জন্য তৃষ্ণার্ত হয়ে'[৭৭] থাকে। ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়ানো এই বিচিত্র মনস্তত্ত্বের অধিকারী মানুষটির আকস্মিক বদলে যাওয়ার গল্পটিতে সুবোধ ঘোষ যেন মনোবিদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় গল্পটির মনস্তত্ত্বগত দিক পর্যালোচনা করে তাই বলেছেন :

> 'অলীক' গল্পটির গল্পাংশ কতকগুলি অসম্ভাব্য ঘটনাকে সম্ভবরূপে দেখানোর রূপকথাধর্মী প্রয়াস। কিন্তু ইহার প্রধান আকর্ষণ হইল অলীকের ফাঁকা প্রবঞ্চনাভরা জীবনের পাষাণ স্তর হইতে স্নেহমায়ামমতার নির্ঝরোৎসারের চিত্র–আর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হইল মানব-চিত্রাঙ্কনে সাংকেতিকতার সার্থক প্রয়োগ। এই সাংকেতিক নির্দেশই গল্পটিকে বাস্তবের গ্লানি-বীভৎসতা হইতে এক সুকুমারব্যঞ্জনাপূর্ণ রূপক-রাজ্যে উন্নীত করিয়াছে।[৭৮]

"অলীক" গল্পের ঠিক বিপরীত মেরুর গল্প "ঠগিনী" (*থিরবিজুরী*) তেও লোক ঠকানো বিচিত্রমুখী মানব-মনস্তত্ত্বের নিখুঁত আলেখ্য বর্ণিত হয়েছে। এ গল্পে সনাতন ও সনাতনের কন্যা সুধা বিভিন্ন নামে অভিনয় করে ফেঁদে বসে অভিনব প্রেমের ব্যবসা। শঠ সনাতনের ঠগিনী মেয়ে সুধা পাড়ার কোনো এক ধনকুবের যুবকের সঙ্গে প্রেম করে। প্রেমের পরিণতি যখন পরিণয়ের স্তরে আসে তখন ফুলশয্যার আসর থেকে সমস্ত সোনা, অর্থ নিয়ে কেটে পড়ে পিতা-কন্যা। পরপর তিনবার এ ঘটনা সংঘটিত হওয়ায় পুলিশ বলে 'যেমন মেয়ে, তেমনই তার বাপ।'[৭৯] এরকম অভিনব উপায়ে মানুষ ঠকানোর মনোবৃত্তি তাদের অস্বভাবী মনস্তত্ত্বেরই স্বাক্ষর বহন করে। এ মনোবৃত্তি নানা কারণে সংঘটিত হতে পারে। বিশিষ্ট সমালোচকের মতে :

> সমাজের প্রতি অবজ্ঞার কারণে বা সমাজের প্রতি দায়িত্ব পালনে অবহেলার জন্য Antisocial personality disorder (সমাজ বিরোধিতাজনিত ব্যক্তিত্ব সমস্যা) দেখা দেয়। তাকে অনেক সময় Psycho pathetic বা socio pathetic personality (সমাজ বিরোধিতাজনিত ব্যক্তিত্ব বা গণ্ডগোল)ও বলে। এ অবস্থায় মানুষ বেশীদিন এক পেশা বা কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারে না। মানুষকে ঠকিয়ে এরা আত্মসুখ লাভ করে।[৮০]

আলোচ্য গল্পে সনাতন ও তার মেয়ের মনোবিকৃতির উৎসমূলে ক্রিয়াশীল সমাজে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থানগত বৈষম্য। এ বৈষম্যের জন্যই তারা নির্দিষ্ট কোনো জায়গায় বেশিদিন বসবাস করে না। অপরাধী মন তাই সর্বদা ধাবিত হয় নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুতে প্রবেশ করতে। এ গল্পে পিতা সনাতনের মনস্তত্ত্বের পরিবর্তন না ঘটলেও কন্যা সুধার মধ্যে নাটকীয় পরিবর্তন ঘটেছে। সিনেমার পোস্টার লেখা আর্টিস্ট রমেশের সঙ্গে করবী ছদ্মনামে আলাপ-পরিচয়ে তার প্রতি করবীর মনোলোকে জন্ম নেয় ভালোবাসার ফল্গুধারা। রমেশের মহানুভবতায় মুগ্ধ সনাতন-কন্যার মনোলোকে অদ্ভুত এক পরিবর্তনের চিত্র এঁকেছেন সুবোধ ঘোষ যা চরিত্রটির বিচিত্রমুখী মনস্তত্ত্বের আভাস দেয় :

> করবী–তুমি বাঁচতে চাও ?
> রমেশ –এ কথার মানে কি করবী ?
> করবী– যদি বাঁচতে চাও তবে এখুনি পুলিশ ডেকে আমাকে ধরিয়ে দাও।
> রমেশের চোখ থরথর করে কাঁপে– এ কথারই বা মানে কি করবী ?
> করবী–আমি তোমাকে ঠকাতে এসেছি। আমি তোমার স-জাত নই, আমি করবী নই, আমি কুমারী নই। -- আমি হলাম -- ।
> আবার চেঁচিয়ে ওঠে করবী।
> –আমি এক ভয়ঙ্কর বাপের ভয়ঙ্কর মেয়ে।[৮১]

আসলে রমেশের প্রতি সুধার দায়িত্ববোধ ও প্রেম তাকে এক সুউচ্চ মর্যাদায় গল্পে তুলে আনা হলেও সুবোধ ঘোষ মানব-মনস্তত্ত্বের বিচিত্রমুখী সারসত্যকে উপেক্ষা করতে পারেন নি।। তাই গল্পের শেষাংশে সুধার বাবা সনাতন যখন ছদ্ম পরিচ্ছদে বিজয়বাবু নামে সুধার বাগবাজারের গলির ক্ষুদ্র বাসায় এসে তালাবদ্ধ দেখতে পায়, তখন পুলিশের কাছে ধরা পড়ে সে বলে ওঠে, 'ইস্, মেয়ে হয়ে বাপকে কি এমন করে ঠকাতে হয় রে ঠগিনী!'[৮২] গল্পে সমকালীন স্থান-কালিক সমস্যার পটভূমিতে স্থাপন করে লেখক এক অসহায় পিতার যে বিচিত্রমুখী মনস্তত্ত্বের আলেখ্য নির্মাণ করেছেন তা সত্যিই দুর্লভ ও স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত।

ব্যক্তি-মনস্তত্ত্বের ভিন্নতর এক প্রকাশ লক্ষ করা যায় অন্তর্ভুক্ত "ঠগের ঘর"[৮৩] গল্পে। এ গল্পেও পূর্ববর্তী গল্পের ন্যায় এক ঠগ ব্যক্তির মনস্তাত্ত্বিক অভিব্যক্তি প্রকাশিত। তবে ঠগ ব্যক্তিটির মনস্তত্ত্বচেতনার চেয়ে তার স্ত্রীর দ্বিধাদীর্ণ মনস্তত্ত্ব গল্পে অধিক গুরুত্ববহ হয়ে উঠেছে। এ গল্পের প্রধান চরিত্র রাইচরণের জীবিকা হলো মানুষের কররেখা আর কপালরেখা দেখে এমনকি স্বপ্নের বর্ণনা শুনে ভবিষ্যদ্বাণী করা। স্ত্রী পারুলবালাকেও সে মিথ্যা ছলনা করে ঠকিয়েই বিয়ে করেছে। যে সামান্য পয়সা সে উপার্জন করে তাতে সংসার নির্বাহ হয় না। স্বামীর এই স্বল্প আয়ের সংসারে পারুলবালার মধ্যে জন্ম নেয় মানসিক সংকট। দারিদ্র্যের দুঃসহ সংকটের সুযোগ নিয়ে পারুলবালার জীবনে সন্তর্পণে এগিয়ে আসে প্রতিবেশী মণিবাবু। অভাব-অনটনের সংসারে মণিবাবুর দেয়া উপহার উপঢৌকন আর উপাদেয় খাবার পারুলকে বিভ্রান্ত করলেও শেষে সিদ্ধান্ত নেয় যে সে স্বামীগৃহ থেকে চলে গিয়ে মণিবাবুর সঙ্গে সংসার গড়বে। একদিন মণিবাবুর সঙ্গে পালিয়ে যাবার প্রস্তাবে সম্মতি জানালেও বিদায়কালে দরিদ্র সংসারের সকল স্মৃতিচিহ্ন তার মনোলোকে এক গভীর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। একদিকে নতুন ঘরছাড়া জীবনের আকর্ষণ অপরদিকে নিরীহ নির্বিকার দুঃখী স্বামীর চিন্তায় তার মনস্তত্ত্বে বিচিত্র দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। মানসিক অন্তর্যন্ত্রণায় 'উপুড় হয়ে ঘরের মেঝের মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম'[৮৪] করার ভঙ্গিতে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে পারুল, বলে– 'তাহলে লোকটা আজ ঘরে ফিরে এসে খাবে কী মণিবাবু ? বলতে গেলে কিছুই যে নেই। ওই একটা শুকনো রুটি আর ---।'[৮৫] দারিদ্র্যের নির্মম আঘাত যে মানুষের মনোলোকে কত বড় একটি ক্ষত সৃষ্টি করতে পারে তার সফল দৃষ্টান্ত "ঠগের ঘর" গল্প। স্বামীর প্রতি দুশ্চিন্তা থেকে পারুলের যে মানসিক অবসাদ এবং দ্বিধাগ্রস্ততাজনিত বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছে তাকে obsessive-compulsive disorder বলা যেতে পারে। লেখকের সুতীক্ষ্ণ, অন্তর্ময় ও সত্যসন্ধ জীবনদৃষ্টি এক অখণ্ড প্রতীতি-সমগ্রতায় অভিব্যঞ্জিত–যেখানে পারুলের জৈবনিক আকাঙ্ক্ষা হয়ে উঠেছে তরঙ্গিত, স্পন্দিত। এই বৈশিষ্ট্যপুঞ্জ নির্ধারণ করেছে সুবোধ ঘোষের গল্পের গৌরব ও বিশিষ্টতা। কেননা, লেখকের 'তীক্ষ্ণদৃষ্টি, অন্তর্দৃষ্টি ও

দিব্যদৃষ্টির সুষম ঐক্যে স্ফটিকায়িত হয় ছোটগাল্পিক শিল্পবোধের তন্ময় মহান বিন্দুবৃত্ত, যার অভিব্যঞ্জনায় ভগ্ন চূর্ণ বিশ্ব হয়ে ওঠে প্রতীতি-সমগ্র'।[৮৬]

আসলে বিচিত্রমুখী মানব-মনস্তত্ত্বকে গল্পে অসাধারণভাবে উপস্থাপন করার কৃতিত্বে সুবোধ ঘোষের স্বকীয়তা তুলনারহিত। 'মানবমন যেহেতু সর্বদা স্বাধীন, গতিশীল, স্বাতন্ত্র্যময়, দুর্জ্ঞেয় ও প্রছন্ন'[৮৭] তাই এসব বৈশিষ্ট্য লেখক সুবোধ ঘোষের গল্পের চরিত্রের মনস্তত্ত্ব নির্মাণে রেখেছে অভিনবত্বের সূক্ষ্মতর ব্যঞ্জনা। বস্তুত আধুনিক জীবনের জটিল স্রোতে ব্যক্তি মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং তার মনোজগতের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের দিকে ছিল তাঁর নিবিড় অনুধ্যান। বিশ্বযুদ্ধোত্তর নিয়ত পরিবর্তমান সমাজ, ব্যক্তির মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব ও নর-নারীর আন্তর্ব্যক্তিক প্রেম সম্পর্কের বিস্তারিত বিবরণ তাঁর বুদ্ধিনির্ভর স্বাধীন দৃষ্টিভঙ্গিতে গল্পে উপস্থাপিত হয়েছে। মনোলোকের জটিল সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ, তার বিচিত্র রূপান্তরের এক নিরাসক্ত নিপুণ শিল্পী সুবোধ ঘোষের গল্পে বিচিত্রমুখী মানব-মনস্তত্ত্ব তাই স্বাতন্ত্রিক বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. উত্তম ঘোষ, *সুবোধ ঘোষ : বড় বিস্ময় জাগে*, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ১৯৯৪, পৃ. ৪৭

২. গোপালমণি দাস, *দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলা ছোটগল্পে সুবোধ ঘোষ*, পাত্র'জ পাবলিকেশন, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০০৭, পৃ. ৮৩

৩. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, সপ্তম পুনর্মুদ্রণ সংস্করণ ১৯৮৪, পৃ. ৬৪৬

৪. রথীন্দ্রনাথ রায়, *ছোটগল্পের কথা*, পুস্তক বিপণি, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৫৯, পৃ. ১৫৩

৫. নবনীতা চক্রবর্তী, *বাংলা ছোটগল্পের গদ্যশৈলী সতীনাথ ভাদুড়ী-সুবোধ ঘোষ-কমলকুমার মজুমদার*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০২, পৃ. ৩৮

৬. গোপালমণি দাস, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৪

৭. সাধন চট্টোপাধ্যায়, "পরশুরামের কুঠার-সুবোধ ঘোষ যেভাবে দেখেছিলেন" শীর্ষক প্রবন্ধ, উত্তম পুরকাইত সম্পাদিত সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ষান্মাসিক পত্রিকা *উজাগর*, শতবর্ষে সুবোধ ঘোষ সংখ্যা, ১৪১৫, পৃ. ১০০

৮. "পরশুরামের কুঠার" গল্পটি 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় বার্ষিক দোল সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে এটি লেখকের দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ *পরশুরামের কুঠার*-এ অন্তর্ভুক্ত হয়।

৯. শিবশংকর পাল, *সুবোধ ঘোষের ছোটগল্পে মানবিক মূল্যবোধ*, সুবর্ণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ১৩২

১০. উত্তম ঘোষ, "এই তো পুরস্কার" শীর্ষক প্রবন্ধ, *ভরা থাক সুবোধ ঘোষ স্মৃতি-তর্পণ* ; সুবোধ ঘোষ স্মৃতি সংসদ, কলকাতা, ১৯৯১, পৃ. ৩২

১১. উত্তম রায়, *সুবোধ ঘোষের ছোটগল্পে কথনশৈলী*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০১০, পৃ. ৬২

১২. শিবশংকর পাল, পূর্বোক্ত, পৃ, ১৩৩

১৩. সুবোধ ঘোষ, "পরশুরামের কুঠার", *গল্প সমগ্র*-৩, আনন্দ প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, জুন ১৯৯৪, পৃ. ৪৮

১৪. উত্তম রায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬২

১৫. সুবোধ ঘোষ, "পরশুরামের কুঠার", পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯-৫১

১৬. উত্তম রায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৩

১৭. নবেন্দু চট্টোপাধ্যায়, "পরশুরামের কুঠার" শীর্ষক প্রবন্ধ, *ভরা থাক সুবোধ ঘোষ স্মৃতি-তর্পণ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭

১৮. আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত গল্পটি প্রথমে *গ্রামযমুনা* (১৯৪৪) গল্পগ্রন্থে স্থান পেলেও পরবর্তীতে বহু আলোচনা-সমালোচনার কারণে এটি লেখকের *জতুগৃহ* (১৯৫০) গল্পগ্রন্থে পুনরায় অন্তর্ভুক্তি লাভ করে। কেবল তাই নয়, লেখকের মৃত্যুর পর *বারবধূ ও অন্যান্য* (১৯৯৫) গ্রন্থেও গল্পটি সন্নিবেশিত হয়।

১৯. সুবোধ ঘোষ, "বারবধূ", *গল্পসমগ্র*-১, আনন্দ প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, জানুয়ারি ১৯৯৪, পৃ. ২১০

২০. নীরদচন্দ্র চৌধুরী, *বাঙালী জীবনে রমণী*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৪০৮, পৃ. ৫৬

২১. সুবোধ ঘোষ, "বারবধূ", পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৯

২২. পূর্বোক্ত

২৩. শিবশংকর পাল, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৭

২৪. শশাঙ্কশেখর মণ্ডল "সুবোধ ঘোষের 'বারবধূ', চেনা ছন্দ অচেনা সুর" শীর্ষক প্রবন্ধ, উত্তম পুরকাইত সম্পাদিত সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ষান্মাসিক পত্রিকা *উজাগর*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৯

২৫. সাবিত্রী নন্দ চক্রবর্তী, *আধুনিক বাংলা ছোটগল্প : মূল্যবোধের সংকট*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জুন ২০০৪, পৃ. ৮৪

২৬. শিবশংকর পাল, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৮

২৭. "স্নানযাত্রা" (১৯৫৯) গল্পটি লেখকের *স্নানযাত্রা* (১৯৬৯) গল্পগ্রন্থে সংকলিত।

২৮. অরিন্দম গোস্বামী, *সুবোধ ঘোষ: কথাসাহিত্য*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, আগস্ট ২০০১, পৃ. ১০৮

২৯. শিবশংকর পাল, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৬

৩০. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫০

৩১. সুবোধ ঘোষ, "গোত্রান্তর", *গল্প সমগ্র*-২, আনন্দ প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, এপ্রিল ১৯৯৪, পৃ. ১২৩

৩২. উত্তম রায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬০

৩৩. "নির্বন্ধ" গল্পটি লেখকের দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ *পরশুরামে কুঠার*-এ অন্তর্ভুক্ত।

৩৪. গোপালমণি দাস, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৫

৩৫. সুবোধ ঘোষ, "নির্বন্ধ", *গল্প সমগ্র*-২, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৬

৩৬. "অনধিকার প্রবেশ" গল্পটি *গ্রামযমুনা* (১৯৪৪) গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত।

৩৭. শিবশংকর পাল, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৯

৩৮. "গুহামানব" (১৯৬৪) 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয়।

৩৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৯

৪০. গোপালমণি দাস, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৯

৪১. তপন মণ্ডল, *গল্পকার সুবোধ ঘোষ : জীবনদৃষ্টি ও নির্মাণ শিল্প*, জ্ঞান বিচিত্রা প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০০৭, পৃ. ৫১

৪২. সুবোধ ঘোষ, "তিন অধ্যায়", *গল্প সমগ্র*-২, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬-১৭

৪৩. সুবোধ ঘোষ, "স্বমহিমচ্ছায়া", *গল্প সমগ্র*-২, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৭-৯৮

৪৪. "ঐতিহাসিক বস্তুবাদ" গল্পটি *ভোরের মালতী* (১৯৫৭) গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত।

৪৫. সুবোধ ঘোষ, "ঐতিহাসিক বস্তুবাদ", *গল্প সমগ্র*-২, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৬

৪৬. উত্তম রায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪

৪৭. গোপালমণি দাস, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮

৪৮. "আত্মজা" গল্পটি *মনভ্রমরা* (১৯৫৩) গ্রন্থে সংকলিত।

৪৯. বিমল রায়, "চিঠি", *ভরা থাক সুবোধ ঘোষ স্মৃতি-তর্পণ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮

৫০. সুবোধ ঘোষ, "আত্মজা", *গল্প সমগ্র*-৩, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৯

৫১. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯০

৫২. শিবশংকর পাল, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৩

৫৩. সুবোধ ঘোষ, "আত্মজা", পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯০

৫৪. "বর্ণচোরা" গল্পটি *গ্রামযমুনা* (১৯৪৪) গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত।

৫৫. গোপালমণি দাস, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৭

৫৬. মনোরঞ্জন পুরকাইত (সম্পা), *শিশুতীর্থে রবীন্দ্রনাথ* গ্রন্থের অন্তর্গত মলয় মণ্ডলের প্রবন্ধ "শিশু-মনস্তত্ত্ব ও রবীন্দ্রনাথের শিশু-সাহিত্যে তার প্রকাশ", সাহিত্য তীর্থ প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০১১, পৃ. ১৩৫

৫৭. সুবোধ ঘোষ, "বর্ণচোরা", *গল্পসমগ্র*-১, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭১-২৭২

৫৮. গোপালমণি দাস, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৭

৫৯. "ণ তস্থৌ" গল্পটি ১৯৪১ সালে 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পরবর্তীসময়ে গল্পটি *পরশুরামের কুঠার* গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়।

৬০. তপন মণ্ডল, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৫

৬১. "কৌন্তেয়", গল্পটি *কুসুমেষু* গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত।

৬২. সুবোধ ঘোষ, "কৌন্তেয়", *গল্পসমগ্র*-১, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১৪

৬৩. অরিন্দম গোস্বামী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১০

৬৪. উত্তীয় বসু, "সুবোধ ঘোষের ছোটগল্প : আর্কেটাইপের আঙ্গিকে" শীর্ষক প্রবন্ধ, সোমনাথ দাস সম্পাদিত ত্রৈমাসিক চড়ুইপত্র *সময় তোমাকে* বিশেষ সংখ্যা, কলকাতা, পঞ্চম বর্ষ ২০১১, পৃ. ১২২

৬৫. শিবশংকর পাল, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪১

৬৬. অরিন্দম গোস্বামী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১১

৬৭. সুবোধ ঘোষ, "পারমিতা", *গল্প সমগ্র*-২, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩-৫৪

৬৮. শুভঙ্কর ঘোষ, *সাহিত্যের রূপভেদ*, সাহিত্যলোক, কলিকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ৬৪

৬৯. সুবোধ ঘোষ, "পিছু ডাকে", *গল্প সমগ্র*-৩, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৩

৭০. "মৃগনয়না" গল্পটি *চিত্তচকোর* (১৯৬০) গ্রন্থে সন্নিবেশিত।

৭১. সুবোধ ঘোষ, "মৃগনয়না", *গল্প সমগ্র*-৩, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬০

৭২. গোপালমণি দাস, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৬

৭৩. সৈয়দ আজিজুল হক, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প: সমাজচেতনা ও জীবনের রূপায়ণ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৮, পৃ. ২০৯

৭৪. সুবোধ ঘোষ, "মা হিংসীঃ", *গল্প সমগ্র*-২, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৬

৭৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৭

৭৬. "অলীক" গল্পটি 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র বার্ষিক দোল সংখ্যায় ১৯৫৭ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে এটি *জতুগৃহ* গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়।

৭৭. সুবোধ ঘোষ, "অলীক", *গল্পসমগ্র*-১, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০

৭৮. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৫৪

৭৯. সুবোধ ঘোষ, "ঠগিনী", *গল্পসমগ্র*-১, পূর্বোক্ত, পৃ.২৫৭

৮০. মোঃ মাইনুল আহসান খান, *অপরাধ বিজ্ঞান মনোরোগ ও আইনের শাসন*, মুক্তচিন্তা প্রকাশন, ঢাকা ১৯৯৮, পৃ. ১৮৯-১৯০

৮১. সুবোধ ঘোষ, "ঠগিনী", পূর্বোক্ত, পৃ.২৬৩

৮২. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৪

৮৩. "ঠগের ঘর" গল্পটি পলাশের নেশা (১৯৫৭) গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত।

৮৪. সুবোধ ঘোষ, "ঠগের ঘর", *গল্পসমগ্র*-১, পূর্বোক্ত, পৃ.৫১৮

৮৫. পূর্বোক্ত,

৮৬. সৈয়দ আকরম হোসেন, "গল্পগুচ্ছের প্রকরণ : কতিপয় মোটিফ" শীর্ষক প্রবন্ধ, *প্রসঙ্গ : বাংলা কথাসাহিত্য*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, অক্টোবর ১৯৯৭, পৃ. ১৫

৮৭. সৈয়দ আজিজুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৮

উপসংহার

কল্লোল-পরবর্তী বাংলা কথাসাহিত্যের এক শক্তিমান লেখক সুবোধ ঘোষ। তাঁর আবির্ভাবকালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন জীবিত ; এছাড়া বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল, প্রেমেন্দ্র মিত্র, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, প্রমথনাথ বিশী প্রমুখ কথাসাহিত্যিক তখন স্বীয় প্রতিভার গুণে প্রতিষ্ঠিত ও উজ্জ্বল। এরকম এক বর্ণাঢ্য, আলোকিত পরিমণ্ডলে সুবোধ ঘোষ বাংলা কথাসাহিত্যের ধারায় যুক্ত করলেন নতুন সুর ও স্বর ; যা তাঁকে বিশিষ্ট ও প্রাতিস্বিক করে তুলেছে নিঃসন্দেহে। প্রখর কালচেতনা, বিশেষ জীবনবোধ, বিস্তৃত জীবনাভিজ্ঞতা আর সুগভীর প্রজ্ঞায় সমৃদ্ধ সুবোধ ঘোষের ছোটগল্পে বিষয়গত ভিন্নতা সহজেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নৃতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব, আদিবাসী জনসমাজ, লোক-উদ্ভূত কিংবদন্তি ও মৌখিক ইতিহাস থেকে সমাজতত্ত্ব, ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ব প্রভৃতি বিষয় তাঁর ছোটগল্পে উঠে এসেছে। তবে সবকিছুকে ছাপিয়ে তাঁর ছোটগল্পে যে বিষয়টি অধিক গুরুত্ব পেয়েছে তা হলো মানব মনস্তত্ত্ব। বস্তুত মানব মনস্তত্ত্ব ছোটগল্পের জন্মলগ্ন থেকেই এর বিষয় হিসেবে গৃহীত হয়েছে। ছোটগল্প নামক সাহিত্যের এই শিল্প-প্রকরণটির উপজীব্যই হচ্ছে মানুষ ও তার মন। মনোজগতের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ছোটগল্পকারের প্রধান অবলম্বন ; তাই মনস্তত্ত্বের সার্বিক রূপ নির্ণয়ে গল্পলেখকের অনুসন্ধানী দৃষ্টির অভাব দুর্লক্ষ্য নয়। রবীন্দ্রনাথের গল্পে মনস্তত্ত্বের বিচিত্রমুখী দিক লক্ষণীয়। বিশেষ করে নারীর মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথের দক্ষতা অসাধারণ। গল্পে অঙ্কিত নারীর মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা বিশ্লেষণে তিনি বিশেষ যত্নশীল ছিলেন। পাশাপাশি শিশু ও কিশোর মনস্তত্ত্ব উদঘাটনেও তাঁর স্বকীয়তা অনন্য বৈশিষ্ট্যের দ্যোতক। রবীন্দ্রনাথের পাশাপাশি শরৎচন্দ্র, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের গল্পেও মানব মনস্তত্ত্বের বিভিন্ন দিক উন্মোচিত হয়েছে। নর-নারীর প্রেম আর দাম্পত্যজীবনের চিরাচরিত আদর্শের অন্তরালবর্তী বিচিত্র চোরাগলি, তার ক্লেদাক্ত পিচ্ছিলতা, অন্ধকার বিসর্পিলতার পরিচয় ব্যক্ত হয়েছে তাঁদের গল্পসমূহে। পরবর্তীসময়ে কল্লোল যুগের গল্পলেখকদের রচনায় মনোগহনের বিসর্পিলতার অনুপুঙ্খ চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। এ সময় মনোচিকিৎসক ফ্রয়েডের তত্ত্ব পাঠে অনেক লেখক তাঁদের গল্পে প্রতিফলিত চরিত্রের মনোবিকলনের স্বরূপ সন্ধানে তৎপর ও আগ্রহী হয়ে ওঠেন। প্রসঙ্গক্রমে জগদীশ গুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র ও বুদ্ধদেব বসুর কথা বলা যায়। এঁদের গল্পে মানবমনের নানামুখী ক্রিয়া, যৌন অবদমন এবং তৎসৃষ্ট বিভিন্ন জটিলতা, স্বপ্নভঙ্গের বেদনা প্রভৃতি অঙ্কিত হয়েছে। পরবর্তীকালে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে মানবজীবনের জটিল অন্তর্জগতের বিবিধ প্রসঙ্গ বিস্তৃত পরিসরে উপস্থাপিত হয়েছে। বিশেষ করে ফ্রয়েডের সর্বযৌনবাদী মনস্তত্ত্বের প্রভাব মানিকের প্রথম পর্বের বহু গল্পেই লক্ষ করা যায়। মানুষের নিভৃত মনের নিষিদ্ধ কামনাগুচ্ছ যে কত ভয়াবহ ও জটিল আকার ধারণ করতে পারে তা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পের চরিত্রের মনোজগৎ বিশ্লেষণ করলে উপলব্ধি করা যায়। সুবোধ ঘোষের গল্পেও মানব মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ উল্লেখযোগ্য। বস্তুত মনস্তাত্ত্বিক গল্প রচনায় সুবোধ ঘোষের স্বাতন্ত্র্য অনস্বীকার্য। মানবমনের চেতন অবচেতন ও অচেতন প্রান্ত-আশ্রয়ী ফ্রয়েডীয় জীবন-

অভীপ্সা ও তার সর্বযৌনতত্ত্বে আস্থা স্থাপনে, মধ্যবিত্তমানসের নানান অসঙ্গতি অনুধাবনে, বিচিত্রমুখী নরনারীর প্রেম-মনস্তাত্ত্বিক সম্প্রকাশ উপস্থাপনে তাঁর ছোটগল্প স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত।

মনোলোকের জটিল সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ, তার বিচিত্র রূপান্তরের এক নিরাসক্ত নিপুণ পর্যবেক্ষক সুবোধ ঘোষের ছোটগল্পে ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন তাৎপর্যবহ হয়ে উঠেছে। ফ্রয়েডের মনোবিকলনবিদ্যা আত্মস্থ করে এ ধারার গল্পে লেখক নর-নারীর মানসলোকের নানামাত্রিক অভিক্ষেপের বিশ্লেষণসূত্রে তাদের জীবনের সংকট ও জটিলতার উন্মোচনে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। মানুষের অন্তর্মানসে সক্রিয় লিবিডোর সর্বগ্রাসী প্রভাব, সর্বযৌনবাদে আস্থা, চেতন-অবচেতন-অচেতনের অস্তিত্ব প্রভৃতি তাঁর এ পর্বের গল্পের মুখ্য উপাদান। মানুষের মনের ত্রিস্তরের দ্বন্দ্ব-উদঘাটনের মাধ্যমে তার অসুস্থ, অস্বভাবী ও বিকৃত চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে এসব গল্পে। অন্ধকারের মানস-পরিক্রমায় অবগাহন করে সুবোধ ঘোষ চরিত্রের মনোবিশ্লেষণ করলেও মানুষের প্রতি তাঁর গভীর মমত্ববোধ এ ধারার গল্পকে এনে দিয়েছে শিল্পসাফল্য।

সুবোধ ঘোষের গল্পে প্রেম এক গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। বস্তুত সৃষ্টির প্রারম্ভিক পর্যায় থেকে নারী পুরুষের প্রতি, পুরুষ নারীর প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেছে। মানব-মস্তিষ্কের উৎকর্ষ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই আকর্ষণ কেবল দেহাভ্যন্তরেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, সেটি তার হৃদয়ঘটিত মনস্তাত্ত্বিক সম্প্রকাশেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। প্রেম-মনস্তত্ত্বকেন্দ্রিক গল্পে সুবোধ ঘোষ নারী-পুরুষের হার্দ্যিক প্রেমানুভবের চিত্র অঙ্কন করেছেন। প্রেমের বিষয়কে গল্পকার যখন গল্পে উপস্থাপন করেন তখন অধিকাংশ জায়গাতে নারী-মনস্তত্ত্বের প্রতিক্রিয়াকেই গুরুত্ব দেন। নায়িকা চরিত্র বা নারী-মনস্তত্ত্বের প্রক্ষেপ তাঁর গল্পভাণ্ডারকে যে প্রবলভাবে আলোড়িত করেছিল সে বিষয়টি সামগ্রিক গল্পসংখ্যার নামকরণের নিরিখেও বিচার করা যায়। আবার গল্পের মূল বিষয় হিসেবে প্রেম-মনস্তত্ত্বকে এর নামকরণের ব্যঞ্জনায় উপস্থাপন করে তিনি এতৎসংক্রান্ত আলোচনা করেছেন নিপুণভাবে। এক্ষেত্রে গল্পের নামকরণই প্রেম-মনস্তত্ত্বের রূপক হয়ে উঠেছে। যেমন : "চিত্তচকোর", "পলাশের নেশা", "চোখ গেল", "শুক্লাভিসার", "গরল অমিয় ভেল", "হঠাৎ গোধূলি" প্রভৃতি। সুবোধ ঘোষ প্রেমকে দেহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেননি, প্রেমকে তিনি অধিষ্ঠিত করেছেন দেহাতীত এক স্বর্গীয় সুখে। তাই প্রত্যেকটি প্রেমের গল্পের শেষে রয়েছে এক চমক যা পাঠককে অভিভূত করে, এনে দেয় এক অনির্বচনীয় আনন্দ।

সুবোধ ঘোষ জীবন-জীবিকা সূত্রে বাংলা ও বহির্বঙ্গের নানাস্থানে থাকার ফলে তাঁর গল্পে বিচিত্রমুখী মানব মনস্তত্ত্বের সাক্ষাৎ মেলে। অর্থনীতি-নিয়ন্ত্রিত সমাজব্যবস্থায় মানুষের শ্রেণিগত পরিচয় ও তা থেকে উদ্ভূত মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা যে কত তীব্র হয় তার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় তাঁর বেশ কিছু গল্পে। মধ্যবিত্তের মানস বিশ্লেষণ করে এ শ্রেণির স্খলন, পতন, বিকৃতি, ভণ্ডামি, শঠতা আর দ্বিধাদীর্ণ

মানসিকতার তীক্ষ্ণ সমালোচনা করেছেন সুবোধ ঘোষ। মধ্যবিত্ত মনস্তত্ত্বের শল্য চিকিৎসক সুবোধ ঘোষ এ শ্রেণির কৃত্রিম মুখোশটির পূর্ণাঙ্গ চিত্র উদঘাটন করেছেন নৈপুণ্যের সঙ্গে। নগ্ন ব্যভিচার আর ক্লেদাক্ত অভিসন্ধির আড়ালে মধ্যবিত্তের মানসলোক যে সর্বদা দোদুল্যমান তার স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে বেশ কিছু গল্পে। কেবল মধ্যবিত্ত মানসজগতে বিচরণ করেই সুবোধ ঘোষ তৃপ্ত ছিলেন না, সমাজের প্রান্তিক মানুষের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণও তাঁর গল্পকে বিশিষ্ট ও সার্থক করে তুলেছে। শরৎচন্দ্রের মতো সুবোধ ঘোষও পতিতাদের নিয়ে যেসব গল্প রচনা করেছেন সেসব গল্পে পতিতা নারীর হৃদয়ের কমনীয় মাধুর্য, অন্তর্যন্ত্রণা আর করুণ মানসিক বিপর্যয়ের চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। আবার বিধবা নারী ও বিপত্নীক পুরুষের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা রূপায়ণেও সুবোধ ঘোষ তাঁর স্বকীয় প্রতিভার পরিচয় রেখেছেন। বিধবা নারী কিংবা বিপত্নীক পুরুষের জীবনেও যে বিবিধ মানসিক জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে তার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় গুটিকয়েক গল্পে। পারিবারিক কিংবা অর্থনৈতিক চাপে পড়ে এসকল নারী-পুরুষ যে মানসিক দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয় তার সফল চিত্রায়ণ দেখা যায় গল্পগুলোতে। এছাড়াও সুবোধ ঘোষ তাঁর গল্পে বার্ধক্য দশাগ্রস্ত নর-নারীর মনস্তত্ত্ব চিত্রণে সচেতনতার স্বাক্ষর রেখেছেন। বার্ধক্যজীবনের বিভিন্ন মনস্তাত্ত্বিক অসঙ্গতি তাঁর কয়েকটি গল্পের চরিত্রের আচরণগত বিন্যাসের ভেতর দিয়ে রূপায়িত হয়েছে।

সুবোধ ঘোষের বৈচিত্র্যসন্ধানী শিল্প-অন্বেষা যুগপৎ বস্তুবিশ্ব ও মনোবিশ্বের অনুধ্যানে সৃজনমুখর। তাই তাঁর গল্পসমূহে মানব-মনস্তত্ত্বের বহুধাবিস্তৃত ও জটিল স্বরূপসত্যের রহস্য আবিষ্কারে এবং চরিত্রের মানস-আলোড়নের দ্বন্দ্বময় উন্মোচনে গভীর ব্যঞ্জনা লাভ করেছে। লেখকের সুতীক্ষ্ণ, অন্তর্ময় ও সত্যসন্ধ জীবনবোধ মানব মনস্তত্ত্বের বিচিত্রমুখী প্রকাশ-প্রকরণে সমৃদ্ধ হয়ে তাঁর ছোটগল্পে অর্জন করেছে প্রতীতি-সমগ্রতা। এ ক্ষেত্রে তাঁর গৌরব ও বিশিষ্টতা নিঃসন্দেহে অনন্যলব্ধ।

গ্রন্থপঞ্জি

ক. গল্প-তালিকা

গল্পগ্রন্থ	আলোচিত গল্প	অনালোচিত গল্প
ফসিল এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স, ১৯৪০	শক থেরাপি, অযান্ত্রিক, সুন্দরম্. গোত্রান্তর	ফসিল, যাযাবর, দণ্ডমুণ্ড, গ্লানিহর, সবলা
পরশুরামের কুঠার পূর্বাশা লিমিটেড, ১৯৪০	পরশুরামের কুঠার, ন তস্থৌ, নির্বন্ধ, গরল অমিয় ভেল, উচলে চড়িনু	কর্ণফুলির ডাক, তমসাবৃতা
গ্রাম-যমুনা বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৯৪৪	বারবধূ, কাঞ্চন সংসর্গাৎ, হঠাৎ গোধূলি, বর্ণচোরা, অনধিকার প্রবেশ	হৃদ্‌ঘনশ্যাম, গ্রাম-যমুনা, কাগজের নৌকা, মানশুল্কা, কতটুকু ক্ষতি
শুক্লাভিসার ১৯৪৪	শুক্লাভিসার, একতীর্থা	কালাগুরু, বৈর নির্যাতন, ভাট তিলক রায়, নতুন শালিক
মণিকর্ণিকা এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স, ১৯৪৭	মা হিংসীঃ, ফল্গু ও ফাল্গুন, তিন অধ্যায়	অপোপকার, মিষ্টিমুখ, শিবালয়, নায়িকা মুগ্ধা, মণিকর্ণিকা
জতুগৃহ ১৯৫২	কাঞ্চন সংসর্গাৎ, জতুগৃহ, বারবধূ, অলীক, দুঃসহধর্মিণী, চতুর্ভুজ ক্লাব, হঠাৎ গোধূলি	মানশুল্কা
মনভ্রমরা ক্যালকাতা পাবলিশার্স, ১৯৫৪	আত্মজা, মনভ্রমরা, সুনিকেতা, বৈদেহী	মিছার মা, রূপোঠাকরুণের ভিটে, নিমের মধু, মায়ামানিক, রামগিরি
কিংবদন্তীর দেশে নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৫৪		কহ কৌশিকী, মহীপালের দীঘি, মেহের হামারা, ফুলজানিনামা, ডুমনীতলার মা, একটি বুলবুলের শিস, মূর্ছা পাহাড়ের কথা, একটি স্বপ্নের আহ্বান, গনগণির মাঠ, সখী সোনার পাঠশালা দুর্গাকমল, সমাহিত আর্তনাদ, কবি রূপ ঠাকুর, ভক্ত মর্তুজা, সনকা ও মেনকা, গুরুদক্ষিণা
ভারত প্রেমকথা আনন্দ হিন্দুস্থান প্রকাশনী, ১৯৫৪		পরীক্ষিৎ ও সুশোভনা, অগ্নি ও স্বাহা, রুরু ও প্রমদ্বরা, ইন্দ্র ও শ্রুবাবতী, উতথ্য ও চান্দ্রেয়ী, ভাস্কর ও পৃথা, সংবরণ ও তপতী, জনক ও সুলভা, বসুরাজ ও গিরিকা, জরৎকারু ও অস্তিকা, অগস্ত্য ও

		লোপামুদ্রা, মন্দপাল ও লপিতা, অতিরথ ও পিঙ্গলা, ভৃগু ও পুলোমা, চ্যবন ও সুকন্যা
থির বিজুরী **১৯৫৫**	থির বিজুরী, চোখ গেল, ঠগিনী, মনোলোভা, শরীরিণী, শ্মশানচাঁপা	পরিণাম রমণীয়
কুসুমেষু ক্লাসিক প্রেস, **১৯৫৬**	কৌন্তেয়, কুসুমেষু, কথামালা, স্বস্ত্যয়ন	
ভোরের মালতী ক্লাসিক প্রেস, **১৯৫৭**	দেবতারে প্রিয় করি, ঐতিহাসিক বস্তুবাদ	
পলাশের নেশা ত্রিবেণী প্রকাশন, **১৯৫৭**	ঠগের ঘর, পঙ্কতিলক, অচিরন্তন	পলাশের নেশা, অঙ্গদা, সাধারণী, ছায়া ও কায়া, পুষ্পকীট, আগুন আমার ভাই, আগ্রা আর লখনউ, স্বপ্নাতীত, জঞ্জালীর জ্বালা
মনোবাসিতা **১৯৫৭**	ঠাণ্ডা যুদ্ধের অবসান, স্বমহিমচ্ছায়া	মনোবাসিতা, জলরাক্ষস, ক্যাকটাস, হিরো এবং ভিলেন, দানবিক, হিসাব মিলাতে, ক্ষণকালীন, কাব্যিক
অর্কিড আনন্দ বিজয় প্রকাশন **১৯৫৮**	অর্কিড, জয়ন্তী	কোটেশন, চন্দ্রগ্রহণ
নিতসিঁদুর ক্লাসিক প্রেস, **১৯৫৮**		নিতসিঁদুর, বৈপিতৃক, মহানাদ, মাঙ্গলিক, কালপুরুষ, বিজয়িনী, খদ্যোত, প্রিয়ংবদা, মনোনয়ন
চিত্তচকোর বাক সাহিত্য, **১৯৬০**	সুনিশ্চিতা, ঠগিনী, চিত্তচকোর, মৃগনয়না	ঐশ্বরিক, অভ্যর্থনা, মানবিকা, দ্বিরাগমন, সমাপিকা, শুক্লানবমী, শমীবহ্নি
দিগঙ্গনা ডি. হাজরা অ্যাণ্ড কোং, **১৯৬০**	চতুর্ভুজ ক্লাব, দুঃসহধর্মিণী, পিছু ডাকে	দিগঙ্গনা, রাতের পাখি, স্বর্গ হতে বিদায়, গানের চেয়ে বেশী, ক্ষণ অভিসারে
রূপনগর প্রাইমা পাবলিকেশনস, **১৯৬৪**	গুহামানব, অমানিশা, ব্রততী	জীবনে তোমার পরিচয়, তৃষিত মরু, বহুরূপী, রূপনগর, মিথ্যা মা
সায়ন্তনী ধীরেন্দ্রনাথ ধারা, **১৯৬৯**	স্নানযাত্রা, পারমিতা	ধূলিস্নান, শাস্তিদাতা, অচিন রাখী, অধীশ্বরী, সম্পত্তি, নমিতার সেতার, রিতা

Dhaka University Institutional Repository

খ. গল্প সংকলন

১. সুবোধ ঘোষের শ্রেষ্ঠ গল্প (জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, প্রকাশ ভবন, ১৯৪৯)

২. গল্পলোক (নিউ স্ক্রিপ্ট, ১৯৫৭)

৩. গল্প মণিঘর (রবীন্দ্র লাইব্রেরী, ১৯৬৯)

৪. ঝিনুক কুড়িয়ে মুক্তো (মরণোত্তর প্রকাশ), মডার্ণ কলাম, এপ্রিল ১৯৮৬

৫. শ্রেষ্ঠ প্রেমের গল্প (পত্রপুট, ১৯৮৮)

৬. সুবোধ ঘোষের বাছাই গল্প (উত্তম ঘোষ সম্পাদিত, মণ্ডল বুক হাউজ, ১৯৯১)

৭. কিশোর গল্প (১৯৯১)

৮. বারবধূ ও অন্যান্য (দীপ প্রকাশন, ১৯৯৫)

৯. ক্যাকটাস (পুনশ্চ, ১৯৯৫)

১০. কিশোর বিচিত্রা (১৯৯৫)

১১. নির্বাচিত গল্পগুচ্ছ (আনন্দম, ১৯৯৫)

১২. ছোটদের সেরা সম্ভার (পুনশ্চ, ১৯৯৬)

১৩. সুবোধ ঘোষ অমনিবাস (দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৬)

গ. গল্প সংগ্রহ

১. সুবোধ ঘোষের গল্পসংগ্রহ (১ম-৫ম খণ্ড), প্রাইমা পাবলিকেশনস, প্রকাশকাল উল্লেখ নেই।

২. সুবোধ ঘোষের গল্পসংগ্রহ (১ম-৩য় খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স, জানুয়ারি, এপ্রিল ও জুন ১৯৯৪

Dhaka University Institutional Repository

ঘ. সুবোধ ঘোষ-বিষয়ক গ্রন্থ

(কালানুক্রমিক)

তুষার চট্টোপাধ্যায় (সম্পা) : *ভরা থাক সুবোধ ঘোষ স্মৃতি-তর্পণ*, সুবোধ ঘোষ স্মৃতি সংসদ, কলকাতা, ১৯৯১

উত্তম ঘোষ : *সুবোধ ঘোষ : বড় বিস্ময় জাগে*, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ১৯৯৪

সুদীপকুমার চক্রবর্তী : *ছোটগল্পের সুবোধ ঘোষ*, প্রকাশভবন, কলকাতা, প্রকাশকাল উল্লেখ নেই। (আনুমানিক নব্বইয়ের দশকে প্রকাশিত)

শিবশংকর পাল : *সুবোধ ঘোষের ছোটগল্পে মানবিক মূল্যবোধ*, সুবর্ণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৯

অরিন্দম গোস্বামী : *সুবোধ ঘোষ : কথাসাহিত্য*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, আগস্ট ২০০১

নবনীতা চক্রবর্তী : *বাংলা ছোটগল্পের গদ্যশৈলী সতীনাথ ভাদুড়ী-সুবোধ ঘোষ-কমলকুমার মজুমদার*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০২

গোপালমণি দাস : *দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলা ছোটগল্পে সুবোধ ঘোষ*, পাত্র'জ পাবলিকেশন, কলকাতা, ২০০৭

তপন মণ্ডল : *গল্পকার সুবোধ ঘোষ : জীবনদৃষ্টি ও নির্মাণ শিল্প*, জ্ঞানবিচিত্রা প্রকাশনী, কলকাতা, জুলাই ২০০৭

উত্তম রায় : *সুবোধ ঘোষের ছোটগল্পে কথনশৈলী*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০১০

ঙ. সহায়ক গ্রন্থ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত : *কল্লোল-যুগ*, এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, সপ্তম প্রকাশ, আশ্বিন ১৩৯৫/১৯৮৮

অচ্যুত গোস্বামী : *বাংলা উপন্যাসের ধারা*, পাঠভবন, কলকাতা, ১৯৬৮

অনিন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায় : *প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্প: মননে ও সৃজনে*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০০৫

Dhaka University Institutional Repository

অমলেন্দু বসু : *প্রবন্ধ সংগ্রহ*, প্রথম খণ্ড, বাণীশিল্প, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০০৮

অমল শঙ্কর রায় : *মনীষা ও মনঃসমীক্ষণ*, পুস্তক বিপণি, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় : *সাহিত্য সন্ধান*, সাহিত্য বিহার, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, মার্চ ১৯৯৮

: *কালের পুত্তলিকা (বাংলা ছোটগল্পের একশ'দশ বছর/১৮৯১-২০০০)*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ ২০১০

অরুণকুমার রায়চৌধুরী : *অস্বাভাবিক মনস্তত্ত্ব*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৪

অলোক রায় : *কথাসাহিত্য জিজ্ঞাসা*, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ১৯৯২
: *সাহিত্য-কোষ*, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ১৯৯৯

অশোককুমার মিশ্র : *রবীন্দ্র ছোটগল্পের রূপরেখা*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০২

আহমদ রফিক : *ছোটগল্পের শিল্পরূপ পদ্মাপর্বের রবীন্দ্রগল্প*, অনিন্দ্য প্রকাশ, ঢাকা, প্রথম অনিন্দ্য সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ২০১২

ইন্দ্রাণী চক্রবর্তী : *বাংলা ছোটগল্প: রীতি-প্রকরণ ও নিবিড় পাঠ*, রত্নাবলী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৪

উজ্জ্বলকুমার মজুমদার : *গল্প পাঠকের ডায়ারি*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০০৫

গিরিন্দ্র শেখর বসু : স্বপ্ন, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতা, ১৯৫০

গোকুলানন্দ মিশ্র : *প্রতীচ্য প্রেরণা ও কল্লোলীয় সাহিত্য*, প্রজ্ঞা বিকাশ, কলকাতা, প্রথম প্রজ্ঞা বিকাশ সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০১

গোপালচন্দ্র রায় (সম্পা) : *শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র*, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা, ১৯৫৪

গোপিকানাথ রায় চৌধুরী : *দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৩৮০

জ্যোতিপ্রসাদ বসু : *গল্প লেখার গল্প*, বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা, শ্রাবণ ১৩৫৩

জ্যোতিপ্রসাদ রায় : *বাংলা ছোটগল্পের বিস্মৃত অধ্যায় (১৯৮০-১৯১৪)*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম দে'জ সংস্করণ, আগস্ট ২০০৭

Dhaka University Institutional Repository

তপোব্রত ঘোষ : *রবীন্দ্র ছোটগল্পের শিল্পরূপ*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৩৯৭

দেবকুমার বসু : *কল্লোল গোষ্ঠীর কথাসাহিত্য*, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮০

ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় : *পাভলভ পরিচিতি*, কলকাতা, পরিমার্জিত অখণ্ড সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০০

নবনীতা সান্যাল : *প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্প: বিষয় ও শিল্পরূপ*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০০০

নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী : *বাংলা ছোটগল্প : সংক্ষিপ্ত সমালোচনা*, পরিভাষা কমিটি, আশুতোষ বিল্ডিং, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : *সাহিত্যে ছোটগল্প*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, প্রথম মিত্র ও ঘোষ সংস্করণ, শ্রাবণ ১৪০৫

: *বাংলা গল্প-বিচিত্রা*, প্রকাশ ভবন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, পঞ্চম মুদ্রণ, আশ্বিন ১৪১০

নিতাই বসু : *বাংলাদেশ : সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স প্রকাশনা বিভাগ, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৯

নিতাই বসু (সম্পা) : *সুবোধ ঘোষ: প্রবন্ধাবলী*, সাহিত্যলোক, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০০০

নীরদচন্দ্র চৌধুরী : *বাঙালী জীবনে রমণী*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৪০৮

নীহাররঞ্জন সরকার : *মনোবিজ্ঞান ও জীবন*, জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৭৩

প্রবীরকুমার চট্টোপাধ্যায় : *জগদীশ গুপ্তর কথাসাহিত্য : ফ্রয়েডীয় মনোবিশ্লেষণের আলোকে* ভাষাবন্ধন প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯২

প্রবীর ঘোষ : *সংস্কৃতি : সংঘর্ষ ও নির্মাণ*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৩

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : *প্রভাত-গ্রন্থাবলী* (১ম-৫ম ভাগ), বসুমতী সাহিত্যমন্দির, কলিকাতা, ২০০২

প্রমথ চৌধুরী : *প্রবন্ধ সংগ্রহ*, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, কলিকাতা, ১৯৮৬

Dhaka University Institutional Repository

পার্থ চট্টোপাধ্যায় : *বাঙালি জীবনে সম্পর্ক*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৮

পিনাকী ভাদুড়ী : *উত্তরসূরীদের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ*, টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর ১৯৮৮

প্রেমেন্দ্র মিত্র : *প্রেমেন্দ্র মিত্রের সমস্ত গল্প (১ম খণ্ড)*, ওরিয়েন্ট লংম্যান, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৯৮৯

: *প্রেমেন্দ্র মিত্রের সমস্ত গল্প (২য় খণ্ড)*, ওরিয়েন্ট লংম্যান, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৯৮৯

বাসন্তী মুখোপাধ্যায় : *রবীন্দ্র কথাসাহিত্যে চরিত্র ব্যাখ্যান*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮০

বিনয় ঘোষ : *শিল্প সংস্কৃতি ও সমাজ*, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, দ্বিতীয় সংযোজিত সংস্করণ, ১৯৮০ (প্র. প্র. ১৯৪০)

বিশ্বজিৎ ঘোষ : *বাংলা কথাসাহিত্য পাঠ* (সম্পাদনা), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, মে ২০০২

: *বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ গল্প*, আজকাল প্রকাশনী, ঢাকা প্রথম প্রকাশ ২০০৪

ধীরেন্দ্র দত্ত : *বাংলা ছোটগল্প : প্রসঙ্গ ও প্রকরণ*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, আগস্ট ১৯৮৫

বুদ্ধদেব বসু : *বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ*, তৃতীয় খণ্ড, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৮২

বেগম আকতার কামাল : *কবির চেতনা : চেতনার কথকতা*, ধ্রুবপদ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ২০১৩

ভীষ্মদেব চৌধুরী : *জগদীশ গুপ্তের গল্প : পঙ্ক ও পঙ্কজ*, ফুলদল প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ ১৩৯৫

ভূদেব চৌধুরী : *বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প ও গল্পকার*, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, চতুর্থ প্রকাশ, পুনর্মুদ্রণ, ১৯৯৯

মঞ্জুর আহমদ : *অস্বভাবী মনোবিজ্ঞান*, জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ২০০১

মধুমিতা বন্দ্যোপাধ্যায় : *মানিকের ছোটগল্পে মনস্তত্ত্ব*, অলকা প্রিন্টার্স, কোলকাতা, প্রথম প্রকাশ, শ্রাবণ ১৪০৮

Dhaka University Institutional Repository

মনোরঞ্জন পুরকাইত (সম্পা): *শিশুতীর্থে রবীন্দ্রনাথ*, সাহিত্য তীর্থ প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০১১

মানস রায়চৌধুরী : *লোকজীবন মনস্তত্ত্ব শিল্পসৃষ্টি*, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০০১

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : *লেখকের কথা*, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ১৯৫৭

মৃণালকান্তি মণ্ডল : *নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্প : বিষয় ও রূপের মূল্যায়ন*, সাহিত্যসঙ্গী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০০৬

মোঃ মাইনুল আহসান খান : *অপরাধ বিজ্ঞান মনোরোগ ও আইনের শাসন*, মুক্তচিন্তা প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৮

যুবনাশ্ব : *পটলভাঙার পাঁচালী*, সেঞ্চুরী প্রেস, কলিকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৩৬৩

রথীন্দ্রনাথ রায় : *ছোটগল্পের কথা*, পুস্তক বিপণি, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৫৯

রবিন পাল : *কল্লোলিত ছোটগল্প*, বুক ট্রাস্ট, কলকাতা, প্রথম বুক ট্রাস্ট সংস্করণ, আগস্ট ১৯৮৮

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : *আধুনিক সাহিত্য*, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৩১৪

: *গল্পগুচ্ছ*, প্রতীক প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৫

শিবেশকুমার চট্টোপাধ্যায় : *প্রভাতকুমার : জীবন ও সাহিত্য*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, সেপ্টেম্বর ১৯৭৩

শিশিরকুমার দাশ : *বাংলা ছোটগল্প (১৮৭৩-১৯২৩)*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম পরিমার্জিত দে'জ সংস্করণ, জুলাই ১৯৮৩

শীতল চৌধুরী : *বাংলা ছোটগল্পের তিন নক্ষত্র : বনফুল প্রেমেন্দ্র মিত্র নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়*, প্রজ্ঞা বিকাশ, কলিকাতা, ১৪১৫

শুদ্ধসত্ত্ব বসু : *শরৎ সমীক্ষা*, মণ্ডল বুক হাউজ, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, ভাদ্র ১৩৮২

শুভঙ্কর ঘোষ : *সাহিত্যের রূপভেদ*, সাহিত্যলোক, কলিকাতা, ১৯৯৯

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় : *শৈলজানন্দের গ্রন্থাবলী (প্রথম খণ্ড)*, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কলকাতা, আশ্বিন, ১৩৬১

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, সপ্তম পুনর্মুদ্রণ সংস্করণ ১৯৮৪

সত্যচরণ চট্টোপাধ্যায় : *বাংলা ছোটগল্পের ক্রমবিকাশ*, প্রজ্ঞাবিকাশ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৮

সমর ঘোষ : *প্রলেতারিয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি প্রসঙ্গে*, নবসাহিত্য প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৯৮৩

সমীরণ চট্টোপাধ্যায় : *মনস্তত্ত্বের গোড়ার কথা*, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলিকাতা, ১৩৫৮

সরোজমোহন মিত্র : *বাংলায় গল্প ও ছোটগল্প*, তুলসী প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৭

সাবিত্রী নন্দ চক্রবর্তী : *আধুনিক বাংলা ছোটগল্প : মূল্যবোধের সংকট*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জুন ২০০৪

সুকুমার সেন (সম্পা) : *শরৎ সাহিত্য সমগ্র*, অখণ্ড সংস্করণ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম অখণ্ড সংস্করণ, ১৩৯২

: *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১৮৯১-১৯৪১)*, পঞ্চম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, জানুয়ারি ১৯৯৯

সুখেন্দ্র ভট্টাচার্য (সম্পা) : *আন্তর্জাতিক ছোটগল্প ও সমাজ জিজ্ঞাসা*, প্রতিভাস, কলকাতা, জুন ১৯৯০

সুধাংশু রঞ্জন ঘোষ : *বিদেশের নিষিদ্ধ উপন্যাস*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮০

সুনীল কুমার সরকার : *ফ্রয়েড*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, তৃতীয় প্রকাশ, মার্চ ১৯৯০

সুবীর রায় চৌধুরী (সম্পা) : *জগদীশ গুপ্তর গল্প*, দে'জ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৭

সুমিতা চক্রবর্তী : *ছোটগল্পের বিষয়-আশয়*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জুন ২০০৪

সৈয়দ আকরম হোসেন : *প্রসঙ্গ : বাংলা কথাসাহিত্য*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৭

Dhaka University Institutional Repository

সৈয়দ আজিজুল হক : *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প : সমাজচেতনা ও জীবনের রূপায়ণ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৮

হরনাথ পাল : *রবীন্দ্রনাথ ও প্রাচীন সাহিত্য*, বামা পুস্তকালয়, কলিকাতা, ১৯৬৬

হীরেন চট্টোপাধ্যায় : *কথাসাহিত্যিক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০১০

চ. সহায়ক প্রবন্ধ

আনন্দ বাগচী : "ছোটগল্পের রূপান্তর", *দেশ*, ২১ অক্টোবর, ১৯৮৯

উত্তীয় বসু : "সুবোধ ঘোষের ছোটগল্প : আর্কেটাইপের আঙ্গিকে", ত্রৈমাসিক চড়ুইপত্র *সময় তোমাকে* বিশেষ সংখ্যা, সম্পাদক : সোমনাথ দাস, পঞ্চম বর্ষ ২০১১

কল্যাণ মণ্ডল : "সুবোধ ঘোষের জীবন-পরিচয়", *কোরক* সাহিত্য পত্রিকা, সম্পাদক : তাপস ভৌমিক, প্রাক্ শারদ সংখ্যা ১৪১৫

বসন্ত লস্কর : "সিগমুণ্ড ফ্রয়েড-সুবোধ ঘোষ", সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ষান্মাসিক পত্রিকা *উজাগর*, শতবর্ষে সুবোধ ঘোষ সংখ্যা ১৪১৫, সম্পাদক : উত্তম পুরকাইত

সুমনস্বরাট ঘোষ : "কাঞ্চন সংসর্গাৎ : হিতোপদেশের পুনর্নির্মাণ", সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ষান্মাসিক পত্রিকা *উজাগর*, পূর্বোক্ত

ছ. সহায়ক ইংরেজি গ্রন্থ

Buddhadeva Bose : *An Acre of Green Grass*, papyrus reprint series, 11 November, 1982

Erich Fromm : *The Art of Loving,* unwin paperbacks, London, 1985

Robert S. Woodworth : *Contemporary School of psychology*, Ronald Press, Newyork, 1948

Sigmund Freud : *Three Essays on the theory of Sexuality*, in standrad Edition of the complete psychological works of sigmund Freud, Vol. vii, 1981, Hogarth press, Newyork